গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দায়ুদ খাঁ কররাণী যখন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে পাটনায় বসে, তখন আকবর বাদশা ওপারে হাজিপুর কিলা দখল করে মধ্যরাত্রে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন—এবং সেই আগুন দেখে অকস্মাৎ নিদারুণ ভয় পেয়ে দায়ুদ যুদ্ধের চেষ্টামাত্র না করেই পলায়ন করেন—এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কেন যে হাজিপুর কিলা অত কষ্টে দখল করে আকবর তাতে আগুন লাগিয়েছিলেন—আজও কোন ঐতিহাসিক সে কারণ খুঁজে পান নি। সেই বিচিত্র রহস্য থেকেই এই উপন্যাসের কল্পনা। গুরুন্দা-বা তুকারয়ের ঘটনাবলী—যতটুকু ইতিহাসে পাওয়া যায়, তা এতে অবিকৃত আছে। বাকীটা অবশ্যই কল্পনা; নফিসা চরিত্র তো সম্পূর্ণই। মিয়া লুদী খাঁর প্রশংসায় মুঘল ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত পঞ্চমুখ—সুতরাং তাঁর মহৎ চরিত্র কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত হয় নি। দায়ুদ তাঁকে আশ্রয়-প্রার্থীর কাতর অনুনয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল—এ কথাও ইতিহাসে আছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের মধ্যের দুটি অংশ 'আকাশলিপি' ও 'দ্বিচারিণী' নাম দিয়ে দুটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার আগে, মধ্যে ও পরে বহু অংশ সংযোজিত হয়েছে। ও-দুটি অংশও সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত হয়েছে।

ইতি—

এই লেখকের :

কলকাতার কাছেই
বহ্নিবন্যা
রাত্রির তপস্যা
জ্যোতিষী
কঠিন মায়া
জীবনস্বপ্ন
নারী ও নিয়তি
সোহাগপুরা
মনে ছিল আশা
ভাড়াটে বাড়ী
পুরুষ ও রমণী
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
দুর্ঘটনা
রজনীগন্ধা
প্রভাতসূর্য
আব্ছায়া
ত্রুটি
প্রেরণা
কমা ও সেমিকোলন
রক্তকমল
সাবালক
কোলাহল
কেতকী বন
মিলনান্ত
নববধূ
শ্রেষ্ঠ-গল্প
সমারোহ
সীমান্তরেখা
রাতমোহানা
চাঁদমালা
দেহদেউল

উৎসর্গ

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

করকমলে—

॥ ১ ॥

বহুক্ষণ ধরেই মেঘ জমছিল, কালো কালো, কষ্টিপাথরের রঙের ডেলা ডেলা মেঘ। অন্ধকার হয়ে এসেছিল চারিদিক—এবার সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের কোলে কোলে সমস্ত দিগন্ত-রেখা জুড়ে অদ্ভুত একটা আলো ফুটে উঠল। যেন কালো শামিয়ানার নীচে বাঁধা-রোশনাই-এর আলো জ্বলল।

লুদী খাঁ এ মেঘের চেহারা চেনেন। এ আলোর অর্থও তাঁর অজানা নয়। এখনই জল নামবে, বিপুল বর্ষণ। লুদী খাঁর মনে পড়ল গৌড়ের লোকেরা একেই বলে 'কানা-মেঘে ভর করে' বর্ষা নামা। মেঘের কোলে এই আলো দেখা দিলেই ওরা বলে 'কানা-মেঘ'—কেন কে জানে!

গুরু-গুরু-গুম্-গুম্!

পুঞ্জীভূত মেঘের মধ্যে কে বা কারা যেন দামামা-ধ্বনি করল। সেই গুরু গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে হতে—সামনের প্রান্তর ছাড়িয়ে, গঙ্গা পেরিয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ল। ...এ যেন আকাশেরও রণসজ্জা, ওই সজ্জিত মেঘ-বাহিনীরই দামামা-ধ্বনি যেন এটা। লড়াই শুরু হওয়ার আর দেরি নেই। সমস্ত 'বেহেস্তী ফৌজ' যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আবারও মেঘ ডাকল, আবারও সেই প্রতিধ্বনি জাগল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, দিক-চক্ররেখারও বাইরে ছড়িয়ে পড়ল সে শব্দ।

ভৃত্য রহমৎ এসে পিছন থেকে বলল, 'ভেতরে চলুন হুজুর, এখনই জল নামবে!'

'নামুক, একটু দেখি। অনেকদিন আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নি রে—বহুদিন। কেবল বেইমান মানুষগুলোর দিকে চেয়েই খোদার দেওয়া চোখ দুটো নষ্ট করেছি। কী করলাম রহমৎ, তাই আজ ভাবছি—কী করলাম! কিসের জন্যই বা করলাম!...অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি? কী তার মূল্য? আজ কোথায় কী? এর চেয়ে মরীচিকা বুঝি আর কিছু নেই।...তার চেয়ে যদি ঐ কাফের ফকীরগুলোর মত সর্বাঙ্গে ছাই মেখে কৌপীন সম্বল করে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতাম! তাতেও ঢের সুখ ছিল।...প্রকৃতি ওদের জন্যে অবারিত খুলে রেখেছেন তাঁর দ্বার, এই বিপুল প্রান্তর, নদী পাহাড়, অনন্ত

সৌন্দর্য-ভাণ্ডার খোলা রেখেছেন। খাওয়া? যে কোন গৃহস্থ-বাড়ি গিয়ে দাঁড়ালেই ত এক মুঠো অন্ন জোটে।...চিন্তা নেই ভাবনা নেই, অহরহ ক্রূর বিশ্বাসঘাতক—সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর মানুষের বিষ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হতে হয় না—ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী...বুঝলি!'

রহমৎ কী বুঝল কে জানে। এ সব কথা সে বুঝতে পারে না, কেন যে মনিব আজ এমন পাগলের মত বকতে শুরু করেছেন তাও বুঝতে পারছে না। সে একটু ভীত দৃষ্টিতেই তাকাল লুদী খাঁর মুখের দিকে।

লুদী খাঁ চুপ করেছেন। কথাগুলো কিন্তু সত্যিই তিনি রহমৎকে শোনাবার জন্য বলছিলেন না—ওগুলো সবই তাঁর চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। মনের প্রতিধ্বনি মাত্র।...তাই কখন যে তিনি থেমে গেছেন তাও তিনি জানেন না। নিস্তব্ধ অভিভূত হয়ে চেয়ে আছেন শুধু সামনের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে।...নদীর ওপারে মাঠে জল নেমে গেছে এর মধ্যেই, কুয়াশার মত ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে সে বর্ষা। অবাক হয়ে দেখছেন লুদী—যেন এর আগে বৃষ্টি নামা কখনও দেখেন নি।

'হুজুর!'

সভয়ে সসম্ভ্রমে আবারও ডাকল রহমৎ।

এধারেও আর বসে থাকা যায় না, বড় বড় ফোঁটা ফেলে বৃষ্টি এসে পৌঁছে গেছে এ পারেও। দেখতে দেখতে লুদী খাঁর ললাটে ও মাথার টুপিতে জলের কয়েকটি বড় বিন্দু এসে জমে গেল ঘামের রেখার মত।

লুদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁবুর ভেতর উঠে এলেন। কিন্তু তাঁবুর পরদা ফেলতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'ওটা খোলা থাক্, এইখান থেকেই একটু দেখা যাবে তবু।'

বাইরে জল বেশ চেপেই এল। বহু দূরের প্রান্তর জুড়ে বৃষ্টি নামল ঘটা করেই। ঝম্ ঝম্ ঝম্—একটানা ধ্বনি সে বর্ষণের। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গুম্ গুম্ শব্দ আকাশের, আর তার বহুক্ষণব্যাপী প্রতিধ্বনি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ।

'আঃ!' আপন মনেই একটা আরামের শব্দ করেন লুদী খাঁ।

কিসের আরাম তা তিনি জানেন না। তবে তিনি দেখছেন, প্রাণভরে দেখছেন। অন্তর জুড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর। জীবনের ভেতর দিকটা নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন তিনি—প্রায় জীবনভোর। তাই তার বাইরে যে এত শোভা

এত সৌন্দর্য আছে—তা কখনও চোখে পড়ে নি। আজ নতুন করে দেখলেন। নইলে এমন বর্ষা কি আর তাঁর জীবনে আসে নি? হয়ত বহুবারই এসেছে। কিন্তু চেয়ে দেখেন নি তিনি। অবকাশ হয় নি চাইবার।

আজ দেখতে পেয়ে তিনি কৃতার্থ। অন্তর ভরে যাচ্ছে তাঁর—একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও আরামে। মনে হচ্ছে এর পর আর-কিছুর জন্য কোন কারণেই ক্ষোভ থাকল না তাঁর মনে। অতি বড় শত্রুকেও তিনি আজ হাসি-মুখে ক্ষমা করতে পারবেন।

বাইরে প্রবল বর্ষণ চলেছে, জলের ছাট্ ভিতরে এসে বহুদূর পর্যন্ত মাটিতে পাতা মূল্যবান জাজিম ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। লুদী খাঁর দাড়িতে ও ভ্রুতেও জমেছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা। অদ্ভুত সাদা দেখাচ্ছে দাড়িটা। তাঁর জামাও বুঝি ভিজে উঠল। কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লুদী খাঁর। তিনি চেয়েই আছেন। দেখছেন—প্রাণভরে দেখছেন।

তাঁর মনের মধ্যেও বুঝি ঝড় উঠেছে আজ। এর চেয়ে ঢের বেশী দুর্যোগ তাঁর অন্তরে। সেই দুর্যোগের কথা ভুলতেই বুঝি এমনি করে প্রাণপণে কান পেতে আর চোখ মেলে আছেন বাইরের এই দুর্যোগের দিকে।

'জনাব।'

'কে, নফিসা! আয়, আয়।'

যেন বহুক্ষণের ঘুম ভেঙে যায় মিয়া লুদী খাঁর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ ফিরিয়ে আনেন ভিতরে। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত এদিক ওদিক তাকান, সেই প্রায়-অন্ধকার তাঁবুটার ভেতরে, তারপর তাঁর নজরে পড়ে নফিসা তাঁরই চৌকীর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

রহমৎ কখন শেজ্-এর আলোটা জেলে দিয়ে চলে গেছে। অথবা নফিসাই এনে রেখেছে ওটা—কে জানে! কিন্তু একেই আলোটা আছে বহু দূরে, বাতাস থেকে বাঁচাতেই বোধ করি খাটিয়ার ও-পাশে রাখা হয়েছে শেজ-এর বাতিটা, তার ওপর বাইরের দম্‌কা ঝোড়ো হাওয়ার কল্যাণে সেই ক্ষীণ শিখাটাও কেবল কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুতরাং সে আলোয় কিছু দেখতে পাবার কথা নয়,—আলোর অস্তিত্বই ত টের পান নি এতক্ষণ—তবু ভাল করে তাকিয়ে সেই কম্পমান সামান্য আলোতেই মিয়া লুদী খাঁর চোখে পড়ল নফিসার যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন মুখ এবং ছলছল দুটি চোখ।

সঙ্গে সঙ্গেই কোমল এবং কেমন-এক-রকমের স্নেহ-ব্যাকুল হয়ে উঠল লুদী খাঁর এতক্ষণের স্থির ভাবলেশহীন মুখভাব। তিনি ডান হাতটা কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে বাঁকিয়ে নফিসার একখানা হাত ধরে টেনে এদিকে নিয়ে এলেন এবং চোখের ভঙ্গীতে তাঁর পাশে দিওয়ানের অবশিষ্ট শূন্য স্থানটা দেখিয়ে বললেন, 'আয়, বোস্।'

কিন্তু নফিসা সেখানে বসল না, আস্তে আস্তে ওঁর পায়ের কাছে—একটা পা নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে—মাটির ওপরেই বসে পড়ল।

লুদী বাধা দিলেন না, টানাটানিও করলেন না, কারণ তাতে কোন ফল হবে না তা তিনি জানেন। তাঁর পায়ের কাছেই বসতে ও ভালবাসে, ওইটিই ওর প্রিয়স্থান। তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মাথার নিবিড় কালো চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটবার পর বললেন, 'মুখ অত ভারী কেন রে নফিসা? চোখ দুটোও অত ছলছলে? কী হয়েছে—দেশের কথা মনে পড়ছে?'

নফিসা বসে বসে ওঁর পায়ে হাত বুলচ্ছিল, সে কোন জবাব দিল না। কেবল মাথাটা তার আরও ঝুঁকে পড়ল।

হাসলেন মিয়া লুদী একটু, তারপর খানিক থেমে আবারও প্রশ্ন করলেন, 'কই, বললি না?'

এবার মুখ তুলল নফিসা, অশ্রুভার-গাঢস্বরে বলল, 'আপনি কেন ওই সব কথা বলছিলেন? কেন এমন করে—ভিজছিলেন শুধু শুধু—যদি আপনার অসুখ করে?'

'ওঃ—এই!···তা কী বলছিলুম, আর কাকেই বা বলছিলুম?'

'ওই যে রহমতের কাছে কী সব যা-তা বলছিলেন! আমার ভয় করে না বুঝি?'

'ও!' আবারও মধুর হাসলেন লুদী খাঁ। আদর করে ওর চিবুকটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই আমি পাগল হয়ে যাই নি এখনও। আর বোধহয় যাবও না। তার অনেক আগেই খোদার দরবারে ডাক পড়বে তা আমি জানি।'

চমকে উঠে আরও জোরে ওঁর পা জড়িয়ে ধরে নফিসা। ওর সেই কুসুম-সুকুমার যৌবন-আতপ্ত তনুর স্পর্শ অনুভব করে, লুদী খাঁও কি একটু শিউরে ওঠেন—এই বয়সেও?

'কী হল আবার?'

এবার গরম গরম জল কয়েক-ফোঁটা ঝরে পড়ল তাঁর কোলে। দুই হাঁটুর খাঁজে মুখ গুঁজে নফিসা বলল, 'কেন আপনি ওই সব ছাই-ভস্ম অলুক্ষুণে কথা মুখে আনছেন? কেন, কেন?'

'যা যা। ছেলে মানুষ কোথাকার! ডাক পড়বে বলে কি আজই ডাক পড়ছে? বলছিলাম পাগল আমি হব না—জীবিত থাকতে, এই কথা ত!'

জোর করে ওর মুখটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেন মিয়া লুদী, কিন্তু পারেন না। মুখটা আরও গুঁজে দিয়ে আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে নফিসা।

কথাটা যে ঠিক 'এই' নয়—তা মিয়া লুদীও জানেন বৈ কি!

খোদার দরবারে ডাক পড়বার যে আর বেশী বিলম্ব নেই, তা তিনি মনে মনে অনুভব করছেন আজ কদিন ধরেই। তাঁর এখানের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে—মনের মধ্যে কে যেন এই কথাটা বলছে অহরহ। মৃত্যু আসছে বন্ধুর মত এগিয়ে, তার চরণধ্বনি শোনা না গেলেও সে আগমন কেমন করে যেন টের পাচ্ছেন অন্তরে অন্তরে।

শুধু কোথা দিয়ে—আর ঠিক কবে আসবে, এইটেই এখনও জানেন না।

দুঃখও নেই তাঁর মৃত্যুর জন্যে। এতটুকু ক্ষোভ নেই।

'আজীবন সার দিনু জীবন প্রান্তরে—ফল লাভ কী হল আমার?' কবির ভাষায় এই প্রশ্ন যে তাঁরই পরম প্রশ্নের বাণীরূপ মাত্র।

অনেক করেছেন তিনি প্রভুবংশের জন্য। সত্যি সত্যিই সারা জীবন সার দিয়েছেন ওই বন্ধুর মরুপ্রান্তরে। তাই সার দেওয়াই বৃথা হয়েছে।

চিরদিনই মিয়া লুদী প্রভুভক্ত। যখন যে প্রভুর নোকরি করেছেন—সারা মন-প্রাণ দিয়েই করেছেন। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বিচক্ষণতা এবং তাঁর শৌর্যের সাহায্য না পেলে কররাণীরা আজ এই বিপুল রাজ্যখণ্ডের অধীশ্বর হতে পারত না। আদিল শাহ্ সুরের সভা থেকে যেদিন কররাণীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়—সেদিন তাজ খাঁকে উত্তর-ভারতের নিত্য রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং নিত্য সহস্র বিরোধ থেকে দূরে এই পূর্ব প্রান্তে শান্ত গৌড়বঙ্গে রাজ্য উপার্জনের পরামর্শ তিনিই দেন। হ্রস্ব-দৃষ্টি কররাণীরা তখনও দোয়াবে রাজত্ব করার আশা ছাড়তে পারেন নি—তাই তখন তাঁর কথায় কান দেন নি কেউ - কিন্তু হিমুর কাছে বার বার পরাজিত হয়ে যখন মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও আর রইল না—তখন শুধু বুদ্ধি নয়, তাজ আর সুলেমানকে তাঁর শৌর্যের ওপরও ভরসা

করতে হয়েছিল। আজ সুলেমান কররাণীর নাম তামাম হিন্দুস্থানে পরিচিত। তিনি অপরাজেয়, প্রাচীন রাজা সলোমনের মতই তাঁর প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের বরপুত্রের মত তিনি সৌভাগ্যবান –এই কথাই সকলে জানে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে কামতাপুর থেকে দক্ষিণে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে শোন নদের তীর পর্যন্ত সুবিস্তৃত রাজ্যের একচ্ছত্র নৃপতি হতে পেরেছিলেন তিনি। দুর্ধর্ষ চিলা রায়কে পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী করে সুলেমান সুদূর কামরূপে হাজোদের দেশেও তাঁর পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। কিন্তু সে কার জন্য ?

সে কি লুদী খাঁর জন্যই নয়? লুদী খাঁর বুদ্ধিতে চিলা রায় বন্দী হয়েছিলেন, লুদী খাঁর পরামর্শেই তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। আর তার ফলে চিরদিনের মত রাজ্যের উত্তর সীমা নিরাপদ হয়েছে তাঁদের। ওদিক দিয়ে অন্তত শত্রু আসবার ভয় নেই। লুদী খাঁই সুলেমানের অপরাজেয় হস্তী-যূথ গড়ে তুলেছেন, কারুর সতর্ক-বাণীতে কর্ণপাত না করে। লুদী খাঁই সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত পাঠান সর্দারদের রোষ ও বিদ্বেষ উপেক্ষা করে এদেশীয় কালাপাহাড়কে করেছিলেন সেনাপতি—তার ফলে সুলেমানের রাজকোষে সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যের পাহাড় জমেছে। সারা হিন্দুস্থানের ত্রাস হয়ে উঠেছেন তিনি। মৃত্যুর আগে দিল্লীর বাদশাকে নস্যাৎ করে সুলেমান যে 'আলা-হজরৎ' হতে পেরেছিলেন—সে কার জন্য, লুদী খাঁরই জন্যই কি নয়? নির্বোধ উদ্ধত আত্মঘাতী পাঠান সর্দাররা কার কৌশলে এই দীর্ঘকাল এমন সংহত ও সংযত হয়ে কররাণীদের প্রাধান্য সহ্য করছে—শুধু তাই, নয়—তাদের সিংহাসন রক্ষা করছে, সেও কি লুদী খাঁর জন্য নয়? যে মুহূর্তে লুদী খাঁ সরে দাঁড়াবেন সেই মুহূর্তে এই রাজ্যের ভিত্তি খান্-খান্ হয়ে ভেঙে যাবে। সমস্ত প্রতাপ-প্রতিপত্তি ভেঙে পড়বে তাসের প্রাসাদের মত।

অবশ্য সুলেমান যত দিন বেঁচেছিলেন সে বিশ্বস্ততার মর্যাদা দিতে পশ্চাৎপদ হন নি। বলতে গেলে মাথায় করে রেখেছিলেন মিয়া লুদী খাঁকে। ইদানীং উজীরের কোন কাজেরই কৈফিয়ৎ চাইতেন না সুলতান, তিনি জানতেন যা করেন লুদী খাঁ তাঁরই কল্যাণের জন্য, আর না ভেবে চিন্তে অকারণেও কিছু করেন না।

কিন্তু উজীর ভাল হলেই চলে না শুধু—রাজাকেও ভাল হতে হয়।

সুলেমান চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গেই কররাণী-বংশের সৌভাগ্য-সূর্যও চোখ বুজলেন যেন। সিংহাসনে বসল অপদার্থ বায়াজিদ। তার ঔদ্ধত্য,

হঠকারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় এত দিনের পাঠান ঐক্য খান্ খান্ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সুলেমান কররাণীর জামাতার হাতে নিহত হয়ে বায়াজিদ নিজের অপদার্থতার মূল্য শোধ করে গেল।

লুদী খাঁ নিজেও এই উদ্ধত লোভী ও লম্পট তরুণের হাতে কম অপমানিত হন নি, কিন্তু তবু একথা কেউ বলতে পারবে না যে লুদী খাঁ তাঁর নিমকের অমর্যাদা করেছেন। বায়াজিদ যাই হোক—সে তাঁর প্রভুর পুত্র, ন্যায়ত প্রভু। তার মৃত্যুর শোধ না নিয়ে তিনি থাকবেন কী করে? তাই সহস্র গুণে যোগ্য জেনেও হানসুকে তিনি বধ করিয়েছিলেন এবং আর এক অপদার্থ—এই দায়ুদ কররাণীকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

দায়ুদ আরও অপদার্থ, তা জেনেও একাজ করেছিলেন তিনি। দায়ুদ যাই হোক—সুলেমান কররাণীর পুত্র, এ সিংহাসন যে তার পিতারই! সেদিন খোদা বুঝি অলক্ষ্যে হেসেছিলেন লুদী মিয়ার এই কাণ্ড দেখে।

লুদী ভুলে গিয়েছিলেন যে মাটি তারই, যে এ মাটির মর্যাদা জানে। যে শাসন করতে পারে না সে শাসক নয় কখনও। বাপের ছেলে—শুধু এই পরিচয়ই এতবড় একটা দেশের শাসনকর্তা-রূপে পরিচিত হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সুলেমান কররাণীর ছেলেকে হত্যার শোধ তাঁর জামাইকে মেরে নেওয়া লুদীর অন্তত ঠিক হয় নি। এ কথাটা লুদী বুঝলেন নিজের জীবনে চরম মূল্য দিয়ে। যে দায়ুদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সুলেমানের জামাতাকে বধ করলেন তিনি, সেই দায়ুদ সিংহাসনে বসেই সে ঋণ শোধ করল হীন ষড়যন্ত্রে লুদী খাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় জামাতা—দায়ুদেরই জাঠতুতো ভাই ইউসুফ্‌কে বধ করে।...আর কার পরামর্শে এই কাজ করল দায়ুদ—না লোহানীদের! যে লোহানীরা মূলত বায়াজিদকে হত্যা করার জন্য দায়ী?

একেই বুঝি বলে ন্যায়বিচার!

ঠিকই করেছ খোদা, ঠিকই করেছ।

ধন্য ধন্য তুমি!...মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে দৃষ্টি, তাই তোমার কাজের অর্থ প্রথমটা ধরা পড়ে না।...আবার তুমিই এক সময় তোমার দিব্যজ্যোতি দিয়ে চোখ খুলে দাও, দেখিয়ে দাও তোমার অভ্রান্ত বিচার। ধন্য, ধন্য!

॥ ২ ॥

কিন্তু লুদী খাঁ নিমকহারামী করেন নি তবুও।

ইউসুফের শোক দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছেন। এক দিনও, ক্ষণেকের তরেও রাষ্ট্রের কাজে অবহেলা করেন নি। দাযুদের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ চিন্তা করেন নি।

আজ নিজের গৃহ থেকে, আত্মীয়স্বজন থেকে এতদূরে এসে পড়ে আছেন সে-ও ত দাযুদেরই কল্যাণের জন্য। এখনও দিনরাত সেই কর্তব্যই চিন্তা করে যাচ্ছেন তিনি—সাধ্যমত।

খবর এসেছিল—গুজর খাঁ বিদ্রোহী হয়ে পাটনায় বায়াজিদের শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছে, বহু পাঠান আমীরই ঝুঁকছেন ওইদিকে। এই বিপদ থেকে দাযুদকে রক্ষা করতেই লুদী খাঁ ছুটে এসেছিলেন এখানে, কিন্তু পৌঁছে শুনলেন যে এর চেয়েও বৃহত্তর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে কররাণীদের মাথায়। দিল্লীশ্বর আকবর তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠিয়েছেন--কররাণীদের ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা দমন করতে।

আর এই বিপদ মূঢ় বায়াজিদ ও দাযুদ শখ করে ডেকে আনল শেষ পর্যন্ত।

সুলেমান শক্তিমান ছিলেন। প্রচণ্ড শক্তিমান। হয়ত সেই জন্যেই নির্বোধ ছিলেন না। স্বাধীন নৃপতির মতই দেশ শাসন করেছেন তিনি কিন্তু কখনও সে কথা স্বীকার করেন নি। সর্বদা আকবরকে বাদশা বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর নামেই 'খৎবা' পাঠ করিয়েছেন, মুদ্রা ঢালাই করেছেন। তাঁর শতাংশের একাংশ শক্তিও নেই এই অপদার্থগুলোর, অথচ সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বাদশার আধিপত্যকে বাতাসে উড়িয়ে দেবার শখটুকু আছে। এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে! এটুকুও জানে না যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে!

ওরা না জানুক, লুদী জানেন।

গুজর খাঁও জানে বৈকি।

তাই দুজনের ঝগড়া মিটিয়ে হাত মিলোতে দেরি হয় নি। আকবর বাদশা এলে দাযুদ বা বায়াজিদের ছেলে, কেউ থাকবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যই এক হওয়া দরকার। বাইরের প্রবল শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার মত মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না।

শুধু দুজনে যে হাত মিলোলেন তাই নয়—প্রচুর উৎকোচে মুনিম খাঁকে বশ করলেন, যাতে বড় রকমের আঘাতটা শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া যায়।

আর যেতও তা—যদি না নির্বোধ দায়ুদ আবারও তাঁকে ভুল বুঝত। তাঁকে—কররাণী-বংশের সব চেয়ে বিশ্বস্ত সেবক লুদী খাঁকে। ওদের বংশের চির শত্রু লোহানীদের সর্দার কতলু তাকে বুঝিয়েছে যে—জামাইয়ের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত লুদী খাঁ নিজেই সিংহাসন চান, তাই গুজর খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি—মুনিম খাঁর সঙ্গেও হাত মিলিয়ে ব্যবস্থাটা কায়েম করে নিচ্ছেন।

ওরে মূঢ়, সে ইচ্ছা থাকলে আজ তোকে আর সিংহাসনে বসতে হত না—হানসুকে হত্যা করার পর সে পথ উন্মুক্তই ছিল সম্পূর্ণ। তিনিই ত পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তোকে বসিয়েছেন বলতে গেলে।

এমন কি, সে ইচ্ছা থাকলে হয়ত অপরাজেয় সুলেমানকে সরিয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত না। বুদ্ধির কাছে শৌর্য কতটুকু! সুলেমানের সিংহাসনকে তিনিই ত সযত্নে লালন করেছেন, রক্ষা করেছেন—বৃহত্তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চেনে নি, তাঁকে একটুও চেনে নি দায়ুদ। তাই তাঁকে দমন করতে সসৈন্যে এগিয়ে এসেছে এই দেয়া * নদীর সঙ্গম পর্যন্ত। তিনি যদি বেঁকে দাঁড়ান—ওই কটা সৈন্য নিয়ে ওই অপদার্থটার সাধ্য আছে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার?

কিন্তু না—আর না। তিনি শ্রান্ত।

নিক, ওরাই বুঝে-পড়ে নিক। তবে হ্যাঁ—এখনই নয়।

এই শেষবার তিনি রক্ষা করবেন কররাণীদের, আগে দায়ুদ খাঁকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেবেন, তারপর আকবর বাদশার সঙ্গে সন্ধি করে দায়ুদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে মক্কায় চলে যাবেন চিরদিনের মত।

তারপর?

তারপর ওরা বুঝবে। রাখতে পারে রাখবে—না হয় ভাসিয়ে দেবে সব কিছু। তিনি আর ভাববেন না। সুলেমানের বিশ্বাস আর স্নেহের ঋণ এই শেষবারের মত শোধ করে বিদায় নেবেন তিনি চিরদিনের জন্য।

* সরযুর অপর নাম দেয়া। যে সময়ের কাহিনী বলা হচ্ছে মিয়া লুদী তখন গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমের কাছে অবস্থান করছিলেন।

'জনাব !'

'ও—নফিসা ! হ্যাঁ, কী রে ?'

আবারও যেন ঘুম ভাঙে তাঁর।

'আপনি কী সব ছাই-ভস্ম ভাবছেন আবার। শুধু শুধু ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে ফেলছেন। চলুন দেখি—শুয়ে পড়বেন আমার কোলে মাথা দিয়ে···আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই ঘুম আসবে দেখবেন।'

'এখনও নমাজ পড়া হয় নি যে রে।'

'তবে সেরে নিন।'

'এই যে যাচ্ছি।'···

মনে পড়েছে কারণটা তাঁর, মনে পড়েছে। তিনি মরতেও পারতেন হাসি-মুখে। এ পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তা তিনি জানেন। দায়ুদ তাঁর প্রাণ নিয়ে সুখী হবে, শান্ত হবে—এ জেনে সানন্দেই তাঁর প্রাণ দেবার কথা। জরাজীর্ণ খাঁচাটাকে বাঁচাবার জন্য কোন হাঙ্গামা করারই কথা নয় তাঁর।

তবু যে তিনি করছেন, এখনও যে সব ফেলে চলে যেতে পারছেন না—তার কারণ বোধহয় এই মেয়েটা।···

চিরকাল এই গর্বই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী যে—চিরজীবন তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়লেই চলে যাবেন, কোনদিকে ফিরে তাকাবেন না। কিন্তু সে গর্ব বুঝি আর রাখতে পারছেন না।

এ কী বেড়ি পরালেন খোদা তাঁর পায়! ফুলের বেড়ি—কিন্তু লোহার চেয়েও কঠিন হয়ে চেপে বসেছে যে! আর সে বেড়ি তিনি প্রায় স্বেচ্ছায়ই পায়ে পরলেন।

এই ত সেদিনের কথা। আজও স্পষ্ট মনে আছে।

রাজ্যের উত্তর সীমান্ত পরিদর্শন করতে গিয়ে কামতাপুরের হাটে দেখেছিলেন কতকগুলি ক্রীতদাসী বিক্রি হতে, তরুণী সুশ্রী ক্রীতদাসী। কেউ ইরাণী, কেউ তুরানি, কেউ আর্মানি। এদেশের পূর্ব সীমান্তের মেয়েদের সঙ্গে বিদেশী মুসলমানের সংমিশ্রণে দো-আঁশলাও ছিল কিছু কিছু।

ওতে কোন প্রয়োজন ছিল না লুদী খাঁর। এক লহমার বেশী তাই ফিরেও তাকান নি।

দুর্বার দুঃসাহসী লুদী খাঁ চিরদিনই একা একা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে ভাল-

বাসেন—সকালে বিকালে খানিকটা করে এমনি না বেড়ালে শুধু যে শরীর ভাল থাকে না তাই নয়—বুদ্ধিও খোলে না। দরবারে ও প্রাসাদে সহস্র লোকের কচ্‌কচির মধ্যে তাঁর নাকি কোন কথা চিন্তা করার অবসর মেলে না—ঐ ছুটে বেড়াবার সময়টাই তাঁর ভাববার সময়। রাষ্ট্রের সমস্ত সমস্যাই নাকি ওই ভাবে একা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সমাধান করেন তিনি।

সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েই মানুষ বিকিকিনির হাটে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি—কিন্তু সেখানে থামেন নি—সে হাট পিছনে ফেলে বহুদূর চলে গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ অন্যমনস্ক হয়ে যেতে যেতে অনেকটা গিয়ে পড়েছিলেন। ফেরবার পথে আবার যখন হাট পেলেন, তখন সে হাট ফাঁকা—যে যার বেচা-কেনা শেষ করে চলে গিয়েছে। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত লুদী খাঁ পথ ছেড়ে একটু বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলেন নদীর খোঁজে। হাটে দু-একটি দোকান ছিল, পুকুরও ছিল একাধিক। কিন্তু সেখানে জল খেতে প্রবৃত্তি হয় নি। তাছাড়া নদীর ধারে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নিজেও একটু বিশ্রাম করবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা—জল ত খাবেনই।

কিন্তু নদীর ধারে পৌঁছতে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। দুটো পাঠান একটা তরুণী মেয়েকে নদীর ধারে ফেলে নানা রকমে পীড়ন করছে। পৈশাচিক পীড়ন। মেয়েটার হাত পা বাঁধা, গলায় শিকল। সেই অবস্থায় চলেছে সেই নির্যাতন। নিষ্ঠুরতায় ও বর্বরতায় যেন তারা স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। অনেক ভেবে ভেবে বেছে বেছে যেন সেই নৃশংসতার পদ্ধতিগুলি মাথা খাটিয়ে বার করেছে তারা।

মেয়েটার মুখ—যতটা দেখতে পেলেন—যেন তাঁর কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে পরিচিতই বোধ হল। আর একটু দেখে মনে হল—সম্ভবত আজ সকালের হাটে দেখেছেন একে—দাসীর কাঠগড়ায়। একবার দেখেও বহুদিন মনে করে রাখতে পারেন লুদী খাঁ—তাই অন্যমনস্ক হয়ে দেখলেও খানিকটা মনে আছে তাঁর।

স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন লুদী খাঁ খানিকটা। এ রকম কখনও শোনেন নি, কখনও ভাবেন নি। এ যেন সমস্ত রকম কল্পনার অতীত।

এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে প্রতিবাদ বা প্রতিকার ত দূরের কথা —হাত পা নাড়বারই ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল তাঁর। একেবারে মেয়েটারই

একটা অস্ফুট আকুল আর্তনাদে সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। দ্রুত কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কী করছ তোমরা? তোমরা মানুষ না পশু!'

তারা কী সব কটূক্তি করে উঠল। এক জন নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে উত্তর দিল, 'বেশ করছি। এ আমাদের কেনা বাঁদী। যা খুশী করব বলেই কিনে এনেছি। মেরে ফেললেই বা কী?'

আর একজন সঙ্গে সঙ্গেই ধুয়া ধরলে, 'তুমি তোমার কাজে যাও। নিজের চরকায় তেল দাও গে —'

লুদী খাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, তবু তিনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'বাঁদীই হোক, আর বান্দাই হোক, খোদার সৃষ্ট মানুষের ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার করার অধিকার কারও নেই, তোমরা ছেড়ে দাও ওকে!'

প্রায় একসঙ্গেই আর একটা কুৎসিত কটূক্তি করে দুজনেই লাফিয়ে উঠল। দুজনেই বার করল হাতিয়ার।

শুধু যে ওরা লুদী খাঁকে চিনতে পারে নি তাই নয়—ওঁর শক্তি সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারে নি। পক্ক-কেশ বৃদ্ধ দেখে অথর্বই ভেবেছিল হয়ত।

সেই দুটো নরপশুকে চিরকালের মত নিরস্ত্র করতে দুই লহমার বেশী সময় লাগে নি লুদী খাঁর। দুইজনেরই দুটি করে হাত কেটে ফেলে মেয়েটিকে বন্ধনমুক্ত করে লোকালয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

সেই মেয়েই এই নফিসা। সকালের হাটে যে দো-আঁশলা মেয়েদের বিক্রি হতে দেখেছিলেন, এ তাদেরই এক জন।

বীর্যশুল্কে নারী গ্রহণ এমন কিছু অভিনব নয়- তাঁর মত প্রৌঢ়ের পক্ষেও। বরং তখনকার দিনে ব্যাপারটা সহজ ও স্বাভাবিক মনে হবারই কথা। এ ঘটনায় সকলেই তাই মনে করেছিল ব্যক্তিগত সেবিকারূপেই নফিসা তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে। কিন্তু লুদী খাঁর সে প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি স্থির করলেন যে এই রূপসী মেয়েটি তিনি উপহার দেবেন তাঁর পুত্রাধিক জামাতা ইউসুফকে। সে রসিক লোক, এ উপহারে খুশীই হবে।

কিন্তু রাজধানীতে ফিরে এসেই ওই মর্মান্তিক সংবাদ পেলেন।

এতদিনের অক্লান্ত ও বিশ্বস্ত সেবার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছেন সুলতান, লুদী খাঁর জামাতাকে বধ করে।...

সে কথা যাক—

সে কথা ভোলাই উচিত, ভুলেছেনও লুদী খাঁ। খোদার মর্জি, নইলে অমন বীর পুত্র তাঁর, এমন শোচনীয় ভাবে মরবে কেন!···

না, ও কথা নয়—নফিসার কথা। নফিসার কথাই ভাবছিলেন তিনি।···

তারপর শোকার্ত লুদী খাঁ এই সর্বনাশা অপয়া মেয়েটাকে দান করতে চেয়েছিলেন কোন ভাল আমীরের হাতে। এমন কি সৎপাত্র দেখে বিবাহ দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটা অদ্ভুত। সে একেবারে বেঁকে বসল। আজ এখনও যেমন ওঁর পা দুটো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে, সেদিনও ঠিক অমনিই ধরেছিল আঁকড়ে। বলেছিল, ওরা পাহাড়ী মেয়ে, যে ওদের প্রাণ বা ইজ্জৎ রক্ষা করে—সে-ই ওদের মালিক। মালিক বদল করার রীতি নেই ওদের দেশে। নফিসাও করতে প্রস্তুত নয়। ওঁকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না—কারুর কাছে যেতে রাজি নয় সে। সুলতানের প্রাসাদ—এমন কি বেহেস্তেও যেতে চায় না, ওঁর পায়ের তলাই তার বেহেস্ত! আর যদি মালিক পায়ে না রাখেন ত ওঁর সামনেই সে নিজের প্রাণ নিজের হাতে বার করে দেবে। তারপর প্রাণহীন দেহটা তিনি যেন যেখানে খুশী পাঠান।

অনেক করে বুঝিয়ে বলেছিলেন লুদী খাঁ। অনেক লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বরং বলা চলে উল্‌টো ফল হয়েছে। সেই থেকে একদণ্ডও সে ওঁকে চোখের আড়াল করতে চায় না—সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ছায়ার মতন। সেই জন্যেই এই সুদূর প্রবাসে যুদ্ধক্ষেত্রেও সঙ্গে আনতে হয়েছে ওকে।

আর ওর জন্যেই—স্বীকার করতে লজ্জা নেই ওঁর—নতুন করে যেন জীবন সম্বন্ধে একটা মমতা বোধ করছেন।

॥ ৩ ॥

নফিসা ভালবাসে তাঁকে, একান্ত, একাগ্র ভাবে ভালবাসে। তা লুদী খাঁ জানেন। কিন্তু কীভাবে ভালবাসে সে—সেটা আজও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেন নি তিনি।

সে কি তাঁকে বাপের মত দেখে?

না—ভাইয়ের মত?

না—প্রেমাস্পদের মত ?

এক এক সময় এক এক রকম মনে হয় তাঁর। কেবল যখন মনে হয় সে তাঁকে প্রেমিকরূপেই পেতে চায় তখনই বিপুল সংশয় মনে জাগে—এও কি সম্ভব ? প্রায় ষাট বছর বয়স তাঁর, আর ঐ মেয়েটা, বড় জোর উনিশ কি কুড়ি হবে—তার পক্ষে তাঁকে ওই ভাবে ভালবাসা কি সম্ভব ? অথচ যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তার আচার-আচরণে, যে অকুণ্ঠ ব্যবহার তার—তাকে অন্য কোন সম্পর্ক দিয়েও ত ব্যাখ্যা করা যায় না !

সংশয়ের নিরসন হয় না কিছুতেই।

যে ভাবে সে নিরসন হতে পারত, সম্পর্কের যে অন্তরঙ্গ পরীক্ষায়—লুদী খাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থায় সে পরীক্ষায় রুচি হয় নি।

থাক্ না। যে ভাবেই হোক সে ওঁকে ভালবাসে। এই পর্যন্তই থাক্ না। এই ত যথেষ্ট। কী হবে তার চেয়েও বেশী জেনে ? রমণীর হৃদয়-রহস্য নিয়ে গবেষনা করবার আর প্রবৃত্তি নেই তাঁর।

'জনাব !'

'হ্যাঁ রে—এই উঠি।'

রাতের নমাজ এখনই সেরে নেবেন তিনি। তারপর শুতে যাবেন। সূর্যাস্তের পর কোন দিনই আহার করেন না, সে পাট নেই। আজ অবশ্য অপরাহ্নেও খাওয়া হয় নি—চাকর বার বার ডেকে ফিরে গেছে—কিন্তু তা না হোক, একদিন না খেলে কিছুই এসে-যাবে না। তবে এও তিনি জানেন যে তিনি না খেলে ওই মেয়েটাও খাবে না। তাঁর সঙ্গে সে-ও রাত্রের খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তিনি শুতে গেলেই সে-ও কাছে গিয়ে বসবে, গায়ে মাথায় হাত বুলোবে, যতক্ষণ না ওঁর ঘুম আসে, তারপর ওঁরই পায়ের কাছে জড়-সড় হয়ে শোবে সে-ও। ওঁর পা-দুটিতেই যেন ওর সবচেয়ে লোভ !

'ওজু করবার জল দে নফিসা।'

উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার বাইরের দিকে তাকান। এখনও অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলেছে। নদী নালা বুঝি সব এক হয়ে যাবে। যে সব সৈন্যরা পরীখা কেটে আছে কিংবা নিচু জায়গায় তাঁবু ফেলেছে তাদের দুর্দশার শেষ থাকবে না। তাঁর এই জায়গাটা খুব উঁচু—তাঁর তাঁবু বা তাঁর আশে-পাশে যে কটা তাঁবু আছে সেগুলোতে জল ওঠবার ভয় নেই, সে দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত—কিন্তু ওদের কী হবে কে জানে !

হয়ত তাঁর একবার যাওয়া উচিত ছিল, দেখে আসা প্রয়োজন ছিল ওদের অবস্থাটা—কিন্তু কে জানে কেন আজ আর ইচ্ছে করছে না বেরোতে। আজ থাক্। যা আছে খোদার মর্জিতে তাই হোক। লুদী খাঁ আর ভাবতে পারেন না।...

চিন্তাক্লিষ্ট, উত্ত্যক্ত, শোকদগ্ধ চৈতন্যও আস্তে আস্তে সুপ্তিতে ডুবে যায়—নফিসার জাদু-করস্পর্শে। লুদী খাঁর বয়স হলেও আফগান রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে—এখনও তরুণী মেয়ের যৌবনোষ্ণ স্পর্শ তাঁর রক্তকে চঞ্চল করে তোলে—কিন্তু নিজেকে সম্বরণই করেন মিয়া লুদী। মেয়েটাকে তিনি আজও চিনতে পারেন নি। পাছে ভুল করে বসেন, পাছে ওর চোখে ছোট হয়ে যান—এই ভয়ে সংযমের প্রবল প্রাচীর রচনা করেন কেবলই নিজের প্রবৃত্তির চার পাশে। সে প্রাচীরে মাথা কুটে মন ক্ষতবিক্ষত হয় বটে কিন্তু তেমনি সে তার পারিপার্শ্বিককেও ভুলে যায় সহজে, তাই সহস্র চিত্ত-বিক্ষোভের মধ্যেও চোখের পাতায় তন্দ্রা নামতে দেরি হয় না।

তন্দ্রাই—কিন্তু সে তন্দ্রা ক্রমশ গভীর ঘুমে পরিণত হয়। তাই লুদী টের পান না কখন বৃষ্টি থেমেছে। কখন নিস্তব্ধ প্রান্তর অশ্বপদশব্দে চকিত হয়ে উঠেছে তাও জানতে পারেন না। একেবারে ঘুম ভাঙে তাঁর রহমতের ডাকে। সুলতান দূত পাঠিয়েছেন জরুরী খৎ দিয়ে, সে এখনই একবার তাঁর দেখা চায়।

'কে—কে দূত পাঠিয়েছে?'

বিস্মিত লুদীর মাথাতে যেন কথাটা ঢোকেই না।

'মহামান্য সুলতান।'

'ও।'

খানিকটা চুপ করে বসে থেকে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান।

'বসতে বল, আমি যাচ্ছি।'

নফিসা জড়িয়ে ধরে তাঁকে, 'দরকার নেই মালিক—রহমৎ বলুক যে আপনার শরীর ভাল নেই, কাল সকালের আগে দেখা হবে না। ...এত রাত্রে কী দরকার তাঁর? আমার—আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছে!'

হেসে ওর মাথায় হাত বুলোন মিয়া লুদী।

'ভয় কী রে? এ আমার এলাকা। এখানে একজন দূত আমার কী

করবে !...তাছাড়া হাজার হোক সুলতান আমার মনিব, আমার প্রাক্তন মনিবের ছেলে।...তাঁর দূতকে ফিরিয়ে দেবার অধিকার আমার নেই!'...

তিনি রহমতের সাহায্যে দ্রুত পোশাক বদলাতে শুরু করেন।

দায়ুদের চিঠি এবং দূতের বক্তব্য একই।

সুলতান দায়ুদ কররাণী তাঁর কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত। লুদী খাঁ পিতৃহীন সুলতানের পিতার মতই—আশা করা যায় যে তিনি নাবালক পুত্রের হঠকারিতা মার্জনা করবেন। বিষম বিপদ আজ উদ্যত খড়্গের মতই কররাণী-বংশের মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে, প্রবল শত্রু সামনে। এ সময় যদি সামান্য অভিমানবশে লুদী তাঁর এই সন্তানের ওপর বিরূপ হয়ে থাকেন ত কররাণী-বংশ শুধু নয়—পুর্ব-ভারতের সমস্ত পাঠানরাই ধনে প্রাণে বিপন্ন হবে। লুদী খাঁ যদি দায়ুদকে ক্ষমা না করেন ত আত্মহত্যা ছাড়া দায়ুদের আর কোন উপায় থাকবে না। এখনও যদি লুদী তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপুর্ব সংগঠনশক্তি এবং অপরিসীম শৌর্য নিয়ে এসে পাঠানদের পুরোভাগে বা শিরোভাগে দাঁড়ান, তাহলে আকবরকে প্রতিরোধ করা এমন কিছু কঠিন হবে না। গুজর খাঁ সমস্ত মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে ওঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন লুদী খাঁ যদি আসেন, দায়ুদ ওঁর যা ক্ষতি করেছেন—যে কোন রকমে তা পুরণ করে দিতে রাজী আছেন।

এর পর আরও একটি বক্তব্য ছিল।

দায়ুদ খবর পেয়েছেন আকবরের সৈন্য কারা-মানিকপুর পার হয়ে এগিয়ে এসেছে। আজই এ বিষয়ে জরুরী পরামর্শ ও ইতিকর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন। লুদী খাঁ অনুগ্রহ করে এখনই যদি একবার আসেন ত ভাল হয়। আর তা হলে দায়ুদ এ-ও বুঝবেন যে—লুদী তাঁকে ক্ষমা করেছেন।

লুদী নীরবে বসে সব বক্তব্য শুনে দূতকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরের ঘরে এলেন।

পর্দার পাশেই পাংশু বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল নফিসা। লুদী যেতেই সে সজোরে জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

'তুমি যেও না। তোমাকে আমি যেতে দেব না মালিক।'

হাসলেন লুদী। ম্লান নয়—বরং প্রশান্ত বলা যেতে পারে সে হাসিকে। বললেন, 'তা হয় না নফিসা। কররাণীদের বহুৎ নিমক আমি খেয়েছি।

সেই বংশের ছেলে বিপদে পড়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছে, অনুরোধ জানিয়ে—আমার পক্ষে একটি পথই খোলা আছে, সে অনুরোধ রক্ষা করা। ...দায়ুদ যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করে, অনুনয় না করে আমাকে আদেশ জানাত তাহলেও আমাকে যেতে হত নফিসা। দায়ুদ যাই মনে করুক—আমি ত বিদ্রোহী হই নি। আজও সে আমার মনিব।'

'কিন্তু—কিন্তু ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে মালিক। নইলে এতরাত্রে ওদের কিসের প্রয়োজন!'

'তুমি' এর আগে কখনও বলে নি নফিসা। সম্পর্কের এই অধিকতর অন্তরঙ্গ স্বরটি লুদী সহস্র দুশ্চিন্তার মধ্যেও উপভোগ করেন বৈ কি!

মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে বলেন, 'সে সম্ভাবনা আছে নফিসা। তা-ই বেশী সম্ভব। কতলু লোহানী আর গুজর খাঁ—ওরা দু'জনেই আমাকে ঈর্ষা করে তা আমি জানি। ওরা জানে যে আমি জীবিত থাকতে দায়ুদের অনিষ্ট করতে পারবে না ওরা—তার রাজ্যখণ্ড ভাগ করে নিতে পারবে না। তাই নির্বোধ দায়ুদকে দিয়ে এ কাজ করানো বিচিত্র নয়, আর দায়ুদের পক্ষেও এইটেই স্বাভাবিক। বেকুফগুলো জানে না—সিন্ধুর মরুভূমে যে দিন জালালউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন ওখানকার আকাশে যে গ্রহতারকার সমাবেশ হয়েছিল —এমন আর কোথাও কোন দিন হয় নি। সে সমাবেশে জাতক পৃথিবীজয়ী, দিগ্বিজয়ী হয়। তার সামনে এই উদ্ধত, মূর্খ, নির্বোধ পাঠানের দল অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলি রাশির মত উড়ে চলে যাবে। এ ত আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে বোঝার মত বিদ্যা ও বুদ্ধি ওদের নেই, ওদের পক্ষে আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাটাই স্বাভাবিক।...কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই—আমি প্রস্তুতই আছি। শুধু বন্ধন বলতে এখন তুই-ই আছিস নফিসা।...তাই রওনা হবার আগে তোর একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই;... রহমৎ আমার বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর, ওর সঙ্গেই তুই চলে যা। তুই ঘোড়ায় চড়তে জানিস, কোন অসুবিধা হবে না। গঙ্গার ওপারে হাজিপুরে আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেখানে মাটির নিচে কিছু টাকাকড়িও পোঁতা আছে—রহমৎ সব জানে—'

নফিসা ওর পদ্মকোরকের মত হাত দিয়ে লুদী মিয়ার মুখটা চেপে ধরে।

'কী পাগলের মত যা তা বকছ মালিক! তোমার কী হয় তা না জেনে এখান থেকে আমি এক পা নড়ব না।'

'তারপর ? যদি সত্যিই আমার অনিষ্ট হয় কিছু, তখন ?'

'তখনই ত আমার দরকার। তুমি কি ভাবো মালিক, তোমাকে যদি ওরা হত্যাই করে সে হত্যার শোধ নেব না আমি ? কররাণী বংশের সর্বনাশ না করে তোমার রক্তের দাম সুদসুদ্ধ উশুল না করে আমি শুধু চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমার সেই হাজিপুরের কোটরে গিয়ে ঢুকব ?'

'তুই কি করবি রে পাগলী। একা একা মেয়েছেলে,—তায় ছেলেমানুষ ! না না, মিছিমিছি দেরি করিস নি। পরে যদি আর না যেতে পারিস—যদি তোদেরও কোন বিপদ হয় ?'

'আমরা পাহাড়ী মেয়ে মালিক। যার কাছে মানুষ সে বিক্রি করেছিল ক্রীতদাসী হিসেবে—তাই সেদিন সব সহ্য করেছি। ধর্মের ওপর আমরা কথা বলি না। কিন্তু তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, বার বার বলেছ, আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত ! সুতরাং আর কোন পরোয়া আমি করি না।...তুমি এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও মালিক যে, ওরা যদি তোমার সঙ্গে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে ত, তার দশগুণ প্রতিফল ওরা পাবে। এই তোমাকে ছুঁয়ে আমি শপথ করছি—সে বেইমানীর শোধ না নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব না !'

গলার কাছে কি কিছু একটা ঠেলে উঠতে চাইছিল লুদী মিয়ার ? তাই কি গলাটা অত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঠেকছিল ?

'তাহলে আমাকে বিদায় দে নফিসা।'

নিজের সংকল্পের আবেগে কিছুকালের জন্য জ্বলে উঠেছিল নফিসা—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ওপর থেকে সে দীপ্তিটুকু নিঃশেষে মুছে গেল। যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে একবার নিষেধ করতে গেল সে—কিন্তু তারপরই বৃথা জেনে সে চেষ্টা ত্যাগ করলে। শুধু স্খলিত, ভগ্নকণ্ঠে কেমন একরকম অসহায় ভাবে বললে, 'এখনই যাবে তুমি—সত্যিই চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ নফিসা। দূত অপেক্ষা করছে। তাছাড়া জরুরী কাজ বলছে—আর অপেক্ষা না করাই ভাল।'

'তবে যাও।'

বলে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় নফিসা। হয়ত বা উদ্গত অশ্রু দমন করতেই। অথবা অভিমানভরেই—কে জানে !

একটু ইতস্তত করেন মিয়া লুদী। যেন কিছু বলতে চান ওকে, যেন

একটু আদর করে যেতে ইচ্ছা হয় তাঁর যাবার আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সম্বরণ করে বাইরের দিকেই পা বাড়ান।

নফিসাও কিছু আশা করেছিল কি না কে জানে। হয়ত যাবার আগে বিদায়-সম্ভাষণ একটা, স্নেহের এতটুকু নিদর্শন! সামান্য একটু স্মৃতি, যৎসামান্য পাথেয়।...লুদী খাঁকে নিঃশব্দে চলে যেতে উদ্যত দেখে সে আশা ওর যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে।

তবে তাই বলে এই, হয়ত বা শেষ মুহূর্তে, অভিমান করে থাকতে পারে না সে—পর্দা হাতে করে সরাচ্ছেন লুদী এমন সময় ছুটে এসে দুহাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে—এবং ছেলেমানুষের মতই ঝুলে পড়ে ওঁর ওষ্ঠে ললাটে ও দুই চোখের ওপর উন্মত্তের মত চুমো খেতে থাকে!

'মালিক! মালিক! তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে যেও না আমাকে, এমন করে ছেড়ে যেও না!' অস্ফুট মিনতি চাপা আর্তনাদের মতই শোনায়।

লুদীও ওকে সবলে ও সজোরে চেপে ধরেন বুকে। বুক ভরে যায় তাঁর।

আজ তিনি প্রসন্ন, আজ তিনি তৃপ্ত। নিশ্চিন্তও। এতদিনের সংশয়ের অবসান হয়েছে তাঁর। আজ ওর বুকের মধ্যেটা কিতাবের মতই পড়তে পেরেছেন তিনি।

নফিসার কানে কানে বলেন, 'আর আমার কোন ক্ষোভ, কোন অতৃপ্তি রইল না নফিসা। যদি মরি তাতেও কোন দুঃখ নেই আর। এ জগতে যেমন বে-ইমানী দেখলাম—তেমনি ইমানদারী আর নিঃস্বার্থ ভালবাসাও তো দেখে গেলাম। ধন্য খোদা!'

॥ ৪ ॥

দায়ুদ খাঁ কররাণী হতাশ হয়ে তাকান ওপারের দিকে। নির্বোধের মতই বার বার প্রশ্ন করেন, 'এসে গিয়েছে? একেবারে এসে গিয়েছে?'

অথচ এসে যে গিয়েছে, তা ত তিনি খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

গঙ্গার ওপারে হাজীপুর। কিলাটা ওঁর সামনা-সামনি। উনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—একটা সরলরেখা টানলে বোধহয় সে রেখার প্রান্ত হাজীপুর কিলার দক্ষিণ দরওয়াজায় পৌছয়। কিলায় কররাণীদের পতাকা আর নেই—সেখানে আবার উড়েছে দিল্লীশ্বরের পতাকা। মুঘল পতাকা

উড়ছে পৎপৎ করে। কিলার চারিদিকে ঘিরে যে বিপুল সৈন্যদল উল্লাস-উৎসব জুড়েছে—তাদের মাথাতেও মুঘল সৈন্যেরই শিরস্ত্রাণ।

অর্থাৎ আকবর বাদশা নির্বিবাদে হাজীপুর এসে পৌছেছেন এবং কিলা দখল করেছেন।

আবারও বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করেন শ্রীহরি গুহকে; শ্রীহরির বুদ্ধির ওপর দায়ুদের বড় ভরসা, সে সামান্য আমিন থেকে দেওয়ান হয়ে উঠেছে এবং আজ সে ছাড়া তাঁর রাজকোষ ও রাজস্বের খবর কেউ রাখে না।—তাঁকেই উদ্দেশ করে বলেন 'কিন্তু আমার যে অনেক ফৌজ ছিল শ্রীহরি, তারা কি একটা লড়াইও করলে না। একেবারে বিনা চেষ্টায় ছেড়ে দিলে কিলাটা? কিলার মধ্যেও যদি বসে থাকত তো—সে কিলা দখল করতে ওদের তিন মাস লাগত!'

শ্রীহরি গুহের বহু গুণের মধ্যে একটা গুণ এই যে তিনি স্পষ্ট-বক্তা। স্বয়ং সুলতানের মুখের ওপর সত্য কথা বলতেও খুব একটা ভয় নেই তাঁর—কারণ হয়ত তিনি জানেন যে, যে-বস্তু ছাড়া রাজার রাজত্ব চলে না, সেই বস্তুর হিসাবটি তাঁর হাতে।

শুষ্ক স্বরে শ্রীহরি বলেন, 'ফৌজ তো রেখেছিলেন জাহাঁপনা ঠিকই কিন্তু ফৌজদার বলতে যারা তারা তো সবাই এপারে—লড়াই করার হুকুমটা দেয় কে!···তাছাড়া আকবর বাদশা বড় সাংঘাতিক শত্রু জাহাঁপনা—এ মুনিম খাঁ নয় যে দুটো স্তোক দিয়ে ভোলাবেন। এ লোকটার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। সেই জন্যই স্বর্গত উজীর সাহেব ওকে চটাতে চান নি! আপনি তাঁকে মারলেন মারলেন—তাঁর বুদ্ধিতেও যদি চলতেন।'

লুদী খাঁর হত্যাটা—এইভাবে বেইমানী করে তাঁর করুণা এবং বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে ভুলিয়ে এনে, এমন কাপুরুষের মত নিরস্ত্র বৃদ্ধকে হত্যা করাটা শ্রীহরির আগাগোড়াই ভাল লাগে নি। শ্রীহরি বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমানের মর্যাদা তিনি বোঝেন!

সম্ভবত এই কথাটাই দায়ুদও ভাবছিলেন, কিন্তু নিজের দুর্বলতাটা অপরের মুখে শুনতে চায় না কেউ—তিনি বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন, 'তুমি চুপ কর শ্রীহরি, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা কইতে এসো না। রাজ্যটা আমার—না তোমার?'

'আজ্ঞে না। আপনারই। লুদী মিয়া অনেক মেহনৎ করে আপনাকে বসিয়েছিলেন এ তক্তে!'

'আবার!' দায়ুদ তীব্র ধমক দেন।

এবার শ্রীহরি চুপ করে যান। চাকরীর মায়া তাঁর নেই। গত কয়েক দিন ধরেই তিনি বিদায় চাইছেন সুলতানের কাছে—কিন্তু জানের মায়া আছে। হাজার হোক—গোঁয়ার পাঠান, তায় বোকা! ওরা না পারে কী?

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতেও পারেন না। অপেক্ষাকৃত নরম গলাতে বলেন, 'হুজুর অভয় দেন তো একটা প্রশ্ন করি, আপনার বড় বড় ফৌজদার আর পরামর্শদাতা কতলু খাঁ আর গুজর খাঁ—কী বলছেন এ সময়?'

'তারা তোমার মত কাপুরুষ বাঙ্গালী কায়েত নয় শ্রীহরি—তারা ত এখনই লড়াই দিতে চায় তোমার ঐ আকবর শাকে!'

'বেশ তো, দিন না তাঁরা! তাঁদেরই হাজীপুর কিলা রক্ষার জন্য পাঠানো উচিত ছিল আপনার!'

ছিল যে—হয়ত দায়ুদও বোঝেন তা। কিন্তু কেমন করে স্বীকার করবেন যে—এই দুটি প্রধান অবলম্বনকে ছাড়তে সাহস হয় নি তাঁর—নিজেকে বড় অসহায় ঠেকেছিল!···শুধু সেই কারণেই ওপারে যেতে দেন নি তিনি ওদের। লুদী খাঁর মৃত্যুর পর এরা ছাড়া তাঁর বল-বুদ্ধি-ভরসা আর কেউ নেই যে!

না, একথা স্বীকার করা যায় না।

তাই যেটা করা যায় সেইটাই করলেন। শ্রীহরির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি এখন যাও শ্রীহরি, দরকার পড়লে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'যে আজ্ঞে।' কুর্নিশ করে বেরিয়ে যান শ্রীহরি, বেরিয়ে বাঁচেন। বাইরে বেরিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার গলাটায় হাত বুলিয়ে নেন। লুদী খাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চোখের ওপর দেখার পর থেকেই তাঁর অস্বস্তির সীমা নেই। এরা বিশ্বস্ত সেবককে এই পুরস্কারই দেয় আর লাভবান হয় বেইমানরা। বেইমানীর পাঠ এই বয়সে কি নিতে পারবেন শ্রীহরি?···

না, এখন তিনি ভালয় ভালয় বিদায় পেলে বাঁচেন। এসব হাঙ্গামা থেকে অনেক দূরে, সুদূর দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবনের মধ্যে তিনি নিভৃতে একটি নীড় বেঁধেছেন অনেকদিনই—মুক্তি পেলেই সেইখানে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। চাই কি সেখানে কোনদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার চিন্তাও একেবারে দুরাশা বলে বোধ হবে না। কিন্তু—সে ঢের পরের কথা। তার আগে মুক্তিটা পাওয়া দরকার!···

শ্রীহরি বেরিয়ে যেতে দায়ুদ স্থির হয়ে একটা আসনে বসবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। ছটফট করে উঠে এসে আবার গবাক্ষের ধারে দাঁড়ালেন। বহুদূরাগত শব্দ, অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—তবুও ওপারের কোলাহলটা যে জয়ধ্বনি সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। 'আল্লা-হো-আকবর!' মুহুর্মুহু এই শব্দ উঠছে—আন্দাজে সেটাও বোঝা যায়।

ভয় পেয়ে গেছেন দায়ুদ, বড়ই ভয় পেয়েছেন।

হাঁটু দুটো যেন ভেঙ্গে আসছে, হাত দুটোও কেমন যেন স্থির হতে চাইছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে শীতল হিম আতঙ্ক জমাট বেঁধে আছে। ভয় যে পেয়েছেন সেটা মনে মনে অন্তত আর অস্বীকার করা যায় না।

অথচ এমনিতে, স্বাভাবিক ভাবে ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। যতই হোক আকবর একা—ছেলেমানুষ। তাঁরও চারিদিকে প্রবল শত্রু। এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয় নি তাঁর এই বয়সে। কয়েকটা যুদ্ধ জিতেছেন বটে কিন্তু সে সব যুদ্ধে কররাণীদের মত প্রবল প্রতিপক্ষ কেউ তেমন ছিল না।... তাছাড়া এখনও তিনি নদীর ওপারে আছেন—এপারে আসতে গেলেই এঁদের সৈন্য ও অস্ত্রের সামনে পড়তে হবে। সেটা খুব সহজসাধ্য নয়। আর এপারে এলেই বা কি? পাঠানরা তুর্কীদের চেয়ে কম বীর নয়। অপরাজেয় হস্তীযূথ এখনও তাঁর ঠিক আছে। নতুন আমদানী আগ্নেয়াস্ত্র ওদেরও যেমন আছে—তাঁরও তেমনি। তাঁর অধিকারে তিনি আছেন–ওরা এখানে আগন্তুক,সেটাও কম অসুবিধা নয়।

এ সবই জানেন তিনি—কিন্তু তবু—

ওই কিন্তুটাই যে বড় গোলমাল বাধিয়েছে।

কি কুক্ষণেই গুজর কতলুর কথা শুনে লুদী মিয়াকে মেরেছিলেন। লুদী যখন তাঁর কথা বিশ্বাস করে নিশীথরাত্রে একা নিরস্ত্র তাঁর সামনে এলেন তখনই বোঝা উচিত ছিল যে সে বৃদ্ধ সত্যিই তাঁর হিতৈষী, সত্যিই বিশ্বস্ত। আজ তিনি থাকলে এসব কথা দায়ুদকে ভাবতেই হত না। যাদের কথায় এ কাজ তিনি করলেন—তারা যে কত দুর্বল, নির্ভরতার কত অযোগ্য এখন মর্মে মর্মেই বুঝছেন দায়ুদ। কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো বেঁধেছেন তিনি।

তবু সেই লোকসানটাই তো সব নয়।

লুদীর মৃত্যুর পর সে দিন রাত্রের সেই স্বপ্নটা—

স্বপ্ন না সত্য তাই বা কে বলবে!

আজও, অনেক ভেবেও যে সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি তিনি।

অসংখ্য হাবসী প্রহরী দিয়ে ঘেরা তাঁর শোবার ঘরে, তাঁর পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াবে রক্ত-মাংসের কোন মানবী—এ কেমন করে বিশ্বাস করবেন তিনি! পরের দিন মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছেন ওদের—তবু ওরা হলফ্ করেই বলেছে যে তারা ঘুমোয় নি বা পাহারা শিথিলও করে নি—এবং কাউকেই তারা তাঁর ঘরে ঢুকতে কি বেরোতে দেখে নি।

সে প্রহরীদের সকলেই বিশ্বস্ত, বহু দিনের লোক তাঁর। আর সকলেই মিছে কথা বলবে, এই বা কেমন করে সম্ভব হয়।

তবে? কে সে? সত্যই কি অশরীরী কেউ?

অথচ স্পষ্ট মনে আছে দায়ুদের—শেজ্-এর ম্লান আলো হলেও তিনি ভাল করেই দেখেছিলেন—ছায়া পড়েছিল তাঁর সামনের দেওয়ালে। বহু-লোকের মুখেই তিনি শুনেছেন প্রেতাত্মার ছায়া পড়ে না।

মুখের ওপর দম্‌কা এক ঝলক হাওয়া লেগে—সম্ভবত তারই ওড়নার হাওয়া লেগে—ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দায়ুদের। একাই শুয়েছিলেন তিনি—এখানে হারেম আনেন নি ইচ্ছা করেই, স্থানীয় স্ত্রীলোক সংগ্রহ করার মতও মনের অবস্থা নয়—একাই ছিলেন কদিন। হঠাৎ চোখ খুলে নির্জন ঘরের নিভৃত শয্যাপার্শে অপরূপ লাবণ্যবতী এক নারীমূর্তি দেখে ঘুমের ঘোরে তাই বুঝি প্রসন্ন হয়েই উঠেছিলেন। কোথায় আছেন কী অবস্থায় আছেন ইত্যাদি স্থান-কাল পারিপার্শিক ভেবে নিয়ে ভয় পেতে দেরী হয়েছিল।

খোয়াব দেখছিলেন তিনি গৌড়ের রাজপ্রাসাদেই আছেন—আর সেই খোয়াবেরই জের ভেবে ক্ষুধার্ত প্রসন্ন চিত্তে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলেন সেই বিস্ময়মূর্তিকে!

পিছ্‌লে সরে গিয়েছিল সে।

এবং সাপের মত হিস্-হিস্ করে উঠেছিল! কী বলেছিল তা মনে আছে দায়ুদের, বেশ মনে আছে। বোধহয় শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আজও নিরালায় চোখ বুজে বসলেই সেই ফিস্-ফিস্ শব্দ শুনতে পান—কিন্তু তা কি ফিস্-ফিস্ই করে তখনও? কানের মধ্যে যেন মেঘমন্দ্র স্বরে বাজতে থাকে সেই কথাগুলো: 'আমি তোমার অসংখ্য উপপত্নীদের কেউ নই দায়ুদ কররাণী, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার নিহত উজীর মালিক মিয়া লুদী খাঁর আত্মার শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস, মূর্ত প্রতিহিংসা! তোমাকে সতর্ক

করে দিতে এসেছি, সুলেমান কররাণীর অযোগ্য পুত্র, তোমার বেইমানীর শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত হও।...যে রাজ্যের জন্য এত বড় জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে—অকারণ বিশ্বাসঘাতকতা—তোমার সব চেয়ে হিতৈষী পিতৃ বন্ধুর সঙ্গে, সেই বিশাল রাজ্যখণ্ড তোমার খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাবে—তাসের প্রাসাদের মত। দেশ থেকে দেশান্তরে জনপদ থেকে বনে-কান্তারে কোন মতে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে কুকুর বেড়ালের মত বেড়াতে হবে তোমাকে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সহায় বলতে তোমার সেই চরম বিপদের দিনে কেউ থাকবে না।...বেশী দেরিও নেই, ওই এসে পড়েছে আকবর শার বাহিনী, শুরু হয়ে গেছে তোমার শাস্তির প্রক্রিয়া। ঈশ্বরের অভিশাপ আগুনের আখরে ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে, মূর্খ, পার ত সে দৈববাণী পড়ে দেখ। তোমার চরম পরিণতির ইতিহাসই দেখতে পাবে সেখানে! সাবধান!'...

অবশ্য, অসাড় করে দিয়েছিল সে কণ্ঠস্বর। দায়ুদ কররাণী না পেরেছিলেন হাত পা নাড়তে, না পেরেছিলেন চীৎকার করে ডাকতে কাউকে।...

যেমন স্বপ্নের মধ্যে এসেছিল সে মূর্তি, তেমনিই মিলিয়ে গেল। স্বল্পা-লোকের গণ্ডির মধ্য থেকে ঘরের কোণের গাঢ় অন্ধকারে যেন মিশে গেল সে চোখের পলকে—এক লহমার পরে আর কাউকে চোখে দেখতে পেলেন না।

সম্বিৎ ফিরে পেতে দেরি হয়েছিল বৈ কি!

আতঙ্কের অসাড়তা কাটিয়ে কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে, বিছানায় উঠে বসবার ক্ষমতা ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লেগেছিল। তারপর চীৎকার করে ডেকেছিলেন হাব্সী খোজা প্রহরীদের, হাঁক-ডাকেরও অন্ত ছিল না, মার-ধোর নির্যাতন—কিন্তু তবু সে বর্ণনার কোনও জীবিত প্রাণীকে প্রাসাদের ভেতরে বা ধারে-কাছে কোথাও পাওয়া যায় নি।

যেন সত্যিই সে কোন মৃত আত্মার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

বাতাসেই মিলিয়ে গেল বুঝি সত্যি সত্যিই।..

দায়ুদ জানলার কাছ থেকে ফিরে এসে বসেছিলেন নিজের আসনে—কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না। পাগলের মত উঠে পড়লেন আবার। দুর্বল স্খলিত পদেই অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। যেন চিন্তাটা থেকে, সেই অসহ স্মৃতি থেকে পালিয়ে যেতে চাইছেন কোথাও, পারছেন না।

॥ ৩ ॥

ইয়াসিন নিজেকে বড় বিপন্ন বোধ করতে লাগল !

তাতারী প্রহরীদের সর্দার ইয়াসিন বহুকালের লোক, এই মনিবটিকে গত কয়েক বৎসর ধরেই দেখছে, কিন্তু আজও যেন চিনে উঠতে পারল না ঠিক।

আরাম সব লোকই চায়, তাও না হয় ওই 'ছোকরা' চাইল না—কিন্তু বিশ্রাম, সেটা তো প্রয়োজন !

আর যে উন্মাদনায় মানুষ বিশ্রামের কথা ভুলে যায়, সে রকম উত্তেজনা বা উন্মাদনা যে এ অনুভব করে, তাও ত মনে হয় না। কোন উত্তেজনাতেই ত কোনদিন অধীর হতে দেখা যায় নি একে। আর তা ছাড়া সে কারণই বা কৈ ?

যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। কিছু আগেই সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে মুঘল বাহিনীর, হাজীপুরের কিলা ওদের পদানত। সুতরাং যুদ্ধের উত্তেজনা আর নেই। জয়লাভের উন্মাদনা ? তাই বা কৈ ? এই তো চারিদিকে উন্মত্ত কোলাহল উঠেছে, বিজয়ী সৈন্যদল মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিচ্ছে এই লোকটিরই। 'আল্লা হো আকবর !' ধ্বনিতে ওপারের পাটনা শহর ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত বোধহয় কম্পিত হচ্ছে—কিন্তু এই মানুষটিকে যে সে জয়ধ্বনির আনন্দ-উন্মাদনা স্পর্শ করেছে তা তো মনে হচ্ছে না, বিজয়-গৌরবের উগ্রসুরা এতটুকু তো মাতাতে পারে নি। বরং কোলাহল ও জনতার বাইরে একা এই টিপিটার ওপর এসে নির্লিপ্ত উদাসীনবৎ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে নিতান্ত অপরিচিত কোন ব্যক্তি, একান্ত নিস্পৃহ কোন দর্শক মাত্র।

তবে ?

তবে এঁর বিশ্রামের কথা মনে হয় না কেন ?

অতি প্রত্যূষে সূর্য অভ্যুদয়ে লোকটি যুদ্ধসাজ পরে ঘোড়ায় উঠেছেন, এখনও পর্যন্ত মাটিতে আর পা দেন নি। মাঝে ঘোড়া থেকেই হাতীতে উঠেছিলেন, বহুদূর অবধি দেখার সুবিধার জন্য—আবার পরে হাতী থেকে ঘোড়াতে নেমেছেন। এর মধ্যে কিছু আহার করেন নি, এতটুকু জলপান করেন নি—ভারী ভারী বর্ম ও শিরস্ত্রাণ খোলার কথা ত চিন্তাই করা যায় না।

মানুষটা কি লোহা দিয়ে তৈরী ?

আর দরকারই বা কি এত কষ্ট স্বীকারের ? কাজ ত চুকেই গেছে, এখন বিশ্রাম করলে এমন কি ক্ষতি হতে পারে ?

ইয়াসিন ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে ভয়ে ভয়েই কাশল একটু। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না।

আকবর শা ভীড় থেকে দূরে—এই ঢিপির মত উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ করি নির্জনে একটু চিন্তা করার জন্যই।

দূর গঙ্গার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আকবর। কিন্তু ঠিক গঙ্গার দিকেই কি চেয়েছিলেন এই নবীন বাদশা ? না—গঙ্গা পার হয়ে দৃষ্টি তাঁর স্থির-নিবদ্ধ ছিল পাটনা শহরের দিকে, যেখানকার কিলার মধ্যে দায়ুদ কররাণী নিজেকেই নিজে বন্দী করে রেখেছে !

গৌড়বঙ্গের এই পাঠান সুলতান বিজ্ঞ নৃপতি সুলেমান কররাণীর পুত্র—কিন্তু পিতার সহস্রবিধ গুণের এতটুকুও কি পায় নি সে ! নির্বোধ। নিতান্তই নির্বোধ। আরও বহু দোষ আছে ওর স্বভাবের—কিন্তু আকবর শা মনে করেন রাজা বা শাসকের পক্ষে অমার্জনীয় দোষ ও দুর্বলতা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। সাংঘাতিক—শুধু প্রজাদের পক্ষে নয়, সে রাজার নিজের পক্ষেও বটে। যে নির্বোধ তার সিংহাসনে বসবার কোন অধিকার নেই।

এই লোকটি সিংহাসনে বসে পর্যন্ত একটার পর একটা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিচ্ছে। সব চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা হল তার পিতার উজীর, বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং সর্বাধিক বিশ্বস্ত সেবক লুদী খাঁকে হারানো। প্রথম তাঁর প্রিয় জামাতাকে হত্যা করে তাঁকে বিদ্বিষ্ট করে তুলল—তারপর আবার, সেই বিদ্বেষ শত্রুতায় পরিণত হতে পারে সন্দেহ করে তাঁকে হত্যা করল। আর হত্যা করল কী ভাবে, প্রভু বংশের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা ও প্রভুপুত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের সুযোগ নিয়ে, শরণাগত সেজে ভুলিয়ে মধ্যরাত্রে নিজের তাঁবুতে ডেকে এনে কাপুরুষের মত আঠারো জন লোক মিলে এক নিরস্ত্র বৃদ্ধকে আক্রমণ করে !

এই লোককে সিংহাসনে বেশী দিন বসতে দিলে খুদাই ক্ষমা করবেন না আকবর শা-কে !

ওর আর সব অপরাধ, সব দুর্বলতা আকবর শা সহ্য করতে পারতেন—কিন্তু এই কাপুরুষতা অসহ্য।

মরতে ওকে হবেই—অন্ততঃ সরতে হবে এই গদী থেকে।

আর অচির ভবিষ্যতে সে সরবেও, আকবর শা-ই ওকে সরাবেন, তা-তিনি জানেন। সেটুকু আত্মবিশ্বাস জহীরুদ্দীন বাবর শার পৌত্র জালালুদ্দীন আকবর শা রাখেন।

কিন্তু তবু—

ওই নির্বোধ মূর্খ সুলতানটার পাশে আজও যারা আছে, তারা সকলেই সুলেমান কররাণীর আমলের লোক, তাঁরই হাতে গড়া। প্রধান সেনাপতি গুজর খাঁ, কতলু খাঁ লোহানী—এরা স্বার্থপর বটে, কিন্তু কাপুরুষ নয়; সকলেই দুর্ধর্ষ বীর ও যোদ্ধা। এরা কেউই দায়ুদ কররাণীর মঙ্গল কামনা করে না—বরং সকলেই মনে মনে তার সিংহাসন কামনা করে—তা আকবর ভাল করেই জানেন—কিন্তু তেমনি এরা তো কেউ নির্বোধও নয়, এরা জানে যে প্রবল শত্রু সামনে, এ সময় গৃহবিবাদ কর্তব্য নয়, এ সময় সুলেমান কররাণীর সিংহাসনের নামে একতাবদ্ধ হওয়াই সুবিধা, আপাততঃ মুঘলের হাত থেকে সিংহাসনটা রক্ষা পেলে সে সিংহাসন থেকে ওই মূর্খ নির্বোধ দায়ুদটাকে টেনে নামিয়ে দিতে এতটুকু আয়াস স্বীকার করতে হবে না তাও তারা জানে।

আর সেই জন্যেই আকবর শার এই চিন্তা।

শত্রু খুব সহজ নয়।

সহজ নয় বলেই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন তিনি। সেই জন্যই ওদিক দিয়ে গঙ্গা পার হবার চেষ্টা না করে তিনি সোজা এখানে এসেছেন এবং পাটনা আক্রমণের চেষ্টা না করে আগে এই হাজীপুর কিলা দখল করেছেন। এইখানে বসে, এই কিলার আশ্রয়ে থেকে পাটনা দখল করার অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন তিনি। প্রথম যখন তিনি হাজীপুর কিলা আক্রমণ করবার আদেশ দেন তখন তাঁর সেনাপতিরা একটু বিস্মিত হয়েই চেয়েছিলেন তাঁর মুখের দিকে। মুনিম খাঁর মুখে তো বেশ একটু অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসিই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু এখানে এসে কিলার অবস্থান ও ওপারে পাটনার ছাউনির অবস্থানটা মিলিয়ে দেখে সে বিস্ময় ও ব্যঙ্গের স্থলে মুগ্ধ সম্ভ্রমের ভাবই ফুটে উঠেছে। তাঁদের বাদশা ও মালিক তাঁদের চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হলেও বুদ্ধিতে আদৌ কনিষ্ঠ নন—এ প্রমাণ তাঁরা প্রত্যহই পাচ্ছেন।

ইয়াসিন আবারও কাশল। এবার বেশ-একটু স-রবে।

কিন্তু আকবর ওপারের ছাউনির দিকে চেয়ে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার চিন্তায়। সে কাশির শব্দ তাঁর কানে গেল না।

ছাউনির দিকেই চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যা তাঁকে একটার পর একটা বিজয়ে এগিয়ে যেতে, ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সাহায্য করেছে—সে দৃষ্টি পাটনা ছাড়িয়ে আরও বহু দূরে, আরও দক্ষিণে চলে গিয়েছিল; ভবিষ্যতের সুদূর দক্ষিণে। বহু দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পান তিনি, বহু লোকের মনের চেহারাটাও দেখতে পান। এটা বোধ করি খুদারই দেওয়া ক্ষমতা। তাই একেবারে বালক বয়সে সিংহাসনে বসেও সে সিংহাসন খোয়াতে হয় নি তাঁকে, ঠকেন নি কারুর কাছে। কখনও কারুর কাছেই পরাজিত হন নি—কী শক্তির যুদ্ধে, কী বুদ্ধির যুদ্ধে।

আজও হার মানবেন না—এ তিনি জানেন। আজও তিনিই বিজয়ী হবেন। তবে কোন পথে এগোবেন, কী উপায়ে তাঁর শক্তি ক্ষয় না করেও এই প্রবল শত্রুকে পরাজিত করবেন—এ-ই চিন্তা।

সেই পথটাই খুঁজছেন তিনি এই একান্তে দাঁড়িয়ে।

তাই তাঁর দৃষ্টি খোলা চোখের দ্বারপথে বেরিয়েও বাইরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না—কোন্ অদৃশ্য পথে ফিরে এসে মনের গহনে ডুব দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যেই বুদ্ধির আলোতে পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে!···

ইয়াসিনের কাশি সেই রুদ্ধ-ইন্দ্রিয় চিন্তার মধ্যে ঢোকবার কথা নয়।

ইয়াসিন এবার বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু কী-ই বা করবে! এর চেয়ে বেশী কিছু করতে গেলে ধৃষ্টতা হয়ে উঠবে।

বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে করতে হঠাৎ একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। কে জানে কেন—বাদশার এই প্রিয় ঘোড়াটি তাকে মোটে দেখতে পারে না। সম্ভবতঃ একই লোকের দুই প্রিয়পাত্র পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না—সেই সপত্ন-বোধই এই বিদ্বেষের হেতু। যাই হোক—আপাতত সেই সুযোগ নিতে দোষ কি?

ইয়াসিন আস্তে আস্তে একটা হাত রাখল ঘোড়াটার মাথায়, দুই চোখের মাঝামাঝি। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে চিঁহি চিঁহি করে ডেকে উঠল সে—এবং প্রবল বেগে মাথা চালতে লাগল।

এইবার ধ্যানভঙ্গ হল আকবরের। সব সময় মানুষের ডাক কানে

পৌঁছয় না মানুষের—কিন্তু প্রিয় পশুর এতটুকু অস্বস্তি সম্বন্ধেও সে নিমেষে সচেতন হয়ে ওঠে।

'কি রে, কি রে রুস্তম, কী হয়েছে ?"

আকবর সস্নেহে মাথা চাপড়ে ওকে আদর করেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াসিনের উপস্থিতি সম্বন্ধেও অবহিত হয়ে ওঠেন।

'কী ইয়াসিন ?'

'লড়াই তো ফতে হয়ে গেল জাঁহাপনা, সূর্যও তো প্রায় অস্ত যায়-যায়। এবার একটু বিশ্রাম করলে হত না ? সারাদিন তো এতটুকু জলও পেটে যায় নি। একটু কিছু মুখে তো দেওয়া দরকার !'

'ও, সেই জন্যে বুঝি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ আর আমাকে বিরক্ত করতে সাহসে কুলোয় নি বলে আমার ঘোড়াকে বিরক্ত করছ ! তুই মেয়েছেলের বাড়া হয়ে পড়লি ইয়াসিন !...বিশ্রাম কি, যোদ্ধার কি বিশ্রামের কথা চিন্তা করলে চলে ? তুই তো জানিস আমি সাত দিন সাত রাত অবিশ্রাম হাতী ও ঘোড়ায় চেপে গোয়ালিয়র থেকে আগ্রা পৌঁছেছিলুম। সওয়ার বদল হয়েছিল—সওয়ারী কিন্তু ঠিক ছিল।...শুধু চলার পরিশ্রমই নয়—ঘুমোবারও তো অবসর জোটে নি। অত সহজে আমার ক্লান্তি আসে না—তুই নিশ্চিন্ত থাক। খাওয়া যে হয় নি, তা তুই বলতে মনে পড়ল। আমার এতক্ষণ সে কথা খেয়ালই ছিল না !'

'তা মনে যখন পড়েছে এবার—'

সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে এই পর্যন্ত বলে উৎসুক মুখে তাকায় ইয়াসিন মালিকের মুখের দিকে।

'আর একটু পরে যাচ্ছি—তুই যা।'

ইয়াসিন মনিবের দুর্বলতা সবই এতদিনে জেনে ফেলেছে বৈকি !

তাই সে এবার মোক্ষম চালটিই দিলে, 'তাহলে অন্তত সওয়ারটাই বদল করুন, ঘোড়াটাও তো সেই ভোর থেকে কিছু খায় নি—তার ওপর এই দারুণ গরম ও গুমোটে সারাদিন ঘুরেছে, এক বিন্দু জলও খাওয়ান নি, ওটা মরে যাবে যে !'

'ইস্ তাই তো—' নিমেষে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আকবর। এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বললেন, 'ইস্ কথাটা তো মনেই ছিল না। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। তুই ওকে নিয়ে চল্—আমিও যাচ্ছি।'

'কিন্তু হাঁটবেন কেন—আর একটা ঘোড়া—'

'ঠিক আছে। সারাদিন হাতী আর ঘোড়ায় চেপে চেপে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। এটুকু হাঁটতে ভালই লাগবে এখন। রুস্তমকে আর এর ওপর ভার বইয়ে লাভ নেই!'

তিনি লাগামটা ছুঁড়ে ইয়াসিনের হাতে দিয়ে দিলেন।

যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন আকবর, সেটা একটা ছোটখাটো টিলার মতই উঁচু। ওর ওপর দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত নজরে পড়ে।

সেখান থেকে নামতে গিয়ে আকবরের চোখে পড়ল, কিছুদূরে কী একটা হট্টগোল হচ্ছে, বেশ একটা কোলাহল, গোলমাল।

এবং সে গোলমালটা আর যাই হোক—ঠিক বিজয় উৎসবের হল্লা নয়। ওঁর অভিজ্ঞ কান দূর থেকেও হৈ-হল্লার বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারে।

তিনি আরও কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে, নিমেষে সেই দিকে পা চালালেন। এত দ্রুত হাঁটতে লাগলেন যে ইয়াসিন প্রায় ছুটেও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। চারদিকে সব নিজেরই সৈন্য বটে, তবু বাদশার ঠিক চার পাশে যে রক্ষী থাকা প্রয়োজন সেটা ওঁর কখনও মনে থাকে না।

'কী হয়েছে?' ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন বাদশা।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। জনতা দুই ভাগ হয়ে সরে শুধু পথই দিল না—অভিবাদনে আভূমি নত হল এক লহমায়।

বাদশার কণ্ঠস্বর বাহিনীর সকলেই জানে। চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

তারপর মাথা যখন আবার সকলের উঁচু হল, বাদশার প্রসন্ন অনুমতি পাবার পর, একজন বললে, 'জাঁহাপনা—এই লোকটাকে আমরা ধরেছি, এ গুপ্তচর!'

'গুপ্তচর?' ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল বাদশার।

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, গুপ্তচর!···এ আমাদের বাহিনীর কেউ নয়—কি আমাদের চাকর সহিস রসদ-বাহিনী—কোন দলেরই নয়। অথচ দেখুন সশস্ত্র, একেবারে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা ধরে ফেলেছি—।' অর্থাৎ কৃতিত্বটা না ভুলে যান বাদশা।

'ওর কি কৈফিয়ৎ?' বাদশা প্রশ্ন করেন।

এক সঙ্গে দু-তিন জন বলে উঠল, 'ধরা পড়ে এখন বলছে বাদশার সঙ্গে

দেখা করবার জন্যে এখানে এসেছে। তাঁর সঙ্গে ওর কথা আছে। কিছু গুপ্ত সংবাদ দেবে, তাতে নাকি আমাদের উপকারই হবে!'

সবাই হেসে উঠল। কারণ এ কৈফিয়ৎ বহু পুরাতন। এ অছিলা সর্বকালেই সমস্ত গুপ্তচর দিয়ে আসছে। একেবারেই ছেলেমানুষী কৌশল—আত্মরক্ষার।

'কৈ দেখি, ওকে সামনে আন।' আদেশ দিলেন আকবর শা।

পিছমোড়া করে বেঁধেছিল ইতিমধ্যে তাকে। সেই অবস্থাতেই ঠেলতে ঠেলতে সামনে নিয়ে এল।

তখন বেশ ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে দিনের আলো। শ্রাবণের সূর্যও অস্তাচলে ঢলে পড়েছেন, তাঁর শেষ রশ্মি দূর পশ্চিম দিকচক্রবালে ঘন বনানীর অন্তরালে মিলিয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে সামান্য একটু রক্তিম আভা মাত্র জেগে তখনও।

তবু, সেই অস্পষ্ট ম্লান আলোতেই, একবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই বাদশা বলে উঠলেন, 'আরে, এ যে স্ত্রীলোক!'

সকলে নির্বাক—বেশ কিছুক্ষণ।

আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় যতটা সম্ভব অভিবাদনে মাথা হেলিয়ে—গুপ্তচর বলল, 'জী জাঁহাপনা। আপনার বাঁদী!'

বিস্মিত হয়েছিল সবাই, শুধু বুঝি একা আকবর শা-ই বিস্মিত হন নি। তিনি সপ্রতিভ এবং বেশ একটু কঠোর কণ্ঠেই বললেন, 'কে তুমি, সত্য পরিচয় দাও। সত্য কথা না বললে—স্ত্রীলোক বলে ক্ষমা করব না।'

'খুদার দেহাই, আমি মিছে কথা বলছি না। আমি মিয়া লুদী খাঁর বাঁদী —নফিসা বেগম!'

'মিয়া লুদী খাঁ! কররাণীদের উজীর? বিখ্যাত রাজনীতিক মিয়া লুদী?'

'হ্যাঁ জনাব। আমি তাঁরই বাঁদী।'

'তা এখানে কেন এসেছিলে? কী দরকার?'

'সত্যিই আপনার খোঁজে এসেছিলাম। শুনলাম আপনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কোথায় আছেন। তাই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।'

'প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন!' মুহূর্তকাল মৌন থেকে নফিসা বলল, 'মূল প্রয়োজন প্রতিশোধ। আমার মালিকের অকারণ ও নিষ্ঠুর হত্যার—বোধ করি মানুষের ইতিহাসে সব চেয়ে ঘৃণিত এক বিশ্বাসঘাতকতার—প্রতিশোধ তুলতে চাই। কিন্তু আমি

অবলা স্ত্রীলোক, আমার বাহুতে সে জোর নেই। তাই যার সে জোর আছে—এমন লোকেরই শরণাপন্ন হতে এসেছি জনাব! আমি উপায় জানি, পথ জানি—কিন্তু কাজটা ত করতে পারব না। সেটা আপনি পারবেন। তাই আপনাকে খুঁজছি।'

উপায়! পথ!

নিমেষে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে আকবর শা-র। যে সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন—তাঁর সৌভাগ্যতারকা কি তাহলে এই নারীরূপে সেই সুযোগ-সুবিধা পাঠিয়ে দিয়েছে!

মনে মনে কৌতূহলে অধীর হয়ে পড়লেও মুখের প্রশান্তি নষ্ট হল না তাঁর। তিনি বললেন, 'বেশ খুঁজে তো পেয়েছ, এখন বল তোমার কি বক্তব্য!

'না জনাব, সে কথা অনেকের সামনে বলবার মত নয়। শুনলে আপনাকে নিভৃতে শুনতে হবে।'

সেই প্রায়ান্ধকারেই যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আকবর শা, তারপর শুধু বললেন, 'বেশ আমার সঙ্গে আমার তাঁবুতে এস। ছেড়ে দাও ওকে—'

'হুজুর—ও কিন্তু সশস্ত্র!' কে একজন ভয়ে ভয়ে বললে।

'জানি ইয়ার মহম্মদ।' বাদশা হাসলেন একটু: 'সশস্ত্র হলেও নারী! পুরুষের হাতে যা হাতিয়ার নারীর হাতে তা খেলনা মাত্র। তাতে ভয় পাওয়া যোদ্ধার অন্তত সাজে না!'

॥ ৬ ॥

নিজের তাঁবুতে পৌছে মণিমাল্যমণ্ডিত উষ্ণীষ খুলে নামিয়ে রেখে নফিসার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন আকবর শা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, 'বল এবার কী বলতে চাও!'

'জাঁহাপনা, আপনি বিনা যুদ্ধে পাটনা দখল করতে চান?' স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

এবার আকবরও একটু বিস্মিত হলেন।

একটু যেন সন্দেহও হল। এ নারী তাঁর মনের কথা জানলে কী করে? অথবা জানতেই এসেছে। টোপ ফেলে দেখছে—সে টোপ তিনি গেলেন কি না!

তিনি একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন, 'আমি কি চাই তা তোমার না জানলেও চলবে, তুমি কী চাও তাই বল!'

'জনাবালি, আমি ওই পাপিষ্ঠ দায়ূদ কররাণীর সর্বনাশ চাই। আমার জীবনের এখন এই একমাত্র ব্রত, একমাত্র তপস্যা।··আমার মালিক—আজ স্বীকার করছি, লজ্জা করব না—আমার প্রাণের মালিক, লুদী মিয়া দেবতা ছিলেন। তিনি স্বর্গত প্রভুর মুখ চেয়ে ঐ পাপিষ্ঠটার সব অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। তিনি চিনতেন ওকে, তাঁকে হত্যা করতেই মিথ্যা ছলনার সাহায্যে তাঁর করুণা উদ্রেক করে ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে এ সন্দেহও করেছিলেন—তবু বিপন্ন প্রভুপুত্রের মিনতিতে স্থির থাকতে পারেন নি। সেই বিশ্বাস, স্নেহ এবং ক্ষমার মর্যাদা রাখল ওরা বহুজন মিলে নিরস্ত্র বৃদ্ধকে হত্যা করে—এ জ্বালা যে আমার যাবে না জনাব। আমার সমস্ত রক্তে আগুন জ্বলছে, অহরহই জ্বলছে—সে জ্বালার অবসান হবে ওর রক্তে মাটি ভিজেছে দেখলে।···কিন্তু এখনই নয়, সে ইচ্ছা থাকলে আমিও ওকে খুন করতে পারতুম। তার আগে ওর সর্বনাশটা দেখতে চাই। যে সিংহাসনের জন্য সে এই কাণ্ড করল, সেই সিংহাসন বার বার ধরতে যাবে, বার বার ফসকে যাবে ওর হাত থেকে—কুকুর-বেড়ালের মত প্রাণভয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, আশ্রয় ভিক্ষা করবে কিন্তু আশ্রয় মিলবে না, যাদের বিশ্বাস করবে তারাই করবে ওর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা—আগে এই সমস্ত দেখতে চাই, নিজের চোখে। তারপর মৃত্যু। ওদের কাউকে ক্ষমা করব না আমি। গুজর খাঁ, কতলু লোহানী—সকলের সর্বনাশ আমি দেখব। দেখবই—আপনি সাহায্য করুন আর না করুন। খুদা আমাকে ততদিন পরমায়ু দিন—এখন তাঁর কাছে শুধু এই প্রার্থনা।'

আকবর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন ওর কথা। তাঁবুর মধ্যেকার খুঁটিতে বাঁধা দুটি মশালের মত তেলের বড় আলো। তিনি আছেন সেদিকে পিছন ফিরে, আলোটা পুরো গিয়ে পড়েছে নফিসার মুখে। একাগ্রদৃষ্টিতেই দেখছিলেন ওকে।

নফিসা থামবার অনেকক্ষণ পরে, আশ্চর্য কোমলকণ্ঠে, প্রায় চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি মিয়া লুদীকে খুব ভালবাসতে, না?'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা। ভালবাসার কম-বেশি আমি জানি না—কিন্তু ওঁকে ছাড়া তখন আমি পৃথক অস্তিত্বই অনুভব করতে পারতুম না। সত্যিই বার বার

মনে হত ওঁর চলার পথে আমি বুক পেতে দিই—তা দিলেও আমার বুকে ব্যথা লাগত না, বুক জুড়িয়ে যেত। তিনিই ছিলেন আমার দিনরাত, সুখ-দুঃখ—ইহকাল পরকাল আমার সব, আমার সব।'

বিহ্বল স্খলিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে নফিসা। বলতে বলতে একেবারে গলা ধরে আসে ওর।

'কিন্তু তিনি তো—যতদূর শুনেছি বৃদ্ধ ছিলেন, তোমার বয়স তো কাঁচাই। বেশ কাঁচা।'

'কী জানি জনাব, বৃদ্ধ ছিলেন কি যুবক ছিলেন তা তো কোনদিন ভেবে দেখি নি। তিনি ছিলেন দেবদূত, দেহধারী দেবদূত। তাঁকে পুজা করেছি—ভালবেসে কৃতার্থ হয়েছি। তাঁর রূপ-যৌবনের কথা কোনদিন মনেই পড়ে নি যে!'

'কেন এত ভালবাসলে? কী দেখেছিলে তুমি তাঁর মধ্যে?'

'দেখেছিলাম তাঁর হৃদয়!…একদিন এক বীভৎস অপমানের হাত থেকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন আমাকে। মৃত্যুর চেয়েও ঢের বেশী দুঃসহ সে অপমান আর নির্যাতন। কিন্তু তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা দাবী করেন নি।…আমি তাঁর বাঁদী হতে চেয়েছি—স্বেচ্ছায়। তিনি তারপরও আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েই-ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে যথেচ্ছ সম্ভোগ করতে পারতেন, সম্ভোগান্তে সাধারণ বাঁদীর মতই ভুলে যেতে পারতেন—আমি তাতেই কৃতার্থ হতাম। কিন্তু কিছুই করেন নি তিনি—সযত্নে রক্ষা করেছেন আর স্নেহ করেছেন। তাঁর সেই স্নেহচ্ছায়ায় আমার যে কটি দিন কেটেছে, সেই কটি দিনই আমাকে বেহেস্তের স্বাদ দিয়েছে এ পৃথিবীতে জনাব। তার চেয়ে বেশী সুখ আমি বেহেস্তেও কল্পনা করতে পারি না।'

এ সবই কি মিথ্যা?

সবই কি ছলনা?

এ সংশয় একটা ছায়া ফেলেছিল বৈকি বাদশার মনে। কিন্তু মনে মনেই তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লেন আকবর শা।

তা হতে পারে না। বৃথাই তিনি এতদিন মানবমনস্তত্ত্ব অনুধাবন করেন নি। এ নারীর জ্বালাও সত্য, প্রেমও সত্য।

সহসা তাঁর সেই কোমল ও মৃদু কণ্ঠ কোথায় চলে গেল।

তার বদলে বাদশাহী কণ্ঠই বেজে উঠল আবার, 'তা হলে এখন তোমার প্রস্তাব?'

সে কণ্ঠে নফিসাও যেন তার স্মৃতি-স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। সে-ও সহজ ভাবে উত্তর দেয়, 'আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি জনাব।'

'ধরে নাও যে আমি তাই চাই। বিনাযুদ্ধে জয়লাভ করতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনি—আপনি তা হলে ওই হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়ে দিন বাদশা, সেই হুকুমই দিন।'

'আগুন ধরিয়ে দেব? হাজীপুর কিলায়? কী বলছ তুমি? তা হলে এত কাণ্ড করে কিলা দখল করলুম কেন?'

এবার আর বিস্ময় চাপতে পারেন না আকবর শা। বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠেই প্রশ্নগুলি করেন।

'হাজীপুর কিলা আপনি দখল করেছেন পাটনা দখলের সুবিধা হবে বলে—তাই না? সে সুবিধার জন্যই ওই কিলায় আগুন লাগিয়ে দিন বাদশা, আমি বলছি সুবিধা হবে।'

'হ্যাঁ, সুবিধা হবে ঠিকই—অপর পক্ষের।'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বর ফুটে ওঠে ওঁর গলায়।

'জাঁহাপনা, শুনেছি আপনার তৃতীয় নয়ন আছে, আপনি নাকি মানুষের বুকের চামড়া ভেদ করে ভেতরটা দেখতে পান—আপনিও আমাকে অবিশ্বাস করছেন? দোহাই আপনার, ভুল করবেন না, একবার জগতের লোককে দেখিয়ে দিন যে আপাতদৃষ্টিতে যা বাতুলতা, আসলে তা দূরদৃষ্টি মাত্র। খুদার দোহাই বাদশা—আমাকে বিশ্বাস করুন।'

'নফিসা বেগম, পৃথিবীতে কতকগুলো কাজ আছে যা শুধু অপরের মুখের কথায় করা যায় না। হাজীপুর কিলা জ্বালিয়ে দিলে আর কারুর কথাতেই তা আপনি গড়ে উঠবে না। তখন ভুল বুঝলেও কিলা ফিরানো যাবে কি?'

'আমার জান জামিন। আমি বন্দী থাকব—যদি আমার কথা না ফলে, কাল আমাকে কোতল করবেন।'

'তাতে কি হাজীপুর কিলা ফিরবে?'

আকবর শা স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

নফিসা স্তব্ধ হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে—বহুক্ষণ। তার পর প্রায় চুপিচুপি বলে, 'তবে শুনুন সম্রাট, কয়েকদিন আগে আমি দায়ুদ কররাণীর

শয়নগৃহে ঢুকেছিলাম। সকলের অজ্ঞাতে, অন্ধকারে মিশে। এর জন্য আমাকে বহু কাণ্ড করতে হয়েছে, বহু আয়াস। অনেক নীচেও নামতে হয়েছে কিন্তু তাতে ইতস্তত করি নি। প্রতিহিংসার সাধনা আমার—তার জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত। সেদিন ইচ্ছা করলে ঘুমন্ত শয়তানটাকে বধ করতে পারতাম। তার জন্য আমার জীবন গেলেও তো ক্ষতি ছিল না জনাব, কারণ এ জীবনটার, এ দেহটার আর কোন মূল্যই নেই। মৃত্যু মানে শান্তি—হয়তো কিছুদিন অপেক্ষার পর রোজ কিয়ামতের দিন আবার মালিকের সঙ্গে মিলন।...কিন্তু ওকে বধ করলে আমার, আমার তৃপ্তি হবে না সম্রাট। ঘুমন্ত বধ করলে লাভ কী? ও তো জানতেও পারল না, অনুশোচনায় দগ্ধ হবারও সময় পেল না! সে মৃত্যুতে আমার প্রাণের জ্বালা মিটবে না। তাই তাকে মারি নি, স্বপ্নের মত তার শিয়রে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের সঙ্গেই মিশিয়ে দিয়েছিলাম আমাকে। সে ভেবেছে সে স্বপ্নই দেখেছে—তাকে বলে এসেছি তার সর্বনাশের আর বিলম্ব নেই। বিধাতার রুদ্ররোষ আগুনের অক্ষরে ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে, সেই আকাশলিপিতেই নিজের নিয়তি দেখতে পাবে সে।...এইটুকু বলেই বেরিয়ে এসেছি। সে খুঁজে পায় নি আমাকে। বহু খোঁজ করেছে। প্রহরীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছে--অনেকের প্রাণবধও করেছে আমার জন্যে।...কিন্তু সব বৃথা—স্বপ্ন না সত্য তাও জানতে পারে নি।..সে ভয় পেয়েছে বাদশা, খুব ভয় পেয়েছে। আমি জানি, খবর নিয়েছি। দিনে আহার নেই তার, রাত্রে তন্দ্রা নেই চোখে। ভয়ে বিবর্ণ বিশীর্ণ হয়ে গিয়েছে। পাটনা দুর্গের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে—আলোর ভয়ে ভীত পেঁচার মত। শুধু একটু আগুন—একটু বেশী করে আগুন জ্বালুন, তা হলেই হবে। বিনা যুদ্ধে সে পাটনা ছেড়ে চলে যাবে, একটি লোকও মরবে না আপনার, সামান্য ক্ষয়ক্ষতিও হবে না। বিশ্বাস করুন।'

প্রায় ভিক্ষার মত হাত জোড় করে শেষের কথাগুলো বলে নফিসা বেগম।

আকবর স্তব্ধ হয়ে থাকেন আরও অনেকক্ষণ। তারপর বলেন, 'শির জামিন?'

'শুধু শির কেন জনাব—ইজ্জৎ পর্যন্ত! যদি আমার কথা না ফলে আপনার নিম্নতম ভৃত্যের বাঁদী হয়ে থাকব চিরকাল।'

'বেশ, তাই হবে। আজ রাত্রে তুমি আমাদের শিবিরে বন্দিনী হয়ে থাকবে। যদি তোমার কথা ঠিক ঠিক ফলে—কাল মুক্তি পাবে।'

'স্বচ্ছন্দে।'

নফিসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আকবর শা ডাকেন, 'ইয়াসিন!'

ইয়াসিন এসে দাঁড়ায়।

'এই গুপ্তচরকে বন্দী করেই রাখতে হবে, পাহারাদারদের বল। তবে কোন দুর্ব্যবহার না কেউ করে। খাদ্য জল দেবে। শোবার ব্যবস্থাও করে দিও। আর মুনিম খাঁকে ডেকে দাও।'

ইয়াসিন বিপন্নমুখে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথা-টাথা চুলকে মরীয়া হয়ে বলে, 'কিন্তু এখন একটু বিশ্রাম করলে হত না জনাব।'

'আঃ! ইয়াসিন, তুই বড় বেশী অভিভাবক হয়ে পড়েছিস। যা বলছি শোন্। বিশ্রামের আমার দরকার নেই।'

'একটু শরবত?' তবু‌ও ছাড়ে না ইয়াসিন।

'ইয়াসিন!' ধমক দিয়ে ওঠেন বাদশা।

কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে যায় ইয়াসিন।

॥ ৭ ॥

অকস্মাৎ মধ্য-রাত্রে আগুন জ্বলল।

অতর্কিতে একেবারেই সহসা সহস্র শিখায় জ্বলে উঠল সে আগুন।

হাজীপুর কিলায় আগুন ধরেছে। সমস্ত কিলাটা জ্বলছে দাউ দাউ করে।

সে লেলিহান শিখা অগ্নির শিখর রচনা করেছে যেন অন্ধকার নৈশ আকাশে। তার ভয়াবহ লাল আভা চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত নদী বন জনপদকে আলোকিত করে এক ভয়ঙ্কর রূপ দান করেছে।

শব্দও উঠেছে একটা। সে শব্দে ঘুম ভেঙেছে সকলের। বিহ্বল হতচকিত হয়ে কেউ বেরিয়ে এসেছে বাইরে, কেউ বা নিজের অলিন্দে দেহলীতে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সকলেই শঙ্কিত, সকলেই দিশাহারা। কারণ জানতে পারছে না, তাই আরও ভয়। অজানা ভয় বেশী ভীতিপ্রদ মানুষের কাছে। পাটনার ঘাটে ঘাটে অসংখ্য নাগরিক

এসে দাঁড়িয়েছে, শের শা'র গড়া নতুন শহরের নতুন বাসিন্দা তারা। কেমন করে তাদের ধারণা হয়েছে যে এ আগুনে তাদেরও কোন অজ্ঞাত অমঙ্গল লুকিয়ে আছে।···

মুঘল-শিবিরেও বিস্ময়ের অন্ত নেই। কেন এ অদ্ভুত খেয়াল হল বাদশার তা কেউ জানে না। কেনই বা এত কাণ্ড করে কিলা দখল করলেন আর যদি করলেন তো এত আয়াসের পর কেনই বা সে কিলায় আগুন ধরিয়ে দিলেন, স্বেচ্ছায় এ বিপুল ক্ষতি স্বীকার করলেন—তা তাদের বুদ্ধির অতীত। যখন সহসা কিছুক্ষণ পূর্বে হুকুম এল যে কিলা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে তাদের, এবং বেশ কিছুটা দূরে সরে যেতে হবে, তখনও বোঝে নি কেউ যে বাদশার মনে কী আছে!

তবে কি বাদশা আকবর সত্যই পাগল হয়ে গেছেন?

এ কী মূর্খতা!

অনুচ্চারিত এ প্রশ্ন অনেকেরই কণ্ঠে—শুধু উচ্চারণের ভরসা নেই।

তারাও চেয়ে আছে নির্বাক হয়ে প্রজ্বলিত ঐ সহস্রশিখা-বহ্নির দিকে।

চেয়েই রইল তারা।

তাদের চোখের সামনেই সে আগুন জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশ একসময় নিস্তেজ হয়ে এল।

সে বিপুলকায় অভ্রংলিহ বহ্নিশিখার আকৃতি হ্রস্ব হয়ে এল।

ঈষৎ-প্রধূমিত জ্বলন্ত বৃহৎ অঙ্গারখণ্ডে পরিণত হল ক্রমে হাজীপুরের কিলা।

রাত্রিও ভোর হয়ে এল ততক্ষণে।

॥ ৮ ॥

সে দিন কি সত্যিই দেখেছিলেন কাউকে? অথবা দায়ুদের নিজেরই অনুতপ্ত মনের রচিত দুঃস্বপ্ন?

সেইদিন থেকে আজও ঠিক করতে পারেন নি।···

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ঘরে।

সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র শিউরে উঠলেন দায়ুদ কররাণী।

অন্ধকার তিনি আর মোটে সহ্য করতে পারেন না। সেই রাতের পর

থেকে অন্ধকার দেখলেই মনে হয় সে গাঢ় অন্ধকারে অশরীরী দুঃস্বপ্নের মত মিশিয়ে আছে সেদিনের সেই ছায়ামূর্তি।

ক্রুদ্ধ চিৎকারে ভৃত্যকে হুকুম করলেন আলো আনতে। একটা নয়, অনেক। অনেকগুলো বাতিদান।

তারপর তলব করে পাঠালেন গুজর খাঁ ও কতলু লোহানীকে।

গুজর আর কতলু ঘরে ঢুকে দেখলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারী করছেন দায়ুদ। কিন্তু ক্রোধ বা ক্ষোভের চেয়েও তাঁর মুখে আতঙ্কের ছাপটাই স্পষ্ট। যেন বিশ-পঁচিশটা বাতির কম্পিত শিখায় যে ছায়া পড়ছে দেওয়ালে, সেই নিজের ছায়াটাকেই বেশী ভয় ওঁর।

ওরা বুঝতে পারে না, ওরা জানেও না—কেন আজ ক'দিন দিনরাত সর্বদা একটা ভয়ের মধ্যে আছেন দায়ুদ!

অনুমান করে যে কৃতকর্মের অনুশোচনা। ওরা হাসে মনে মনে।...

কতলুকে দেখে বিনা ভূমিকাতেই দায়ুদ বলেন, 'আমরাই ওদের আক্রমণ করব কতলু খাঁ, আপনারা প্রস্তুত হোন।'

'সে কী—নদী পেরিয়ে? এই বর্ষার গঙ্গা?'

'হ্যাঁ। তা কী হয়েছে! আপনাদের এত নৌকো আছে, হাতী আছে তবু পারবেন না?...না পারেন অবসর নিন। গুজর খাঁ—আপনার কী মত? আপনি তো এতদিনের অভিজ্ঞ সেনাপতি, আপনিও কি ভয় পাচ্ছেন?'

অকারণ রূঢ় ও কর্কশ হয়ে ওঠে দায়ুদের কণ্ঠ।

গুজর খাঁ বহুদিনের লোক, অভিজ্ঞ সেনাপতি সত্যিই। সুলেমান কররাণীরও আগে থেকে তিনি পুর্বভারতের আফগানদের মধ্যে সর্বপ্রধান যোদ্ধা ও রণনীতিবিদ হিসেবে সম্মানিত। অপমানে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, 'এ ভয় বা সাহসের কথা নয় জাহাঁপনা—এ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতার কথা। ওরা নদী পেরিয়ে আক্রমণ করতে এলে ওদেরই সহস্র অসুবিধা, আমরা তখন সহজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব ওদের ওপর, আমাদের ফাঁদে এসে পড়বে ওরা। আর আমরা যদি সে কাজ করি তো আমাদেরও সেই অসহায় অবস্থায় গিয়ে পড়তে হবে, ওদের দয়ার ওপর নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিতে হবে বলতে গেলে। আর তা আমরা করবই বা কেন, কী এমন গরজ আমাদের!'

'যদি সামনে গঙ্গা পেরোতে অসুবিধা হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে যাব আমরা।

একদল এখানে থাকবে, যাতে ওরা না বুঝতে পারে আমাদের গতিবিধি—বাকী সৈন্য নিয়ে আমরা নিঃশব্দে ওদিক দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে সিমারিয়া ঘাটে গিয়ে উঠব, সেখান থেকে ওদের পিছনে পৌঁছতে দেরি হবে না। তারপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ব ওদের ওপর।'

'কিন্তু এত কাণ্ড করার কি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে খুব?'

কতলু লোহানী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

'আপনি চুপ করুন। অপদার্থ কাপুরুষ!···সেই বৃদ্ধ লুদী মিয়ার যে বুদ্ধি ও সাহস ছিল, তার এক কড়াও নেই আপনাদের। আপনাদের পরামর্শে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। সে থাকলে কি আজ আমাকে ভাবতে হত এসব? কত বড় বড় কথা বললেন, কত স্তোক দিলেন—অথচ আপনাদের চোখের সামনেই বিনা-যুদ্ধে হাজীপুর দখল করে নিলে মুঘলরা।'

'কিন্তু—' কতলু বিস্মিত হন যেমন তেমনি কেমন একটু অপ্রতিভও হন। হয়তো সেই বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসকারী বৃদ্ধের চরম দিনের ও অন্তিম ক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়। সেই সঙ্গে সেই লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগটাও। মাথা নিচু করে বলেন, 'কিন্তু—আমরা তো ওপারে গিয়ে হাজীপুর রক্ষা করতে চেয়েছিলুম জনাব, আপনিই তো ছাড়লেন না!'

'ও, নিজেরা না গিয়ে বুঝি কিছু করা যায় না? যা কিছু লড়াই আপনারাই করেন? তা হলে অতগুলো লোক পুষেছেন কেন?'

অসহিষ্ণু গুজর খাঁ ইঙ্গিতে কতলুকে নিরস্ত করলেন।

'তা আপনি এখন কী করতে চান?'

'আমি এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আর থাকতে চাই না। যা বললাম, সেই ভাবেই আপনি হুকুম দিন গে, আপনাদের ভয় হয়—আপনারা এখানেই থাকুন, পালাবার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে এখানে—আমি নিজেই সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করব। সুলেমান কররাণীর ছেলে আমি, যুদ্ধ-বিদ্যায় একেবারে গোমূর্খ নই।'

অপমানে গুজরের মুখ অরুণবর্ণ ধারণ করল। একবার তিনি কোষবদ্ধ তরবারির দিকে হাতও বাড়ালেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করেই বোধ হয়—প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলেন। সুলতান না হয়ে অপর কেউ হলে দু-দুবার 'ভয়' শব্দটা বরদাস্ত করতেন না গুজর খাঁ

কিছুতেই। এক্ষেত্রে একে মনিব—তায় এটা রাষ্ট্রবিপ্লবের কাল। সব বুঝে অপমানটা আপাতত গলাধঃকরণ করতে হল।

তা ছাড়া ইতিমধ্যে, ওঁর উষ্মা অনুমান করেই, কতলু খাঁও সুলতানেরই অলক্ষ্যে হাতটা চেপে ধরেছে গুজর খাঁর।

গুজর খাঁ একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক স্বরে বললেন, 'বেশ, আমি আপনার নির্দেশমত সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতের হুকুম দিচ্ছি। আপনি কটায় যাত্রা করতে চান?'

কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে সহসা দায়ুদের যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। নিমেষে যেন পাষাণে রূপান্তরিত হলেন তিনি।

নিমেষই—

সেই এক নিমেষের মধ্যেই ঘরের বাকী দুজন লোকও পাথর হয়ে গেল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

পঁচিশটা বাতির আলো খুব কম নয়—কিন্তু এখন যে প্রখর দিবালোকের মত আলোয় এ ঘর ভরে গেছে, লাল হয়ে উঠেছে পঙ্খের-কাজ-করা সাদা দেওয়ালগুলো, লাল হয়ে উঠেছে তাঁদের সাদা পোশাক ও ঘরের আসবাবপত্র,—সে আলো, পঁচিশ কেন পাঁচ শ বাতিতেও হত না।

সুলতানের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওঁরাও দুজন জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

নদীর ওপারে হাজীপুর কিলায় আগুন লাগানো হয়েছে। ধু-ধু করে জ্বলছে সমস্ত কিলাটা। সেই আগুনেরই আলো এ-পারের বহুদূর পর্যন্ত—পাটনা শহরের বহু প্রাসাদ অট্টালিকা—তার পিছনের আকাশ অবধি আলোকিত করে তুলেছে।...

দমকা বাতাসের মত ঘরে ঢুকলেন শ্রীহরি: 'জনাব, জনাব শুনেছেন, ওরা হাজীপুর কিলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে?...ব্যাটারা অকারণে এমন লোকসান দিতে গেল কেন বলুন তো! কিলাটা ওদের কী অনিষ্ট করছিল?'

কিন্তু কোন কথাই দায়ুদের কানে গেল না। সত্যিই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছিল না। নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন সেই ক্রমোদ্ধত লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে—

কয়েকটি নির্বাক নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত—তারপরই—অকস্মাৎ একটা চিৎকার করে উঠলেন দায়ুদ কররাণী। বুকফাটা আর্তনাদের মতই শোনাল সেটা।

সামনে ভূত দেখলে মানুষ চিৎকার করতে পারে কি না—তা গুজর খাঁ জানেন না। কিন্তু, তাঁর মনে হল খাঁচায়-পোরা কোন পশুকে উন্মুক্ত অস্ত্র বা জলন্ত লৌহশলাকা নিয়ে বধ করতে এলে সে বোধ হয় এমনি ভাবেই—এমনি বিকট, বীভৎস আর্তনাদ করে উঠত।

একবার—দুবার, পর পর কয়েক বারই এমনি চিৎকার করে উঠলেন সুলতান। বদ্ধ উন্মাদের মতই তাঁর ভাবভঙ্গী হয়ে উঠেছে ততক্ষণে—

গুজর খাঁ ও কতলু ছুটে গিয়ে দু দিক থেকে ধরে ফেললেন ওঁকে।

'জনাব, জনাব,—জাহাঁপনা! ··কী করছেন, ও কী করছেন! শান্ত হোন।'

'অ্যাঁ—?'

বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকান ওদের মুখের দিকে দায়ুদ কররাণী। যেন কী হয়েছে বোঝবার চেষ্টা করেন। তারপরই তাঁর সারাদেহে একটা প্রবল কম্পন শুরু হয়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন সামনের দিওয়ানটায়—

তারপর কেমন একরকমের অস্ফুট স্বরে, কান্নার মত গলায় বলেন, 'আমি—আমি যুদ্ধ করতে পারব না গুজর খাঁ।···আমি—আমি পালাব।···এখনই কয়েকটা নৌকো ঠিক করতে বলুন আপনি, আমি আজই—এখনই রওনা হব। ওরা টের পাবার আগেই আমি বহুদূর চলে যেতে চাই।'

'কী ছেলেমানুষি করছেন জনাব? শান্ত হোন।···কী এমন হয়েছে যে এত ভয় পেতে হবে? বলতে গেলে আমাদের একটি সৈন্যও মরে নি, একটি অস্ত্রও নষ্ট হয় নি। ওরা আসতে চায় আসুক না—এলেই তো কিছু আর ওরা জিতে যাচ্ছে না। আমরা একটা চেষ্টা করে দেখি অন্তত।' বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন গুজর খাঁ।

'যা পারেন আপনারা করুন। আমি পারব না গুজর খাঁ—অন্তত এখন পারব না। আমাকে মাপ করুন।···এ আপনি বুঝবেন না—আমি এখনই গৌড়ে ফিরে যেতে চাই।···না, না—আমি বরং উড়িষ্যায় চলে যাই সোজা—কী করব জানি না, যেতে যেতে ভাবব।'

পাগলের মত উঠে দাঁড়ান সুলতান।

টলতে টলতে এসে জড়িয়ে ধরেন শ্রীহরিকে: 'তুমি আমার একটা উপায় করে দাও শ্রীহরি, এখানে আর একদণ্ড থাকলেও আমি পাগল হয়ে যাব—'

গুজর খাঁ আরক্ত-নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কতলু লোহানী প্রশ্ন করেন,

'এখানের কী ব্যবস্থা হবে তা হলে? আপনি পালিয়েছেন শুনলে কি আর কেউ যুদ্ধ করবে?'

'জানি না। আমি কিছু জানি না। জাহান্নমে যাক সব। শ্রীহরি, চল আমরা যাই—'

শ্রীহরি কী একটা বলতে চেষ্টা করেন—কিন্তু সে অবসর মেলে না। পাগলের মত টানতে থাকেন দায়ুদ তাঁকে।

যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে গঙ্গার দিকে তাকান সুলতান।

অগ্নিশিখা তখনও উর্ধ্বোন্মুখ। সহস্র শিখা বিস্তার করে নাচছে সে আগুন।

সেই বিপুল বহ্নিশিখায় কী দেখলেন সুলতান? দেখলেন কি দুঃস্বপ্নে দেখা বিশ্বাস-অবিশ্বাসে রচিত কোন অশরীরী নারীমূর্তি?

আবারও বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—শ্রীহরিকে টানতে টানতে।

* * * *

আকবরও সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আগুনের দিকে তত ছিল না। আগুনের রক্তিমাভা-প্রতিফলিত পাটনার দিকেই চেয়ে ছিলেন তিনি উৎসুক হয়ে।

হয়তো অপর পারে দণ্ডায়মান ভীত, হত-চকিত, স্তম্ভিত, স্তব্ধ জনতা ছাড়া আরও কিছু নজরে পড়েছিল তাঁর, হয়তো পড়ে নি।···

হয়তো দূরভবিষ্যতেরও খানিকটা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

এই আলোয় নিজের সৌভাগ্যসূর্যেরই অরুণাভা দেখেছিলেন।···

সকালের আলো ফুটে ওঠবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুনিম খাঁ এসে দাঁড়ালেন। মুঘল পক্ষের অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি মুনিম খাঁ। খান-ই-খানান্।

'কী খবর, খাঁ সাহেব?'

'আজব কাণ্ড জাহাঁপনা। দায়ুদ কররাণী কাল রাত্রেই কয়েকটা নৌকো করে পাটনা ছেড়ে পুব দিকে পালিয়েছে। সে চলে যেতে তার সেনাপতিদেরও মন ভেঙে গেছে, তারাও নাকি এখন পালাবার আয়োজন করছে। কিছুই প্রায় নিয়ে যেতে পারে নি দায়ুদ কররাণী—সমস্তই পড়ে আছে পাটনায়। হাতী, ঘোড়া, হাতিয়ার, টাকা, রসদ, কামান—সব। শুধু কিছু লোক নিয়েছিল সঙ্গে—তা-ও ভয়ে তাড়াহুড়োতে আগে বেড়ে যেতে গিয়ে নিজেদের

মধ্যেই ধাক্কাধাক্কি হয়ে কয়েকটা নৌকো ডুবেছে, তার ফলে বহু লোক নদীতে ডুবে মারা গেছে।'

এক নিশ্বাসে এতগুলি সংবাদ দিয়ে, বোধ করি বা বাহবার আশাতেই বাদশার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন মুনিম খাঁ।

বাহবার লোভ কিন্তু বাদশারও কম ছিল না।

তিনি বিজয়গর্বদীপ্ত চোখে মুনিম খাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'তা হলে সেনাপতি মুনিম খাঁ, কাল আমার হুকুমটা শুনে যতটা নির্বোধ, যতটা উন্মাদ ভাবছিলেন আমাকে, এখন দেখা যাচ্ছে ততটা নির্বোধ বা বাতুল আমি নই —কী বলেন ?"

মুনিম খাঁ মাথা নত করেন।

নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে আকবর শা গত সন্ধ্যার বন্দিনীকে তলব করলেন।

নফিসা বিবি এসে দাঁড়াতে ইঙ্গিতে রক্ষীদের সরিয়ে দিলেন বাদশা, তারপর নিজে বন্দিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'নফিসা বেগম, তুমি মুক্ত। কিন্তু মুক্তি ছাড়া কিছু পুরস্কারও দিতে চাই। বল, কী চাও তুমি ?'

'পুরস্কার ?'

বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে নফিসার মুখে, 'না শাহানশাহ, আর কোন পুরস্কারেই আমার প্রয়োজন নেই। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। হাজীপুরের কিলাই তো আমাকে বকশিশ করেছেন জনাব।'

আকবর চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকটা।

কী অপরিসীম বেদনার ইতিহাসই না ফুটে উঠল ঐ ম্লান হাসিতে! কী নিবিড় নিঃসীম প্রেমের ইতিহাস প্রকাশিত হল ঐ কাজলকালো চোখ দুটির সকরুণ চাহনিতে!

সে দিকে চেয়ে বাদশার দৃষ্টি কি বারেক উৎসুক, বাসনার্ত হয়ে উঠল ?

হলেও তাঁর কথায় তা প্রকাশ পেল না, শুধু ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি প্রবীণ লুদী খাঁকে যে ভালবাসা দিয়েছ, তার কিছুও আমি পেলে ধন্য হয়ে যেতাম নফিসা।'

এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে নফিসার ঠোঁট দুটি শব্দ প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াসে

প্রথমটা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁপল শুধু, তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে কোন মতে সে বলল, 'মালিককে মনের সবটাই নিঃশেষে দিয়ে না দিলে আপনার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে আমিও কৃতার্থ হতাম জাহাঁপনা।'

॥ ৯ ॥

ইতিহাসে লেখা আছে—১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অগস্ট আকবর শাহ মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পরই হাজীপুর কিলা দখল করেন এবং শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

সেই আগুন দেখে সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন দায়ুদ কররাণী। বিষম ভয়। নিজের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে সেই রাত্রেই নৌকায় চেপে বাংলা দেশের দিকে পালিয়েছিলেন তিনি। একে অন্ধকার রাত, তায় ভরাবর্ষার পরিপুর্ণ খরস্রোতা গঙ্গা—তারই মাঝে দ্রুত পালাতে গিয়ে বেচারীর কত অনুচর যে নদীতে পড়ে প্রাণ হারাল তার ইয়ত্তা নেই।

গুজর খাঁ কি কতলু লোহানীও আর যুদ্ধের চেষ্টা করেন নি। তাঁরা পালিয়েছিলেন স্থলপথে। কিন্তু কিছুই প্রায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি। পরের দিন আকবর বাদশা যখন পাটনার শূন্য কিলায় প্রবেশ করলেন তখন বিপুল অর্থ, অসংখ্য হাতী, কামান ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সেখানে পড়ে আছে—অথচ একটি আফগানও নেই তা রক্ষা করার জন্য…

তারপর সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁও ; একটির পর একটি দখল করল মুঘল-বাহিনী। দায়ুদ তেলিয়াগঢ়ি গিরিবর্ত্মের কাছে একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধ দেবার। কিন্তু শত্রু যখন সত্যিই সামনে ও পিছনে এসে পড়ল তখন তিনি আবারও পালালেন—বিনাযুদ্ধে। হয়তো অজ্ঞাত কোন আতঙ্কেই।

বলতে গেলে হেঁটে যেতে যেটুকু দেরি। ২৫শে সেপ্টেম্বর মুঘল-বাহিনী কররাণীদের রাজধানী টাণ্ডায় প্রবেশ করল। দায়ুদ বাংলার আশা ছেড়ে উড়িষ্যার দিকে পালিয়ে গেলেন।

ইতিহাস শুধু ঘটনাটা বলে চুপ করে গেছে। আজও তার কারণটা দিতে পারে নি। ঐতিহাসিকদের দৌড় যে-সব বিবর্ণ ধূলিমলিন পুঁথিপত্র পর্যন্ত—সেখানে কারণটা লেখা নেই।

বিস্ময়—হ্যাঁ, বিস্ময়ের কথা বৈকি।

সুলেমান কররাণীর অযোগ্য পুত্র দায়ুদ। দায়ুদ মদ্যপ, লম্পট, হঠকারী, অত্যাচারী, ক্রোধী, নির্বোধ; কিন্তু দায়ুদ কাপুরুষ, দায়ুদ অস্ত্র ধরতে ভয় পান, এমন কথা কেউ বলে নি কখনও। অথচ সেই দায়ুদই—নিজের বিপুল এবং তখনও-পর্যন্ত-অপরাজেয় বাহিনী নিয়ে নিজের অধিকারে সুরক্ষিত অবস্থায় বসে, তখনও তাঁর পক্ষের একটি লোকও মরে নি বা একটি হাতিয়ারও ব্যবহার করতে হয় নি, তবু—শুধু গঙ্গার অপর পারে একটিমাত্র অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেই—ভয়ে আতঙ্কে অমন দিশাহারা হয়ে পালাবেন কেন? একেবারে বিনাযুদ্ধে, শত্রুর দিক থেকে আক্রমণের কোন আভাস পাবার আগেই?

কথাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

আজ নয় শুধু, সেদিনও অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল অনেকের কাছেই।

দায়ুদ কররাণীর বাপের আমলের সেনানায়ক গুজর খাঁ, কতলু লোহানী—এঁদের কাছেও।

চলন্ত পাহাড়ের মত সুশিক্ষিত হস্তিযূথ—যা তখনও পর্যন্ত ভারতে অদ্বিতীয়, অসংখ্য বীর পাঠান-সৈন্য, দুর্ধর্ষ সেনাপতি, পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ; এক কথায় অবস্থা সেদিন সবই ছিল দায়ুদের অনুকূলে। তবু—বিনাযুদ্ধে শুধু নয়, যুদ্ধের চেষ্টামাত্র, যুদ্ধের কথা চিন্তামাত্র না করে—কেন যে দায়ুদ সেই মধ্যরাত্রে, কী এক অজ্ঞাত অবর্ণনীয় ত্রাসে অমন করে পালালেন, এবং পালাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় বহু বিশ্বস্ত অনুচর, এমন কি প্রিয় স্বজনও হারালেন—সে কথা আজও যেমন কেউ জানে না, সেদিনও তেমনি কেউ জানত না।

সে অদ্ভুত আচরণের কারণ সেদিন ওঁরাও জানতে পারেন নি—গুজর খাঁ, কতলু খাঁর দলও।

সে আচরণ সেদিনও যেমন দুর্জ্ঞেয় ছিল, আজও তেমনি আছে।

যেমন আছে মুঘল-সম্রাট আকবর বাদশার আচরণও।

তিনিও যে কেন সেদিন, অত কাণ্ড অত আয়াসের পর, বহু-কষ্টে-অধিকৃত হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়ে দিলেন, এবং দিলেন সেই দিনই মধ্যরাত্রে—তা কেউ জানতে পারে নি। সে দিনও না—আজও না।

বিস্মিত হয়েছিলেন সকলেই, এমন কি অশীতিপর বয়স্ক রণকুশলী রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁ পর্যন্ত। তরুণ মনিবকে তিনি সেদিন প্রথমটা অপ্রকৃতিস্থই সন্দেহ করেছিলেন। এমন কি তারপরও—যখন

সত্যসত্যই নিজের চোখে দেখলেন দায়ুদ খাঁকে অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত পালাতে, পালাতে গিয়ে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে, তখনও—হাজীপুর কিলায় আগুন ধরাবার জন্যই যে দায়ুদ খাঁ অত ভয় পেয়েছিলেন, আর ভয় পাবেন জেনেই যে আকবর ঐ অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন—এটা কিছুতেই মানতে চান নি—কাকতালীয়বৎ বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন যুক্তিটা। আর সেই জন্যই আসল কারণটা জানতে তাঁর কৌতূহলের শেষ ছিল না—শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার জন্য সমান উৎসুক, ব্যগ্র ছিলেন।···

সে কথা ইতিহাসে লেখা নেই।

বহু ঘটনার ঘূর্ণিবাত্যায়, বহু যুদ্ধবিগ্রহের রক্তবন্যায়, মুঘল-পাঠান-বর্গী-পর্তুগীজ-ফরাসীস-ইংরেজ—বহুলক্ষ সওয়ারের বহুলক্ষ অশ্বক্ষুরে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-রাশিতে সে সামান্য, বিস্মৃতির-বাতাসে-উড়ে-যাওয়া ইতিহাসের পাতাটুকু কবেই বিবর্ণ হতে হতে একেবারে বর্ণহীন হয়ে কোথায় চাপা পড়ে গেছে—ইতিহাসের ছাত্র বা গবেষক কারুরই চোখে পড়ে নি তাই।

* * * *

দায়ুদ কররাণী সে-রাত্রে এমনই ভয় পেয়েছিলেন যে আকবরের বাহিনী এবং তাঁর মধ্যে দূরত্বের বিপুল বাবধান রচিত হবার আগে আর থামতে সাহস করেন নি। পালাতে পালাতে বহু শহর বা জনপদ শুধু নয়, আশ্রয় নেবার মত বহু সুরক্ষিত স্থানও ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আসল কথা, ভয়ে দিশা-হারা হয়েছিলেন তিনি—তাই কোনদিকে ফিরে তাকাতে পারেন নি। কেবলই পালিয়েছেন আর পালিয়েছেন। চল, চল—দূরে কোথাও, আরও দূরে, আরও দূর কোন নিরাপদ স্থানে। থেমো না, থেমো না—এখানে নয়—এখনও নয়।

এমনি করেই একে একে মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁও বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন দায়ুদ খাঁ। তিনি ঘুরে দাঁড়াবার কথা চিন্তা করলেন একেবারে রাজমহলের পাহাড় ডিঙিয়ে তেলিয়াগড়ি গিরিপথ পার হয়ে গুরুন্দায় পৌঁছে। ওখানকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পড়ে প্রথম বলতে গেলে থমকে দাঁড়ালেন তিনি—প্রথম নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করলেন একটু।

নিজের অবস্থার দিকেও তাকালেন একবার—বোধ করি এই প্রথম অবসর মিলল।

এমনি করে পালাতে পালাতে বহু ক্ষতি হয়েছে তাঁর—বহু সৈন্য পথশ্রমে

বা পথকষ্ট-জনিত রোগে মারা গেছে, বহু সেনা ও সেনানায়ক সর্দার তাঁকে ত্যাগ করে গেছে—তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়ে ভাগ্যান্বেষণেই অন্যত্র গেছে তারা—এমন কী তাঁর নিজের স্বজনও অনেককে হারিয়েছেন ইতিমধ্যে। আর্থিক ক্ষতি যে কত হয়েছে তা বোধ করি হিসাবেও আসে না। টাকাকড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, হাতী-ঘোড়া, তাঁবু, রসদ—আরও কত কী! একটা খুব বড় যুদ্ধেও এত ক্ষয়-ক্ষতি হত কিনা সন্দেহ।

তবু—এখনও যা আছে, হয়তো ফিরে দাঁড়ানো যায়। এখনও ভালমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে পারলে—যুদ্ধ একটা দেওয়া যায়। আর কিছুদিন পরে সে অবস্থাও থাকবে না হয়তো। এখনই যেন সকলকার মনোবল ভেঙে এসেছে ; আজও যারা তাঁর চার পাশে আছে, তাদের কেউই হয়তো থাকবে না দু'দিন পরে। শ্রীহরি গুহ বহুদিন থেকেই বিদায় চাইছেন, কতলু লোহানী উড়িষ্যায় গিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ঘাঁটি বা রাজ্যখণ্ড গড়ে তোলবার জন্য উন্মুখ, গুজর খাঁও ছটফট করছেন। সাধারণ সেনানায়করাও কেউ আর এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় থাকতে রাজী নয়।

দায়ুদ ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু সেটা আকস্মিক ভয়। আর আকস্মিক বলেই অমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তা নইলে তিনি সত্যিই কাপুরুষ নন।

তিনি মন স্থির করে ফেললেন। যুদ্ধই করবেন তিনি এবার।

শত্রুর সঙ্গে—এবং ভাগ্যের সঙ্গেও—মুখোমুখি দাঁড়াবেন।

মরতে হয় মরবেন, এমন করে মার খেয়ে ছুটে বেড়াতে রাজী নন তিনি। এ হীনতা মৃত্যুর অধিক।

এবং শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধই দিতে হয় তো এমন জায়গা আর কোথায় পাবেন? প্রকৃতিই এখানে যেন ব্যূহ-রচনার অর্ধেক ভার নিয়েছেন নিজের হাতে—নিজের হাতে প্রাচীর রচনা করে রেখেছেন। সামনে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, শত্রুকে আসতে হলে সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আসতে হবে—একে একে, অল্পে অল্পে। সে তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না। আর অল্পে এলে অল্পেই বিনষ্ট হবে—বেশী কোন আয়াসের বা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে না।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই দায়ুদ কাজ শুরু করে দিলেন।

সেনানায়কদের নিয়ে মন্ত্রণা করতে বসলেন। গুজর খাঁ, কতলু লোহানী, কালাপাহাড়, ইয়ার বেগ—সকলকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের বুদ্ধি চাইলেন, কিন্তু

দেখা গেল তাঁর নিজের বুদ্ধিও এ বিষয়ে একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়—কারণ তাঁর নক্শা তাঁর নির্দেশই সকলে অনুমোদন করতে বাধ্য হলেন।

দায়ুদ খাঁ যতই হোক সুলেমান কররাণীর ছেলে—যুদ্ধ তাঁর রক্তেই আছে।

সেনানায়করা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যুদ্ধ ক'রে জয়-পরাজয় যাহোক একটা কিছু নিষ্পত্তি হওয়ার অর্থ বোঝেন তারা—বিনাযুদ্ধে পালিয়ে বেড়ানোর অপমান যে অসহ্য।

ঠিক হ'ল এইখানেই পরিখা কেটে, মাটির গড় তুলে তাঁরা অপেক্ষা করবেন শত্রুর।

॥ ১০ ॥

খান-ই-খানান মুনিম খাঁর কানে যথাসময়েই খবরটা পৌছল।

তিনি চিন্তিত বোধ করলেন।

পাঠান-সৈন্যরা এমনিতেই উপেক্ষা করার মত শত্রু নয়—তার ওপর এখানে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক সুযোগ ওদের দিকে।

তিনি তাঁর অধস্তন সেনানায়কদের ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রণাসভাও বসল—কিন্তু তারাও কোন সুপরামর্শ দিতে পারলে না। বরং, তাদের কথাবার্তা শুনে মুনিম খাঁর মনে হ'ল, তারা অনেকেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার পক্ষপাতী। নিতান্ত চক্ষুলজ্জাতেই মুখ ফুটে বলতে পারছে না কথাটা।

মুনিম খাঁর নিজেরও যে সে প্রস্তাবে খুব বেশী আপত্তি ছিল তা নয়—কিন্তু এই ক'বছরেই তিনি তাঁর তরুণ মনিবটিকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছেন। আকবর শার ভ্রূকুটি ও বিরক্তির সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে আফগান সর্দারদের বর্শার সামনে দাঁড়ানো অনেক সহজ।

সুতরাং সমস্যাটা পূর্বেও যা ছিল, এত সলা-পরামর্শের পর এখনও তাই রইল। বরং মুনিম খাঁ আরও চিন্তাকুল, আরও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠলেন।

এই ভাবেই যখন নিষ্ক্রিয় ও একান্ত অনভিপ্রেত আলস্যে দিন কাটছে—হঠাৎ একদিন মুনিম খাঁর বড় তাঁবুর প্রবেশ-পথে এক বিচিত্র পসারিনী এসে দাঁড়াল।

তরুণী পসারিনী। সুশ্রী, এমন কি সুন্দরীও বলা যেত—যদি না অতিরিক্ত

খোলা জায়গায় বাস বা অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় সূর্যকিরণে ঘোরাফেরা করার জন্য তার দুগ্ধশুভ্র কান্তিতে ঈষৎ তাম্রাভ ছোপ লাগত, আর মুখের পুষ্পপেলব সুকুমার ত্বকে সামান্য একটু কাঠিন্যের আভাস জাগত।

বিচিত্র সে পসারিনী। রূপ এবং যৌবন—দুটোরই প্রাচুর্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। আর সেই অমোঘ ও অব্যর্থ অস্ত্রেই পথ কেটে কেটে মুঘল-শিবিরের প্রান্ত থেকে এই মধ্যবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। তা নইলে অপরিচিতার গতিবিধি সন্দেহ জাগাবারই কথা রক্ষী ও প্রহরীদের মনে। কিন্তু অমন সুরূপা তন্বী তরুণী মেয়েকে অবিশ্বাস করতে কারই বা মন চায়! কাজল-কালো চোখের মিনতি, রক্তগোলাপের পাপড়ির মত ওষ্ঠাধরের প্রান্তে করুণ-মধুর হাসিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছাড়পত্র। আর সেই ছাড়পত্রের জোরেই এসে পৌঁছেছে সে।

কিন্তু তাই বলে তার গায়ে কাউকে হাত দিতে দেয় নি সে-মেয়ে। কোমরে গোঁজা বাঁকা কিরীচ একটা ছিল ঠিকই, কিন্তু তাও খুলতে হয় নি—শুধু তার বঙ্কিম ভ্রূর কুঞ্চনে এবং অপূর্ব গ্রীবার অনবদ্য অবর্ণনীয় ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে যেটুকু সুষমা তার রূপে কটাক্ষে এবং মিষ্টহাসিতে বিতরণ করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী কিছু যেন কেউ প্রত্যাশা না করে। বেশী দিল্লাগি বরদাস্ত করতে রাজী নয় সে। একবার সান্ত্রীদের একজন সর্দার একটু বেশী সাহস প্রকাশ ক'রে ফেলাতে সে মুখেও বলেছিল, 'ছাখো খাঁ-সাহেব, আমরা পাহাড়ী মেয়ে, যা দিই তা স্বেচ্ছায় দিই। জোর ক'রে কিছু আদায় করতে পারবে না আমাদের কাছ থেকে।'

'কেন—বাধা কী? তোমার জোর আমাদের চেয়ে বেশী, এমন ধারণাই বা তোমার হল কেন? তোমার ঐ ছোট্ট কিরীচের চেয়ে আমার তলোয়ারের ধার আর ভার দুই-ই বেশী, এটা মানো তো?'

'কিন্তু খাঁ-সাহেব, তোমার ঐ তলোয়ার খাপ থেকে বেরোবার অনেক আগেই আমার এই কিরীচ তোমার বুকে গিয়ে ঢুকবে—এটা তোমার জানা নেই, তাই জোরটা কোথায় খুঁজে পাচ্ছ না।'

এই ব'লে একটু মুচকি হেসে, সত্যিই সর্দারের চোখের পলক পড়বার মধ্যেই এক আশ্চর্য কৌশলে কিরীচখানা খুলে ছুঁড়ে দিল সামনের পাহাড়ী-শালের একটা বড় খুঁটিতে—সেটা প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত কাঠে বিঁধে আটকে রইল। এবং বিস্মিত বিহ্বল খাঁ-সাহেব আর-একবার পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রায়

নিঃশব্দ লঘুপদে অথচ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে কিরীচখানা খুলে নিয়ে আবার অতি সহজে নিজের কোমরে গুঁজে একটু মুচকি হেসে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নত ক'রে বলল, 'দেখলে খাঁ-সাহেব ? ঐ খুঁটির বদলে তোমার বুকে বিঁধলেও তুমি বুঝতে পারতে না—মানে, বুঝতে বুঝতে কাজ শেষ হয়ে যেত। আর শুকনো শাল বলে অর্ধেকটা বিঁধে ছিল, তোমার ঐ খাসি-ঘি-দুধ-খাওয়া বুক সবটাই বিঁধত—হয়ত হাতল-সুদ্ধ।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে খাঁ-সাহেবের একটু সময় লাগল, তিনি ঢোঁক গিললেন একবার—কিন্তু তবু অত সহজে হাল ছাড়লেন না। হেসে বললেন, 'তা না হয় স্বেচ্ছাতেই কিছু দিয়ে যাও বিবি, ধর আমি তোমার দোরে ভিক্ষার্থী।'

'খাঁ-সাহেব, পাহাড়ী মেয়ের মনের গতি পাহাড়ী নদীর মতই—তার বেগ সামলানো সকলের কাজ নয়। সে বেগে পাহাড়-পাথর ভেঙে চুর হয়ে যায়, মানুষ তো কোন্ ছার! আমার আশা এবারের মত ছেড়েই দাও সাহেব।'

সে আবার মুচকি হেসে, আবারও সেলামের ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেলিয়ে চোখের নিমেষে মায়া-কুরঙ্গীর মতই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। খাঁ-সাহেব বাধা দেবার কথাটা ভাবতেও পারেন নি।

কিন্তু সর্বত্র সব বাধা অনায়াসে লঙ্ঘন করে এলেও স্বয়ং মুনিম খাঁর দোরে পৌঁছে পসারিনী সত্যিকারের বাধা পেল। আনওয়ার খাঁ বহুদিনের বিশ্বাসী লোক—মুনিম খাঁর দীর্ঘজীবনের অনেকখানিরই খবরদারী করে এসেছে সে। বয়স তারও সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও সে দুটো তেজী আরবী ঘোড়ার রাশ এক হাতে টেনে রাখতে পারে। তা ছাড়া আনওয়ার খাঁর আর-একটি মহৎ গুণ—নারী-কটাক্ষ সম্বন্ধে তার কোন দুর্বলতা নেই ; বিদ্বেষী নয়—বিদ্বেষ বরং জয় করা যায়—সম্পূর্ণ উদাসীন সে। বিবাহ করে নি, অন্য কোন রকমেও তার কোন ঘনিষ্ঠতা নেই কোন মেয়ের সঙ্গে। কতকটা সেই কারণেই মুনিম খাঁ তাকে বরাবর নিজের তাঁবু পাহারা দেবার ভার দিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে পুরুষের কাছে অন্তত—সব প্রলোভনের বড় প্রলোভন কোন্‌টি—এ অভিজ্ঞতাটা খান-ই-খানানের এই আশি বছরের জীবনে ভাল ক'রেই হয়েছে।

সুতরাং আনওয়ার খাঁকে কিছুতেই বিচলিত করা গেল না। না সে

পসারিনীর করুণ-মধুর হাসিতে, না তার কণ্ঠের অশ্রুঝরা মিনতিতে, আর না বিদ্যুৎভরা কোপকটাক্ষে—কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেলল মেয়েটি। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ কাজ হবে বলে মনে মনে কোন ভরসা পেল না।

অথচ এমন কোন কঠিন প্রার্থনা নয় তার। সে একবার শুধু নিভৃতে দেখা করতে চায় খান-ই-খানানের সঙ্গে।

আর আনওয়ার খাঁর তাতেই ঘোরতর আপত্তি।

নিভৃতে দেখা হওয়া অসম্ভব। এমনিও, আদৌ দেখা করতে দেওয়া হবে কিনা, সেটা আনওয়ার খাঁ ঠিক করবে প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে। কী ওর প্রয়োজন খুলে বলুক, তারপর সে বিবেচনা ক'রে দেখবে—মনিবের সামনে নিয়ে যাওয়ার মত গুরুতর কোন ব্যাপার কি না!

শুধু আনোয়ার খাঁ-ই নয়, তার চারপাশে আরও কয়েকটি সশস্ত্র প্রহরী। তীর ধনুক বর্শা—যায় নতুন-আমদানী বন্দুকও আছে তাদের কাছে। ওর সম্বল বলতে তো ঐ কিরীচ একখানি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা, তোমরা কেউ একজন গিয়ে মালিককে একটিবার বলই না যে, এমনি একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে একটু নিভৃতে দেখা করতে চায়। ভরসা না হয়—আমাকে নিরস্ত্র ক'রে হাত দুটো পিছমোড়া ক'রে বেঁধেই নিয়ে চল না তোমরা—তা হলে তো আর কোন অনিষ্ট করতে পারব না—ইচ্ছে থাকলেও। এতে এত ভয়ের কী আছে?'

'ভয়ের কথাই হচ্ছে না,' রূঢ়কণ্ঠে বলল আনওয়ার খাঁ, 'তোমার মত হরেক বাউরা লোক যদি এসে এমনি আজব আজব বাহানা করে—আর আমরা সেই কথা মালিককে শোনাতে যাই তো তিনি বলবেন কী? বলবেন, এমনি বিরক্ত হবার জন্যেই কি তোমাদের তন্‌খা দিই? না, আমরা এ কথা তাঁকে শোনাতে পারব না।'

পসারিনী বুঝল—তার তূণের সব অস্ত্রই এখানে নিষ্ফল হবে—কোনটাই কাজে লাগবে না। এর বাইরেটা মানুষের মত হলেও, ভেতরটা একেবারে পাথর। এখানে কিছু সুবিধা হবার আশা নেই।

সে অনেকক্ষণ সেইখানেই নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আর-একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে সরে এল সেখান থেকে।

অনির্দেশ্য তার পথ। কোন্ পথে কোথায় যাবে কে জানে! কতকটা

লক্ষ্যহীন ভাবেই চলতে চলতে অসংখ্য তাঁবুর মধ্যেকার আঁকা-বাঁকা পথে এক-সময় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সে।···

আনওয়ার খাঁ আতর-মাখানো গোঁফে 'তা' দিয়ে নিল একবার।

॥ ১১ ॥

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু আগে মুনিম খাঁ, কতকটা যেন সমস্ত ব্যাপারের ওপর বিরক্ত হয়েই, হঠাৎ ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লেন।

আশি বছর বয়স, কিন্তু এখনও তাঁর মত অশ্বারোহী এ অঞ্চলে কেউ নেই—তা তিনিও জানেন। ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলে এখনও তাঁর রক্তে যেন যৌবনের আমেজ লাগে, সব চিন্তা বিরক্তি ক্লান্তি মুছে যায় মন থেকে। আসলে সেই কারণেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি, নইলে বেড়াতে যাবার অভ্যাস তাঁর নেই।

দেহরক্ষীরা সকলেই প্রস্তুত ছিল—কিন্তু সঙ্গে নিলেন মাত্র চারজনকে। বললেন, 'হাঙ্গামা করবার দরকার নেই, এই গঙ্গার দিকটা একটু ঘুরে আসব শুধু। আমাদের শিবিরের মধ্যে দিয়েই তো যাব—এত হৈ-চৈ করার কী আছে? অমনি আমাদের লোকজন কেমন ভাবে আছে সেটাও দেখে আসা হবে। একটু চুপি-চুপি না বেরোলে সে কাজটা সারা হবে না। বেশী লোক নিলেই হৈ-চৈ—সকলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

সার সার তাঁবু—ছোট বড় মাঝারি। তার ফাঁকে ফাঁকে বড় ছোট মাঝারি নানা গাছ। পথ গিয়েছে এরই ভেতরে ভেতরে ঘুরে ঘুরে। মুনিম খাঁ খানিকটা কদম-চালে চলতে চলতে বিরক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত একটা সরল রেখা পেয়ে বেরিয়ে এসে পড়লেন একেবারে নদীর দিকের প্রান্তে। এখানটা এখনও অনেক ফাঁকা আছে, সেনারা মাঠেই পড়ে থাকে—এত লোকের জন্য তাঁবু রাখা যায় না। কিছু কিছু ঝোপ্ড়ার মত বাঁধা রয়েছে পাতা-লতা দিয়ে, কিন্তু সে খুব বেশী নয়। ফাঁকা জায়গায় পড়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মুনিম খাঁ।

কিন্তু খানিকটা গিয়েই তাঁর নজরে পড়ল দূরে এক জায়গায় বহুলোক জড়ো হয়েছে—বেশ জমাট ভীড়।

তখন দিনের আলো আর বিশেষ নেই, ইতিমধ্যেই বেশ গাঢ় অন্ধকার

নেমেছে ঘনপল্লব আমগাছগুলোর শাখাপ্রশাখায়—তার বাইরেও আবছা আবছা দেখা যায় মাত্র, ভাল ক'রে কিছু নজরে পড়ে না।

'কী ব্যাপার ওখানে দেখে এস তো কেউ। দিলাওয়ার খাঁ, তুমি যাও।'

থমকে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন মুনিম খাঁ।

দিলাওয়ার খাঁ ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

কদর আলি বলে আর একজন সঙ্গী বলল, 'বোধ হয় কেউ কিছু তামাশা-টামাশা দেখাচ্ছে জনাবালি, দেখছেন না এরই মধ্যে ওরা মাঝখানটায় চার-চারটে মশাল জ্বেলেছে।'

কাছের দৃষ্টি কিছু আচ্ছন্ন হলেও, দূরের দৃষ্টি এখনও মুনিম খাঁর খুব পরিষ্কার। তিনি ঘাড়টা উঁচু ক'রে দেখলেন কদর আলির কথাই ঠিক। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এসব তামাশা-ওয়ালাদের শিবিরে ঢুকতে দেয় কে?·· এই করেই শিবিরের খবর বাইরে যায়। আসলে ওরা গুপ্তচর সব।'

দিলওয়ার খাঁ ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না তিনি—ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে।

খেলাটা নিশ্চয়ই খুব জমে উঠেছিল—এঁদের পায়ের আওয়াজ তাই কারুর কানে গেল না। তারা যেমন অখণ্ড মনোযোগে পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করছিল তেমনিই দেখতে লাগল। ফিরে চাইল না বলেই স্বয়ং খান-ই-খানানের উপস্থিতিও কেউ টের পেল না, নইলে অবশ্য খেলা ভেঙে যেত তখনই।

মুনিম খাঁও নিজের উপস্থিতিটা তখনই জানিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করলেন না, বরং ইঙ্গিতে নিরস্তই করলেন অনুচরদের। ঘোড়ার ওপর থাকায়, ওঁদের দেখতে কোন অসুবিধা হ'ল না—মুনিম খাঁ বেশ খানিকটা দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

গাছ আর খুঁটি মিলিয়ে চার কোণে চারটে মশাল জ্বালা হয়েছে, তারই মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গাতে নাচছে একটি মেয়ে।

কিন্তু—আর একটু ভাল করে দেখেই মুনিম খাঁ বুঝতে পারলেন—মেয়েটা শুধুই নাচছে না। সাধারণ নাচউলী নয় সে, ওরই মধ্যে কী সব খেলাও দেখাচ্ছে।

নিশ্চয়ই জাদুকরী বেদেনী।

অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ চোখ মুনিম খাঁর, সেই স্বল্পালোকেই চিনলেন, পুবদেশের

পাহাড়ী মেয়ে—কিন্তু একেবারে খাঁটি ঐ দেশেরও নয়—ইরাণী রক্তও কিছু আছে ওর দেহে। তাই পশ্চিমের ত্রুটিহীন তীক্ষ্ণতার সঙ্গে পুর্বের নমনীয় পেলবতা মিশে দুর্লভ শ্রী দান করেছে মেয়েটিকে। পরম রমণীয় শুধু নয়, একান্ত লোভনীয়ও সে। রূপসী, প্রাণচঞ্চলা, নৃত্য-নিপুণা, লাস্যময়ী নারীরত্ন।

মুনিম খাঁ সাধ্যমত আর একটু এগিয়ে গেলেন।

ছুরির খেলা দেখাচ্ছিল নর্তকী।

দু হাতে তিনখানা ছোরা নিয়ে খেলছিল সে। নাচতে নাচতেই খেলছিল, একটা ক'রে ছোরা সর্বদা শূন্যেই থাকছে—আর দু হাতে দুটা ক'রে ক্রমান্বয়ে লুফছে সে। আরও আশ্চর্য, ধরছে সে প্রত্যেকবারই ছোরার ডগাগুলো। ধারাল ছুরির ফলা মশালের আলোয় চক্‌চক্‌ ক'রে উঠছে—অর্থাৎ খেলাঘরের ছোরা নয় কোনটাই। ধরছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে—এত দ্রুত এত নিপুণতার সঙ্গে যে, দু হাতে তিনটে ছোরা লুফতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। নির্ভুল হিসাবে একটা ঠিক শূন্যেই তার ভারসাম্য বজায় রেখে যাচ্ছে।

মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মূনিম খাঁ।

যেমন হাতের কসরত, তেমনি সুঠাম দেহের হিল্লোল। সবটাই নিখুঁত ছন্দে বাঁধা যেন।

হাতও বন্ধ নেই—নাচও না।

কেমন ক'রে এ সম্ভব—চোখে দেখেও বুঝতে পারেন না তিনি। এ কি সাধারণ মানবী, না বেহেস্তের হুরী!

তিনি চোখে ঠিক দেখছেন তো?

এর ভেতরই, সানন্দ বিস্ময়ের আমেজ কাটতে-না-কাটতে, বখ্‌ৎ খাঁ কানে কানে বলল, 'এই মেয়েটাই দুপুরবেলা গিয়ে আপনার তাঁবুর সামনে হল্লা করছিল, জনাব। বলে, আপনার সঙ্গে সে আড়ালে একলা দেখা করবে।'

'তারপর?' উত্তেজিত ভাবে মুনিম খাঁ ওর হাতটা চেপে ধরেন, 'কই, তোমরা কেউ বল নি তো সে-কথা!...যায়ও নি তো আমার কাছে।'

বখ্‌ৎ খাঁ মনিবের এতটা আগ্রহ আশা করে নি। সে একটু ভয়ে-ভয়েই বললে, 'ওর কী দরকার কিছুতেই খুলে বলতে রাজী না হওয়ায় আনওয়ার খাঁ ওকে যেতে দেন নি—'

'আনওয়ার খাঁ পয়লা-নম্বরের বেঅকুফ্‌। আর তাকে এত মুরুব্বিয়ানা করতেই বা বলছে কে! কথাটা আমাকে জানালেও তো পারত।'

অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে বলেন মুনিম খাঁ। অনুপস্থিত আনওয়ার খাঁর অদৃষ্টে যা আছে তা তো আছেই—আপাতত নিজেদের উপস্থিতিটা গোপন করতে পারলে বেঁচে যেত বখ্‌ত খাঁ। কারণ মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেবার সময় তারাও ছিল—এ কথাটা ওঁর মাথায় যেতে বেশী দেরি হবে না।

কিন্তু মুনিম খাঁ তাঁর বিরক্তির খেসারৎ আদায় করার বিশেষ সময় পেলেন না—ইতিমধ্যেই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

উপস্থিত দর্শকরা কেউ প্রধান সেনাপতির আগমন টের না পেলেও, নর্তকীর চোখে সেটা এড়ায় নি। সে প্রথম থেকেই ওঁদের লক্ষ্য করেছিল—এবং সম্ভবত চিনতেও পেরেছিল।

কিন্তু সামান্য মাত্র আভাসেও সে-কথা বুঝতে না দিয়ে অকস্মাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসল সে, পলকের মধ্যে হাতের ভঙ্গী পাল্‌টে ছোরা তিনখানা শূন্যে না ছুঁড়ে মুনিম খাঁর দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ল।

কিন্তু আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়, নৈপুণ্য দেখানোর জন্যই।

সুনিপুণ অভ্যস্ত হাতের অভ্রান্ত লক্ষ্য ভুল হ'ল না। সেই অগণিত দর্শকের মাথা ডিঙিয়ে সে-ছোরা নিমেষের মধ্যে মুনিম খাঁর দুই পাশ ও মাথার উপর দিয়ে পিছনের একটা আমগাছে গিয়ে বিঁধল।

মুনিম খাঁও টের পেলেন না ব্যাপারটা—চোখে দেখতে তো পেলেনই না, কারণ ঘটনাটা ঘটল এক লহমারও ভগ্নাংশকাল মধ্যে, চোখের তারার ওপর যতটুকু ছায়াপাত করলে দৃষ্টিতে পৌছয়, ততটুকুও রইল না তারা কোথাও। শুধু হাওয়া কাটাবার তিনটে শব্দে ও কানের ডগায় লাগা বাতাসের ঝাপটে অনুভব মাত্র করলেন, কী দুটো পদার্থ তাঁর কানের চামড়ার অতি নিকট দিয়ে চলে গেল।

বেশ কয়েক লহমা সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ছোরাগুলো দেখে বুঝলেন।

ততক্ষণে নর্তকী আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে।

হৈ-চৈ পড়ে গেল বইকি!

এটাকে গুপ্তচরের আক্রমণ মনে ক'রে মুনিম খাঁর দেহরক্ষীরাও শিউরে চিৎকার ক'রে উঠল—নিজেদের অজ্ঞাতেই। দিলাওয়ার খাঁ ভীড় সরিয়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করল।

দর্শক সেনারাও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে, এবং চিনতে পেরেছে তাদের প্রধান সেনাপতিকে।

চারিদিকে হৈ-চৈ, ছুটোছুটি, ঠেলাঠেলি। প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে পাশ কাটিয়ে চোখের আড়াল হবার চেষ্টা। কে জানে এই কাণ্ডর পর খান-ই-খানানের মেজাজ কোথায় ওঠে!

চেঁচামেচি গণ্ডগোলের অন্ত থাকে না।

কিন্তু মেয়েটি এতটুকু বিচলিত হয় না। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে—হাসিমুখেই।

আর বিচলিত হন না মুনিম খাঁ।

তিনি ভুল বোঝেন নি। তাঁকে লক্ষ্য করাই উদ্দেশ্য হ'লে, সে লক্ষ্য ভেদ করতে যে মেয়েটির দেরি হ'ত না তা তিনি বুঝেছেন।

তিনি হাত তুলে নিরস্ত করেন রক্ষীদের। চেঁচিয়ে ওঠেন, 'হুঁশিয়ার, দিলওয়ার খাঁ! হুঁশিয়ার! সাম্‌হারকে!...ওর গায়ে হাত দিও না কেউ।'

এ আবার কী!

দিলওয়ার খাঁ বিভ্রান্তভাবে তাকায় মালিকের দিকে। সবেগে ঘোড়া ছুটিয়েছিল সেদিকে, এখন প্রাণপণে রাশ টেনে সামলাবার চেষ্টা করে। ভাগ্যিস, হাতের বর্শা আগেই ছোটে নি। সুন্দরী নারী না হয়ে পুরুষ হ'লে দিলওয়ার খাঁ প্রমাণ ক'রে দিত দূর থেকেই—তার অব্যর্থ লক্ষ্যের সুখ্যাতি।

কিন্তু এত কেউ ভাববারও সময় পায় না—কারণ তার আগেই ভীড় ঠেলে এগিয়ে যান মুনিম খাঁ। ভীড়ও খুব ঠেলতে হয় না অবশ্য—সামনে যারা ছিল, তারা তখন পেছনে যাবারই সাধনা করছে। দেখতে দেখতে নর্তকীর চারিদিকের জমিন ফাঁকা সাফ হয়ে গেল।

সে মেয়েটি কিন্তু স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে—হাসি-হাসি মুখে, দুই হাত বুকের ওপর আবদ্ধ করে।

মুনিম খাঁ কাছে যেতে সে আরও একবার আভূমি নত হয়ে সেলাম করল, 'বন্দেগী জনাব!'

মুনিম খাঁ কিন্তু সে অভিবাদনের জবাব দিলেন না। মশালের আলোতে যতটা দেখা যায়, আপাতকঠোর দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলেন তাকে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন, 'এ কাজ করলে কেন?'

'আপনার নজরে পড়বার জন্যে, জনাব। আজ দু'দিন ধরে আপনার দেখা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি।'

'হুঁ। যদি তোমার হাতের লক্ষ্যে ভুল হ'ত, যদি আমার গায়ে লাগত?'

'লাগত না, জনাব। আপনি আমার চোখ বেঁধে ঐ ছোরা তিনখানা আমার হাতে দিন—আর আপনি ঐ আগের মতই দূরে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু শব্দ করুন, কি ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করুন, আমি আবারও ঠিক ঐভাবেই ওগুলো ছুঁড়ব, আপনার গায়ে আঁচড়টুকুও লাগবে না। এককালে অনেক যত্ন ক'রে এই খেলা শিখেছিলুম এক বুড়ো চীনা পাহাড়ীর কাছ থেকে—এখনও আমার এ-ই জীবিকা। ভুল হ'লে চলে কখনও?'

মুনিম খাঁ আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দেখলেন তাকে।

পশ্চিম-আকাশে তখন দিনের দীপ্তি একেবারেই ম্লান হয়ে এসেছে। এক-সময়কার ঐশ্বর্য-সমারোহ এখন স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত। সূর্যের আর চিহ্ন নেই, শুধু দিগন্তরেখার অনেক উঁচুতে একটা সাদা মেঘে তার একটু আভাস তখনও পাওয়া যায়, নীচের দিকের খানিকটা অংশ তখনও লাল হয়ে আছে। কিন্তু সে বহুদূর, তার আলো এখন শুধু আমগাছগুলোর ডগাতেই যা একটু লেগে আছে—নীচে সেই গাছগুলোর শাখা-প্রশাখার তলায় তলায় অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে।

হঠাৎ চারিদিকের গাছপালা পত্রপল্লব দুলিয়ে একটা ঝিরঝিরে বাতাস উঠল। মুনিম খাঁ অন্যমনস্কের মত একবার মুখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে, পশ্চিম-দিগন্তের মেঘখানার দিকেও—তারপর আবার চোখ নামিয়ে আনলেন নর্তকীর মুখে।

মশালের আলো। তা হোক, অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ আলোর ঔজ্জ্বল্যও কিছু বেড়েছে বইকি। চার-চারটে মশালের আলোতে দেখতে কিছু অসুবিধা হয় না।

এ মেয়েটা তাঁর স্মৃতির শান্ত সরোবরে হঠাৎ একটা বড় রকমের ঢেউ তুলেছে। আলোড়িত হচ্ছে তার জল। অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া কী একটা কথা মনে করবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে তাঁর মস্তিষ্ক।

অবশেষে গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে যতটা সম্ভব রূঢ় করবার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কে? ঠিক-ঠিক বল।'

'আপনার এ বাঁদীর নাম নফিসা। এর বেশী পরিচয় এখানে দিতে পারব না, জনাব। নিভৃতে যদি দেখা পাই তো বলব।'

নফিসার কণ্ঠস্বর সহজ কিন্তু দৃঢ়।

এ ধরনের কণ্ঠস্বর মুনিম খাঁ চেনেন। এ স্পর্ধা নয়, শক্তির প্রকাশ। একে ভয় দেখিয়ে কিছু করানো যাবে না।

কিন্তু—

চীন থেকে আনা দর্পণে বহুবার নিজের মুখ দেখেছেন মুনিম খাঁ। নিত্যই দেখেন। ললাট, চিবুকের ভঙ্গী আর গলার ঐ খাঁজটার সঙ্গে তাঁরও দেহের ঐ অংশগুলোর অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছেন। বার-বারই চোখে পড়ছে সেটা। আঘাত করছে তাঁর দৃষ্টিকে।

তাছাড়া এমনি দেহ-সুষমা, এমনি নৃত্য-লালিত্য, দাঁড়িয়ে থাকার এমনি মহিমময় ভঙ্গী—এর আগে কোথাও কি দেখেন নি তিনি?···

ঘোড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'বেশ, আমার সঙ্গে তাঁবুতে এস। দিলাওয়ার খাঁ, বখ্‌ৎ খাঁ—দু'পাশে থেকে সাবধানে নিয়ে এস ওকে—দেখো, না পালায়।'

॥ ১২ ॥

বাইরের গাঢ় অন্ধকার থেকে তাঁবুর মধ্যে এসে প্রথমটা চোখ ঝলসে গেল নফিসার। তাঁবু বড়—দরবারী তাঁবু। খান-ই-খানান এখানে স্বয়ং বাদশার প্রতিনিধি—সেইরকমই আসবাব তাঁর তাঁবুতে। হোক না যুদ্ধক্ষেত্র, তবু আরামের আয়োজনে ত্রুটি নেই।

অবশ্য চার-চারটে ঝাড়ে চব্বিশটা তেলের আলো—এর সঙ্গে আরামের সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধ সেনাপতিকে রাত্রেও কাজ করতে হয়, আলো তাঁর একটু বেশীই দরকার।

আরামের আয়োজন অন্যত্র। প্রশস্ত চারপাইতে নরম পুরু বিছানা, সমস্ত মাটিটা দামী জাজিমে ঢাকা। সুন্দর ধূপের গন্ধ। আলনায় ভাল ভাল পোশাক সাজানো—আরামের সঙ্গে আড়ম্বরের অপূর্ব মিলন।

একটা ছোট্ট চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নফিসার।

বড় সেনাপতি, বড় উজীর সে-ও দেখেছে। তিনি ইচ্ছা করলে আরও আড়ম্বর আরও বিলাসের মধ্যে থাকতে পারতেন—কিন্তু তাঁর রুচি ছিল অন্যরকম। সাধারণ ভাবেই থাকতেন—সাদাসিধা আয়োজনের মধ্যে।

তবু অনেক দিন পরে এই তাঁবুতে ঢুকে—সেই তাঁবুর কথাই মনে পড়ে যায়।

বেশীদিনের কথাও তো নয়। কিছুদিন আগেও এমনি এক তাঁবুতেই বাস করেছে সে। কিন্তু সেখানে ছিল একেশ্বরী, প্রায় মালেকা। এখানে ভিখারিণী, আগন্তুক, সন্দেহভাজন।

চোখের কোণে এতদিন পরেও দু ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু ঠেলে ওঠে ওর।

মনের মধ্যেকার অভিমানটা কিছুতেই মরতে চায় না—আশ্চর্য! এত দুঃখ, অদৃষ্টের এত পরিবর্তনের পরেও না!···

ইতিমধ্যে কোমরবন্ধটা খুলে খাওয়াসের* হাতে দিয়ে বিছানাতেই আরাম ক'রে বসেছেন মুনিম খাঁ। পাশেই একটা রেশমের আস্তরণ-ঢাকা কাঠের চৌকি—তাতেই কখন তলোয়ারখানা খুলে রেখে দিয়েছেন নফিসা লক্ষ্যও করে নি। যখন চারিদিকের আসবাব ও আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে সে মুনিম খাঁর দিকে তাকাল, তখন একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তিনি ওর দিকেই চেয়ে আছেন নিঃশব্দে।

একটু পরে ওঁর খাওয়াস আর-একটা চৌকির ওপর মদের পাত্র রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল—বোধ হয় মালিকের চোখের চাহনিতে সেই নির্দেশই পেয়েছিল। এইবার মুনিম খাঁ রক্ষীদেরও আঙুলের ইঙ্গিতে বাইরে যেতে বললেন। তারা বিস্মিত হলেও, সে বিস্ময় প্রকাশ করতে বা দেরি করতে সাহস করল না—তাঁবুর পরদাটা সাবধানে টেনে নামিয়ে দিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল।

এইবার মুনিম খাঁ চোখের ইশারায় নফিসাকেও বসতে বলে সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন, 'এইবার বল, তুমি কে?'

'জনাব, আমি বাঁদী-ই—সত্যি-সত্যিই বাঁদী। আমার এমন কোন মহৎ পরিচয় নেই। মিঞা লুদী খাঁ ছিলেন আমার মালিক।'

'লুদী মিয়া! সুলেমান কররাণীর উজীর লুদী মিয়া?'

'জী।'

'তা তুমি এভাবে এখানে ঘুরছ কেন? আমার সঙ্গেই বা তোমার কী দরকার?'

সন্দেহে কুটিল হয়ে ওঠে মুনিম খাঁর ভ্রূ।

তাহলে কি শেষ পর্যন্ত আনওয়ার খাঁ-দের সন্দেহই ঠিক?

কররাণীদের গুপ্তচর?

কিন্তু সন্দেহটা মুখে প্রকাশ করার অবসর মেলে না। তার আগেই নফিসা

---

* খাস খানসামা।

বলে ওঠে, 'জনাব, যা ভাবছেন তা নই আমি। আজ আমার চেয়ে দায়ুদ কররাণীর শত্রু আর-কেউ নেই এ-পৃথিবীতে।'

'কিন্তু সে-কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করব?' খাঁটি ইস্পাতের মতই যে কঠিন হ'তে পারে মানুষের কণ্ঠস্বর তা সে-মুহূর্তে মুনিম খাঁর কণ্ঠ না শুনলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

'যে-কোন কসম খেতে বলবেন—খেতে রাজী আছি।'

'কসম? ঝুটা কসমের সাজা তো পরলোকের জন্যে তোলা থাকে, বিবি। যারা গোয়েন্দাগিরি ক'রে ইহলোকের সুখ-সুবিধা গুছিয়ে নেয়, তারা পরলোকের ভাবনায় অত কাতর নয়।'

কঠিন আনন্দহীন একপ্রকারের হাসি হাসেন মুনিম খাঁ।

'জনাব, আপনি জানেন লুদী মিয়াকে কী ভাবে মেরেছিল দায়ুদ কররাণী?'

এবার মুনিম খাঁর বহু-বলি-রেখাঙ্কিত ললাট একটু একটু ক'রে যেন প্রসারিত হয়। হ্যাঁ, জানেন বইকি তিনি। বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য লুদী মিয়া। সুদূর দিল্লীতে পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধির ও বিশ্বস্ততার খ্যাতি প্রচারিত ছিল। বস্তুত, তাঁর বুদ্ধির এবং পরামর্শের ওপর নির্ভর ক'রেই সুলেমান কররাণী তাঁর সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। মহান্ মানুষ ছিলেন লুদী মিয়া। ...নির্বোধ হঠকারী দায়ুদ কররাণীকে তিনিই দয়া ক'রে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ বায়াজিদকে হত্যা ক'রে যে-লোকটা গৌড়বাংলার সিংহাসন নিয়েছিল—তাকে লুদী মিয়াই অপসারিত করেন। শৌর্যের আইনে সে-সিংহাসন ছিল সেদিন লুদী মিয়ারই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি তা নেন নি। প্রাক্তন প্রভুর ছেলে হিসাবে ঐ অপদার্থ টাকেই বসিয়েছিলেন। সে ঋণ শোধ করেছিল হতভাগ্য নির্বোধটা লুদী মিয়ার পুত্রতুল্য জামাইকে খুন করিয়ে।

তবু লুদী মিয়া তাতে দুঃখিত হলেও নিমকহারামি করেন নি। বিরক্ত হয়েছিলেন—বিশ্বস্ততা হারান নি। কিন্তু মানুষের এতখানি মহত্ত্ব দায়ুদের মত লোকের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত; সে তাঁর আচরণকে ভুল বুঝে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। অবশেষে শয়তান-সহচর বেইমান গুজর খাঁ আর কতলু খাঁর পরামর্শে—প্রবল শত্রু অর্থাৎ মুনিম খাঁ যখন রাজ্যের দ্বারে উপস্থিত —তখন তাঁকেই সরিয়ে দিল সে—রাজ্যজয়ের সর্বস্ব-পণ-করা এই চরম শতরঞ্জ-খেলায় বোড়ের বুদ্ধিতে দাবাকেই খুইয়ে বসে রইল। তারই কল্যাণের জন্য লুদী মিয়া মুনিম খাঁর সঙ্গে যখন সন্ধির কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তখন মিথ্যা

প্রয়োজনের অজুহাতে একা নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্গ পিতৃতুল্য বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুকে নিজের তাঁবুতে ডেকে এনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। লুদী মিয়াও কি সে-আশঙ্কা করেন নি? অবশ্যই করেছিলেন, মুঘল ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত যাঁকে হিন্দুস্থানের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী বলে স্বীকার করেছেন—তিনি কি এই সামান্য ছলটুকু বোঝেন নি? নিশ্চয় বুঝেছিলেন, কিন্তু শির দিলেও ইমান দেন নি, সুলেমান কররাণীর নিমকের অমর্যাদা করেন নি। প্রভুর আদেশ পালন করতে জেনেশুনে মৃত্যুর গহ্বরে পা দিয়েছিলেন।...

'জানি বইকি। সবই জানি আমি।' অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে ঈষৎ সম্ভ্রমের সুরেই বলেন মুনিম খাঁ, 'ওঁকে খুন ক'রে নিজের তগদরিকেই খুন করেছে মূর্খ দায়ুদ কররাণী। এতবড় নির্বুদ্ধিতা বোধ হয় দুনিয়ার আর-কেউ কখনও করে নি।...তা তুমি এখন কী চাও? আশ্রয়?'

একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর কি ছিল মুনিম খাঁর কণ্ঠে? অথবা সামান্য আশা? আশ্রয় চাইলেই কি খুশী হন তিনি?

নফিসা ঘাড় নাড়ে—'না, জনাব। খোদার তৈরী বিশাল দুনিয়া থাকতে আশ্রয়ের জন্য কাতর হব কেন? আশ্রয় চাই না। চাই প্রতিহিংসা। দায়ুদ কররাণীর সর্বনাশ চাই, তাই আপনার কাছে এসেছি।'

আবার একটা সাংঘাতিক সংশয় ছায়াপাত করে মুনিম খাঁর মনে।

কে জানে কার সর্বনাশ সত্যিই চায় এ মেয়ে! ওঁকেই ভোলাতে এনেছে কিনা—তারই বা ঠিক কী!

মুনিম খাঁ নিঃশব্দে তাঁর ঘন শ্বেত ভ্রূ দুটোর মধ্য দিয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, মুখ দেখে মনের খবরটা আঁচ করবার জন্য।

কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইলেই মনটা এমন ক'রে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চায় কেন—বিস্মৃতির সমুদ্র মন্থন ক'রে স্মৃতিকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেন?

নফিসা আর-একটু সরে এসে বসেছে। সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বিরাট তাঁবু—তার ঠিক মধ্যকেন্দ্রে বসে আছে ওরা। বাইরে থেকে ওদের কথা কেউ শুনবে—সে সম্ভাবনা কম।

তবু উত্তেজিত কণ্ঠ যতদূর সম্ভব নামিয়ে বলে, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না জনাব, সন্দেহও করবেন না। দরকার হয়, আমাকে কয়েদ রাখুন। আমার শির জামিন রাখছি।...কিন্তু দয়া ক'রে আমার কথা শুনুন।...এখন যেভাবে

গড়খাই কেটে বসেছে দায়ুদ, সোজা গিয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারবেন না। বিস্তর লোকক্ষয় হবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে। অন্য পথ আছে, রাজমহলকে বেড়ে ডাইনে রেখে ঘুরে যান। সামনে কিছু লোক থাকুক, তাঁবু-টাঁবু পড়ে থাক্। আপনারা সেই পথ ধরে চলে যান একেবারে পিছনে। খোলা জায়গায় দুশমনের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বারও সুবিধা হবে, তা ছাড়া হঠাৎ ঐ আক্রমণে ভয় পেয়ে দিশাহারা হয়ে যাবে ওরা, লড়াই করতেই পারবে না।'

'এ পরামর্শ তুমি বৃদ্ধ মুনিম খাঁকে না দিলেও পারতে বাঁদী, এ সোজা বুদ্ধিটা মাথায় না এলে বৃথাই এতকাল লড়াই ক'রে শির পাকালুম কেন? তিন-চারজনকে পাঠিয়েছিলুম আমি, তারা সকলেই ফিরে এসে জানিয়েছে, এমন কোন পথই নেই ওদিকে, যাতে এতবড় ফৌজ নিয়ে যাওয়া যায়।'

স্পষ্ট বিদ্রূপ এবার খান-ই-খানানের কণ্ঠে।

শুনতে-শুনতেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে রক্তাক্ত ক'রে ফেলেছিল নফিসা, এবার সে স্থান-কাল-পাত্র বক্তার পদমর্যাদা সব ভুলে তর্জনী তুলে মুনিম খাঁকে নিরস্ত করল, তারপর তেমনি চাপা উত্তেজিত কণ্ঠেই বলল, 'যাদের পাঠিয়েছিলেন জনাব, হয় তারা বেইমান—নয় অন্ধ। পথ আছে, সে পথের ছক আমি এঁকে এনেছি একেবারে, সে আমার বুকে-বুকেই ঘুরছে।'

কাঁচুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা সাদা-মত কী জিনিস বার ক'রে সেইখানে বসেই মুনিম খাঁর কোলে ছুঁড়ে দেয় সে।

বিজয়গর্ব তার চোখে।

বার বার গোস্তাকি! মুনিম খাঁর মত কড়া মেজাজের লোকের পক্ষে এর একটাও সহ্য করাই বিস্ময়ের কথা। কিন্তু কে জানে কেন তিনি সহ্যই করলেন আজ। বরং সাগ্রহে সাদা বস্তুটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

খানিকটা সাদা কাপড়। কানি-ই বলা যায়। তাতে লাল রঙ দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে আঁকা-বাঁকা একটা নক্‌শা আঁকা। তবু পাহাড় ও গ্রামের নাম-গুলো দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না। পথ একটা সত্যিই দেখানো হয়েছে।

'কিন্তু এই পথ যে সত্যি-সত্যিই আছে কেমন ক'রে জানব?'

'আমার সঙ্গে কোন বিশ্বাসী লোক দিন—আমি আগে নিয়ে গিয়ে তাকে চুপি-চুপি দেখিয়ে আনি।'

'মানলাম পথ আছে হয়ত। কিন্তু তুমি যে আমাদের সঙ্গে বেইমানি করছ না কেমন ক'রে বুঝব? এখান থেকে রওনা হ'লেই তোমার ইশারামত ওরা যদি আমাদেরই পেছন থেকে আক্রমণ করে?'

'আমাকে জামিন রাখুন।'

'তোমার জামিনের মূল্য কতটুকু? তুমি যে নিজের জান দিয়ে ওদের উপকার করতে আসো নি—কেমন ক'রে বুঝব?'

এবার সত্যিই বিপন্ন বোধ করে নফিসা। একটা সুগভীর ক্লান্তির ভাবও বুঝি দেখা দেয় ওর মুখে। ব্যর্থ উত্তেজনায় ও হতাশায় চোখে জল এসে যায় ওর। সে স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে বলে, 'কেমন করে বোঝাব তাহলে যে, আমি তা নই, সত্যিই আমি দায়ুদের সর্বনাশ চাই। কেমন করে বিশ্বাস করাব যে, আমার মালিকের মত মানুষের সঙ্গে যে ঘর করেছে, সে বেইমানী করতে পারে না। এটুকু কি আপনি লুদী মিয়ার সম্বন্ধে শোনেন নি? কী মহান্ মানুষ ছিলেন তিনি!...জনাব, জনাব—বুক চিরে যদি দেখাবার হ'ত তো দেখাতুম কী আগুন জ্বলছে আমার বুকে! দায়ুদের সর্বনাশ ছাড়া এ আগুন নিববে না কিছুতেই।'

'কিন্তু সত্যিই কি তুমি তাঁকে এত ভালবাসতে?...তিনি তো প্রৌঢ় ছিলেন, তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়!'

'জনাব, ভালবাসা কি হিসেবের পথ ধরে চলে? তিনি যুবা কি বৃদ্ধ, রূপবান কি কুৎসিত কোনদিন তো ভেবে দেখি নি। আমার কাছে তিনিই ছিলেন সব—খোদার চেয়েও বড়, নিজের জীবন-মরণ ইহকাল-পরকাল সব-কিছুর চেয়ে বড়। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবান তরুণকেও আমি তাঁর সঙ্গে বদল করতে রাজী ছিলুম না।'

'কিন্তু কেন? কেমন ক'রে তাঁকে এত ভালবাসলে তুমি? তাঁর কী এমন মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছ তোমার জীবনে?'

অকারণ ঔৎসুক্য মুনিম খাঁর কণ্ঠে।

হয়ত মনের কোণে এই হতভাগিনী নারীর আকৃতিতে কোথায় একটা ঈর্ষাও বোধ করছেন—তাই এই ঔৎসুক্য, এই কৌতূহল।

তাঁর আশি বছরের জীবনে বহু বাঁদীই রেখেছেন তিনি, তাদের কারও কারও সঙ্গে যে সদ্ব্যবহার করেন নি তাও তো নয়, তবু তারা কেউই তো এমন করে ভালবাসে নি তাঁকে।...তাদের সঙ্গে শুধুই স্বার্থের সম্পর্ক, দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ছিল।

নফিসা কিন্তু তখনই কোন জবাব দিতে পারল না।

জবাব দিতে গিয়ে বহু দিনের বহু কথা, বহু স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় ক'রে আসে, ব্যথার বন্যা জাগে মনে। সে বন্যা কণ্ঠ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। বাক্য-হত হয়ে বসে থাকে সে।

অবশেষে অনেক—অনেকক্ষণ পরে তার বাষ্প-গাঢ় কণ্ঠে স্বর ফোটে।

একটু একটু ক'রে বলে তার অন্তরে-লালিত সেই পরমাশ্চর্য কাহিনী।

তার কাছে অন্তত এর চেয়ে বড় কথা কিছু নেই। সব কথার চরম ও পরম কথা।

পাহাড়ী-মায়ের মেয়ে সে। তার বাবা নাকি কোন্ বড় তুরাণী ওমরাহ্। না—বাঁদী নয়, ক্রীতদাসী নয়—তার মা পাহাড়ের পথে সেই বীর তুরাণীকে দেখে স্বেচ্ছায় নিবেদন করে দিয়েছিল তার জীবনের সর্বোত্তম পুষ্প—তার কৌমার্য ও যৌবন।

সেই ঘটনার ফলস্বরূপ নফিসাকে পেয়ে ওর মা দুঃখিত হয় নি—লজ্জিতও হয় নি। কিন্তু মার কাছে বেশীদিন থাকতে পায় নি সে। ওর যখন দশ বছর বয়স তখনই মা মারা গেল। সেই সময় একদল ইরাণী বেদের হাতে পড়ে। তাতে ও দুঃখিত হয় নি—তখন মনে হয়েছিল—ওদের ঐ সকল সংস্কার—সকল বন্ধনহীন মুক্ত জীবনই সবচেয়ে শ্রেয়।

কিন্তু সে জীবন ওর অদৃষ্টে ছিল না। বেদেদের সঙ্গেই সুদূর হিমালয়ের সানুদেশ ছেড়ে চলে আসে সে বাংলার বন্দর সাতগাঁয়ে, সেখানে ঐ বেদের দলের সর্দার মোটা টাকার লোভে ওকে বেচে দেয় এক হাবসী দাস-ব্যবসায়ীর কাছে। বেদেদের কাছে থাকতে এবং তার আগে ওদের পাহাড়ে-মুলুকেও নানারকম খেলা আর নাচ শিখেছিল সে, তার ওপর দেখতেও নাকি সে ভাল—তাই তার মোটা দাম উঠল।

এর পর হাতবদল হতে হতে সে গিয়ে পড়ল আবার উত্তর-বাংলায়। কামতাপুরের হাটে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল পণ্যরূপে। তখনকার যে মালিক, সে নিতান্ত প্রয়োজনে প'ড়ে খুব কম টাকাতেই বিক্রি ক'রে দিল তাকে দুই আফগানের কাছে—তারা ভাগ ক'রে কিনেছিল তাকে।

কিন্তু কিনেছিল তারা—ব্যবসা করতে নয়, সম্ভোগ করতেও নয়—বিচিত্র এক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে।

নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে তাকে নানারকম

শারীরিক যন্ত্রণা দিচ্ছিল। অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে উদ্ভাবিত, বহু চিন্তার ফল সে-সব পৈশাচিক অত্যাচার। তাইতেই তাদের উল্লাস—ওর ঐ অসহ যন্ত্রণাই তাদের সম্ভোগ। আজও সে কথা মনে হলে মানুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না হয়ে যায়, এ জীব যে খোদার সৃষ্টি তা বিশ্বাস হতে চায় না।

কিন্তু না—লুদী মিয়াও তো এই মানুষের মাঝেই জন্মেছিলেন!···

সেদিন ওকে সেই লাঞ্ছনা থেকে, সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে—মৃত্যুর অধিক সেই দুঃসহ অপমান থেকে ওকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। অপমান আর লজ্জা—দৈহিক কষ্টের থেকে সেইটেই ওর বেশী হচ্ছিল।

না, ইচ্ছে করে কাঁদে নি সে—কিন্তু হাজার হোক মানুষের দেহ, সে অমানুষিক দৈহিক যন্ত্রণায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল তার, তাই আর্তনাদ বেরিয়েছিল গলা দিয়ে—বুক ফেটেই বেরিয়েছিল বোধ হয় সে চীৎকার। সেই শব্দ শুনেই দূরের পথ থেকে খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলেন লুদী মিয়া। সেই পথে ফিরছিলেন বেড়িয়ে—সঙ্গে না ছিল কোন লোক, না ছিল বিশেষ কোন অস্ত্রশস্ত্র। তবু একা সেই দুজন লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি, এবং সেই গ্লানিকর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল নফিসা।

বোধ করি তার মানসপটে সেদিনের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তার মালিকও উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্তিতে ফুটে উঠলেন সেই মুহূর্তে। আর সেই সঙ্গে উদ্বেলিত আবেগে ও অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

নিথর নিস্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিলেন মুনিম খাঁ। নফিসার মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে বিচিত্র তাঁর দৃষ্টি ; অদ্ভুত একটা আলো যেন জ্বলছে, সেই প্রায়-স্তিমিত দুটি চোখে।

এবার তিনি কথা বললেন। বললেন, 'কিন্তু এ তো মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য, নফিসা। এ এমন কিছু দেবদুর্লভ আচরণ নয়।'

খুবই কোমল শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। মুনিম খাঁর পক্ষে আশ্চর্য কোমল।

নফিসা জবাব দিলে। আবেগে ও উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার গলা, সেই স্খলিত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, মানুষের কাজই করেছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর অপর মানুষে যা করত—যা করলে কিছুমাত্র দোষ দিত না কেউ—তা তিনি করেন নি। ন্যায়ত ধর্মত তিনিই তখন আমার মালিক, অনায়াসেই আমাকে তিনি তাঁর বাঁদীরূপে ব্যবহার করতে পারতেন—

করলে আমি কৃতার্থ হয়েই যেতাম। কিন্তু তা তো তিনি করেন নি। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এসে আমাকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন, আমার আত্মীয়দের খোঁজ ক'রে আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়—আমি যখন সে স্বাধীনতা নিতে রাজী হলুম না, তখন তিনি আমাকে কোন ভাল পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবারও প্রস্তাব করেছিলেন। আমিই রাজী হই নি—তাঁকে ছেড়ে যেতে চাই নি। তাঁর দুটি পা-ই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে লোভনীয় আশ্রয়, বার বার এই কথা বলাতে তবে তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন সে-চেষ্টা থেকে।...তারপরও কয়েক মাস তাঁর কাছে কাছে ছিলাম, ছায়ার মতই থেকেছি তাঁর আশেপাশে, কিন্তু—। জনাব, আয়নায় মুখ দেখেছি, মুখ দেখেছি বহু লুব্ধ পুরুষের চোখে—দেখতে আমি যে সুশ্রী, আমি যে লোভনীয় এটুকু আমি জানি। এটা দুর্বিনয় নয়, নিছক সত্য—কিন্তু তবু মালিক আমার প্রতি কোনদিন এতটুকু লোভ প্রকাশ করেন নি; এতটুকু দুর্বলতা এতটুকু লালসা প্রকাশ পায় নি তাঁর আচরণে। তিনি স্নেহ এবং প্রশ্রয় দিয়েই গেছেন—পরিবর্তে চান নি কিছু।'

আবারও অন্তর্নিরুদ্ধ আবেগে বুজে এল তার কণ্ঠস্বর।

একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আমার সেই মালিককে খুন করেছে দায়ুদ কররাণী। মিথ্যাবাদী কাপুরুষ চরম বিশ্বাস-ঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে অসহায় জানোয়ারের মত খুঁচিয়ে মেরেছে তাঁকে। তিনি জানতেন, তিনি বুঝেছিলেন যে দায়ুদ তাঁর মৃত্যু চায়, তার চিঠি মিথ্যা ছল মাত্র—তবু মনিবের আদেশ ব'লেই জেনেশুনে সেই মৃত্যুর গুহায় পা দিয়েছিলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে মনিব-বংশের সেবা করে গেছেন। প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু ইমান দেন নি।'

'কী লিখেছিল দায়ুদ কররাণী ?'

'লিখেছিল যে সে তাঁর জামাইকে হত্যা করার জন্য অনুতপ্ত, কিন্তু লুদী মিয়া তো তার বাপেরই মত, সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেছেন চিরকাল—এ অপরাধও যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। এখন এই আসন্ন বিপদের সময় তিনি যদি না দেখেন তো আর কোন উপায় নেই। সে খুবই বিপন্ন, চারিদিকে সর্বনাশ তার। লুদী মিয়া যদি দয়া ক'রে একবার তখনই যান তো সে প্রথমত তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তার ঘোরতর পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে—দ্বিতীয়ত এই দারুণ বিপদের দিনে তাঁর বুদ্ধিতে ও শৌর্যে রক্ষা পেতে পারে।'

'তারপর ?'

তারপরও বিচিত্র ইতিহাস। নফিসা বলল একটু একটু ক'রে।

চরমযাত্রার আগে তাঁর বাঁদীর কথা ভোলেন নি মালিক, তিনি ওকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। কিন্তু নিজের সুখ, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় নি নফিসা। সেই দিনই তাঁর সামনেই সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, দায়ুদ কররাণীর সর্বনাশ না করা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবে না, নিরাপদ হবে না। মৃত্যু ? না, শুধু মৃত্যুতে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। নইলে বহুদিন আগেই সে দায়ুদের রক্তে মালিকের তর্পণ করতে পারত। সে চায় ওর চরম সর্বনাশ। পথের কুকুরের মত এক স্থান থেকে আর-এক স্থানে সে ঘুরে বেড়াবে—যে রাজ্যের লোভে এত বড় পাপ করল সেই রাজ্য একটু একটু ক'রে হারাবে, সর্বস্বান্ত হয়ে, ভাগ্যতাড়িত হয়ে বেঁচে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করবে—এই চায় নফিসা।

সেইজন্যেই আজ সে ওঁর কাছে এসেছে।

মুঘলবাহিনীর জয়লাভে ওর সেই প্রতিহিংসাই তৃপ্ত হবে। তাই ওর এই চেষ্টা—ওর এই সাধনা পথ খোঁজবার—এবং সে পথের সন্ধান খান-ই-খানানের কাছে পৌঁছে দেবার।

এই পর্যন্ত বলে নফিসা আবার নীরব হল। উত্তরের—আশ্বাসের আশায় উৎসুক ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

॥ ১৩ ॥

মুনিম খাঁ অভিভূতের মতই শুনছিলেন।

কিন্তু তবু তাঁর সমগ্র মন কি ছিল ঐ কাহিনীতে ?

দুটি চোখ মেলে ছিলেন তিনি নফিসার মুখের ওপর, কিন্তু দৃষ্টি কি ছিল সেইখানেই?

না। বর্তমান কাল এবং স্থান ছাড়িয়ে—এই তাঁবু, এই উপত্যকা, ঐ নদী-প্রান্তর পার হয়ে—বহু দূরে কোন শৈলসানুর গহন অরণ্য-পথে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাঁর মন—বহুদূর অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

এবার মনে পড়েছে তাঁর। সেই চোখ, সেই চিবুকের সুকুমার গঠন, গ্রীবার আশ্চর্য ভঙ্গীটি—সেই কোমল ভঙ্গুর দেহযষ্টি। অবিকল সে-ই।

প্রথমেই কেন এ মিলটা তাঁর চোখে পড়ে নি, তাই ভেবেই বিস্মিত হচ্ছেন মুনিম খাঁ।

কারণ সে-মেয়ে তো এত সহজে মন থেকে মুছে যাবার মত নয়। সে তাঁর দীর্ঘজীবনের অসংখ্য নর্মলীলায় অন্যতমা ক্রীড়াসঙ্গিনী নয়—বাঁদী বা ক্রীতদাসী তো নয়ই। তাকে পাওয়া তাঁর জীবনের একটা বিরাট লাভ—কোন বড় যুদ্ধজয়ের চেয়েও বড় বিজয়লাভ তাঁর।

সে কোন পুরস্কারের লোভে আসে নি তাঁর সেবা করতে, কোন ভবিষ্যতের আশা রেখে ধরা দেয় নি। কেউ জোর করেও ধরে আনে নি।

স্বেচ্ছায়, মুগ্ধ হয়ে, ভালবেসে সে তাঁর কাছে এসেছিল—প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধের কাছে। মেহেদী দিয়ে ছোপানো হলেও কেশ-শ্মশ্রুর শ্বেতাভা সেদিন চাপা ছিল না, বয়স গোপন করারও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি তিনি। অসংখ্য যুদ্ধ তার কিছু কিছু ব্রণচিহ্ন রেখে গিয়েছিল তাঁর দেহের সর্বত্র—মুখেও। অর্থাৎ যাকে রমণী-মনোহর বলে, তা আর তখন আদৌ ছিলেন না তিনি।

তবু সে এসেছিল। স্বেচ্ছায় তার জীবনের, তার প্রথম উন্মীলিত যৌবনের সব-কিছু তাঁর পায়ে সঁপে দিয়ে যেন ধন্য হ'তে, কৃতার্থ হ'তে।

সে-ও এক যুদ্ধযাত্রারই ইতিহাস।

একদল আফগানের উৎপাতে তরাইয়ের সরল বন্য আদিম অধিবাসীদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে খবর পেয়ে তিনি গিয়েছিলেন তাদের খোঁজে। গিয়ে দেখেছিলেন ওদের সরলতা ও সাংসারিক জ্ঞানহীনতার সুযোগ নিয়ে আফগানগুলো সেখানে এক মহা ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছে। এমন কোন অত্যাচার নেই যা তারা করে নি—শুধু তাদের শস্য ফল দুধ ঘি যে নির্বিচারে এবং নির্বিবেকে ভোগ করছে তাই নয়, তাদের দিয়ে ক্রীতদাসের মতই নিজেদের কাজ করিয়ে নিচ্ছে, নিজেদের সর্ববিধ আরাম ও ভোগ-বিলাসের আয়োজন করিয়ে নিচ্ছে। সম্ভোগ করছে তাদের নারীও। পাহাড়ীদের রাগ বা অনুরাগ কোনটাই কারুর চেয়ে কম নয়, তারাও যথেষ্ট হিংস্র, গভীর অরণ্যে তাদের সর্বদা বন্য-জন্তুদের সঙ্গে বাস করতে হয় ব'লে তাদের মত অস্ত্রশস্ত্রও তাদের ঢের আছে—কিন্তু বেচারীরা তার আগে কখনও কামান বন্দুক দেখে নি। এই আজব অস্ত্র বুঝি দেবতারাই দিয়েছেন ওদের, আকাশের বজ্র স্বয়ং দেবদূত ধরে এনে দিয়েছেন ওদের হাতে—এমনি একটা বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়েছিল ওরা। ভগবানের ইচ্ছাতেই ওদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে ভেবে বাঁধা পশুর মতই পড়ে মার খাচ্ছিল—এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল।

এই অত্যাচার দেখে আর এই করুণ কাহিনী শুনে মুনিম খাঁ জলে উঠেছিলেন—সাধারণত এইসব বন্য বর্বরদের জন্য শাহী সেনাপতিরা এত কষ্ট করেন না—কিন্তু তিনি করেছিলেন। অস্বাস্থ্যকর পাহাড়ী পথে, ঘন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে নিজে ঘুরেছিলেন সৈন্যদের সঙ্গে—সেই বদমাইশ আফগান-গুলোকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্য।

সে সময় ওখানকার আদিবাসীরা ওঁকে দৈব-প্রেরিতই মনে করেছিল। বলতে গেলে পূজা পেয়েছিলেন তিনি তাদের কাছ থেকে।

নৈনীও এসেছিল তাঁকে পূজা করতেই।

তার মত পূজা। একেবারে সর্বস্ব নিবেদন ক'রে, নিঃস্ব হয়ে পূজা করতে।

অবশ্য খুব বেশী লোভ আর ছিল না মুনিম খাঁর।

তিনি ওকে নিরস্ত করতেই চেয়েছিলেন। বুঝিয়েছিলেন অনেক—কিন্তু নৈনী তা শোনে নি।

তরুণী সুশ্রী নৈনী। স্নেহে প্রেমে আবেগে অপরূপা।

তার ওপর ছলছল-সজল চোখে সে সেদিন তাঁর কাছে ভিক্ষার্থিনী হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

ফেরাতে পারেন নি তাই। ফেরাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

দুনিয়ার এই নির্বান্ধব কোণে, সভ্যতার বাইরে এই সুদূর গহন অরণ্যে এমন অনাঘ্রাত আরণ্য-পুষ্পমাল্য যদি সেধে আসে তাঁর গলায় তো তিনি ফেরাবেনই বা কেন? কী এমন গরজ তাঁর?

তা ছাড়া সে তো তাঁকে কৃতার্থ করতে আসে নি, নিজেকে নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হ'তেই এসেছে।

সত্যিই ও-রকম সেবা, ও-রকম ভালবাসা জীবনে আর দেখেন নি মুনিম খাঁ। এমন আবেগ-থরথর ঐকান্তিক ভালবাসা কোন কিশোরী মেয়ে বাসতে পারে একজন প্রৌঢ়কে, প্রৌঢ়ই বা কেন—ষাটের সীমানায় যে পা দিয়েছে সে তো প্রৌঢ়ত্বও অতিক্রম করেছে—তা কোনদিন কল্পনাও করেন নি মুনিম খাঁ। এ কথা বিশ্বাসও করতেন না হয়ত কোনদিন—নিজের জীবনেই এ ঘটনা না ঘটলে।

অতি অল্পদিনই তাকে পেয়েছিলেন। ফেরবার সময় সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আসে নি। বলেছিল, লোকালয়ে সে থাকতে পারবে না। তা ছাড়া সে জংলী, বুনো—তাকে দেখে শহরের মেয়েরা হাসাহাসি করবে, ঠাট্টা করবে। মুনিম খাঁ বিব্রত বোধ করবেন। আরও বড় কথা—সেখানে সে হারিয়ে ফেলবে তাঁকে। নিজের মূল্য ভালই বোঝে নৈনী। বেশী লোভ তার নেই। যা পেয়েছে তাতেই সার্থক সে,—বাকী জীবনটা সে এই আশ্চর্য দিন এবং আশ্চর্য রাত্রিগুলির স্মৃতি নিয়েই বেশ কাটাতে পারবে।

সেদিন ওকে ছেড়ে আসতে হয়ত একটু ব্যথাই অনুভব করেছিলেন মুনিম খাঁ—কিন্তু জোর করেন নি। যুক্তিটা বুঝেছিলেন। এমন সর্বস্ব-হারানো ঐকান্তিক ভালবাসার মূল্য শহরে লোকালয়ে, সভ্যতার মধ্যে তিনি দিতে পারবেন না—আর এ ভালবাসা অবহেলাও সইবে না।

তার চেয়ে এই ভাল।

তাঁরও যে ক'টি দিন এই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতায় কাটল সেই ক'টিই স্মরণীয় হয়ে থাক্ জীবনে।

বাস্তবিক সে অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। তিনি প্রশ্ন করতেন নৈনীকে বার বার, 'তুমি কী দেখে এমন ভালবাসলে নৈনী, কী আছে আমার? বুড়ো হয়ে গেছি, চুল দাড়ি ভুরু পর্যন্ত পেকে গেছে, সর্বাঙ্গ অস্ত্রের দাগে কুৎসিত বিকৃত হয়ে উঠেছে—তোমার মত সুরূপা মেয়ে তো ইচ্ছে করলেই অনেক নওজোয়ান পেতে পারত!'

সে ওঁর মুখ চেপে ধরত তার পদ্মপল্লবের মত কোমল দুটি হাত দিয়ে।

তন্ময় হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলত, 'কী দেখে ভালবেসেছি তা তো জানি না। তুমি সুন্দর কি কুৎসিত, নওজোয়ান কি বুড়ো, কোনদিন তো ভেবে দেখি নি—তুমি বীর, তুমি সেনাপতি, তুমি এসেছ আমাদের দুঃখ দুর্দশা লাঞ্ছনায় কাতর হয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে আমাদের রক্ষা করতে—দেবদূতের মত, দেবতার মত, এ-ই আমি জানি। দেবতাদের দেখতে পাই নে—তোমাকে দেখছি, স্পর্শ করতে পাচ্ছি এই তো ঢের, এই তো পরম সৌভাগ্য। সূর্যকে দেখে কে না মোহিত হয়—কিন্তু সে-ও তো কম বুড়ো নয়। শুনেছি এ-দুনিয়াটা যত দিনের, সুরয-ভগবানও তত দিনের। হয়ত কিছু বেশীই বয়স হবে ওঁর। কিন্তু তবু আমাদের দেশে কুমারী মেয়েরা ঋতুস্নান ক'রে উঠে ওঁর দিকেই চায় সর্বপ্রথম, ওঁর মত তেজস্বী স্বামী হবে, সেই স্বামীর ঔরসে

তেজস্বী ছেলে হবে—সব মেয়েই তাই কামনা করে।···সুরযকে পাই নি—আমার অত লোভও নেই—কিন্তু তোমাকে তো হাতেই পেয়েছি, তোমার সেবা ক'রেই জীবনটা ধন্য ক'রে নিই।'

অনেক দিনের কথা হ'ল বইকি।

তখন মনে হয়েছিল কোনদিন যা ভুলবেন না, তা-ই একটু একটু ক'রে বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে গেছে। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ষড়যন্ত্র—বহু রাজকার্য, নিজের পদোন্নতির বহু প্রয়াস, ঘরে বাইরে নিরন্তর বহু শত্রুর সঙ্গে বিরোধ ও আত্মরক্ষার জন্য সদাসর্বদা সজাগ থাকার চিন্তার মধ্যে কবে কোথায় ডুবে তলিয়ে গেছে সেই একমুঠো ফুলের মত এতটুকু একটা বুনো পাহাড়ী মেয়ে!

আরও বহু স্ত্রীলোকও তো এসেছে জীবনে।

স্ত্রী, বাঁদী, নর্তকী—বিলাস-সঙ্গিনী।

তাই খুব গরজও ছিল না হয়ত সেই ক'টা দিনের অভিজ্ঞতা মনে ক'রে রাখবার। মাঝে মাঝে কোন কোন কর্মহীন দিনের বিস্মৃত প্রদোষে এক-আধবার হয়ত মনে পড়েছে—ভাববার চেষ্টা করেছেন যে নৈনী এখন কী করছে, আর-কাউকে বিয়ে-থা করে ঘরকন্না পেতেছে কিনা—কিন্তু তেমন অবসরই তো তাঁর জীবনে দুর্লভ।

আজ এই মেয়েটিকে দেখে পর্যন্ত তাই তাঁর স্মৃতিসমুদ্রে একটা আলোড়ন উঠেছিল, সেই প্রথম মুহূর্ত থেকেই একটা চিন্তা বার বার তাঁকে উন্মনা অন্য-মনস্ক ক'রে দিচ্ছিল যে—এর এই চেহারা, এর গঠন, এর অঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গী একেবারে অপরিচিত নয় তাঁর—কোথায় একটা পরিচয়, একটা যোগাযোগ আছে তাঁর সঙ্গে। কেবলই ভেবেছেন আর স্মৃতির দুয়ারে মাথা কুটেছেন। এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে যোগাযোগটা একেবারে সুদূরও নয়—কারণ স্মৃতির আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্তে একটা আবেগেরও আলোড়ন উঠেছিল, যা মোটেই তাঁর পক্ষে সহজ বা স্বাভাবিক নয়।···নৈনীকে যদি এমন ক'রে ভুলে ব'সে না থাকতেন তো, এত দেরি হ'ত না তাঁর যোগাযোগটা খুঁজে বার করতে।···

সহসা মুনিম খাঁ সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন, আশ্চর্য কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'বেটী, তোমার মায়ের নাম কী ছিল বলতে পার?'

'পারি বইকি। মাকে সবাই নৈনী বলে ডাকত।'

চোখ বুজলেন মুনিম খাঁ।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন তিনি।

'মাফ কর নৈনী, মাফ কর। তোমাকে এমন ভাবে ভোলা আমার উচিত হয় নি—এমন ভাবে ভুলে থাকা। অন্তত তোমার সন্তানের দায়িত্ব আমার নেওয়া উচিত ছিল।'

আসলে তিনি ও-কথাটা চিন্তাই করেন নি। নৈনীও তাঁকে ঘুণাক্ষরে জানায় নি যে সে সন্তানসম্ভবা। হয়ত তিনি আরও বেশী ব্যস্ত হতেন, হয়ত সন্তানের জন্যই তাকে জোর ক'রে টেনে আনতেন—এই কারণেই জানায় নি নৈনী।

কিন্তু তাঁর খবর নেওয়া উচিত ছিল, এ সম্ভাবনার কথাটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল!...

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন মুনিম খাঁ।

তখনও আশায় ও আশাভঙ্গের আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে নফিসা।

মুনিম খাঁ উঠে দাঁড়ালেন, কাছে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে সস্নেহে ওর মাথায় একটা হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম বেটী। আমার যথাসাধ্য তোমাকে আমি সাহায্য করব। সমস্ত মুঘলবাহিনীই তোমার এই প্রতিহিংসা-যজ্ঞে সহায়তা করবে।...কাল ভোরেই আমি লোক দেব—সে লোক তোমার সঙ্গে গিয়ে পথ দেখে আসবে—কাল রাত্রেই আমরা সেই পথ ধ'রে গিয়ে ঘিরে ধরব দায়ুদ কররাণীকে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এবার আর তার পরিত্রাণ নেই।'

কৃতজ্ঞতায় ছলছল ক'রে উঠল নফিসার চোখ।

সে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'আপনার এ অনুগ্রহ কখনও ভুলব না, জনাব।'

মুনিম খাঁ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। বোধ হয় যে-প্রস্তাবটা মনের মধ্যে এসেছিল তা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, অথবা প্রকাশের ভাষা খুঁজছিলেন মনে মনে। বললেন, 'একটা কথা বলব বেটী?'

'বলুন জনাব—আপনি আমাকে বেটী ব'লে সম্বোধন করেছেন—আজ থেকে আপনি আমার বাবারই মত। বাবাকে তো কখনও দেখি নি, সে ক্ষোভ ছিল, আজ থেকে সেটাও মিটল।...আমার কাছে আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।'

'বলছিলাম কী, তোমার যা ব্রত তা আমাদের দ্বারাই সফল হবে।... মিছিমিছি তোমার আর পথে পথে এমন ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কী? তোমাকে বেটী বলেছি যখন, তা ছাড়া তুমি হিন্দুস্থানের সবচেয়ে সাচ্চা আদমী লুদী মিয়ার অন্তঃপুরিকা—তোমার এমন ভাবে বেড়ানোও ঠিক নয়। তার চেয়ে তুমি আমার কাছেই থাক না? আমার মেয়ের মতই থাকবে। কেউ এতটুকু অসম্মান করতে কোনদিন সাহস করবে না।' কথাগুলো ব'লে কেমন একরকম ছেলেমানুষের মতই উৎসুক ভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

জবাব দিতে দেরি হ'ল নফিসার।

বোধ হয় বহুদিনের-শুকিয়ে-যাওয়া রুক্ষ মরু-অন্তরে এতখানি স্নেহের বর্ষণ পেয়ে যে সহস্রশিখা বাষ্প জেগেছে—সেই বাষ্পই তার কণ্ঠ ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইল সে। প্রায় চুপি-চুপি বলল, 'আপনার এ অকারণ স্নেহ আপনারই যোগ্য। কিন্তু চিরকালের বন্য প্রকৃতি আমার—হারেমের নিষ্ক্রিয় জীবনে বেশীদিন বদ্ধ থাকতে পারবে না।...যদি দয়া করেন তো এইটুকুই ব্যবস্থা ক'রে দিন—যাতে আমি ইচ্ছামত মধ্যে মধ্যে আপনার কাছে আসতে পারি—বিপদে পড়লে বা পরিশ্রান্ত হ'লে, আপনার এই নিরাপদ আশ্রয়ে দু'দিন এসে বিশ্রাম করে যেতে পারি। তাহলেই আমাকে আশার অতীত অনুগ্রহ করা হবে জনাব।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুনিম খাঁ বললেন, 'তাই হবে, বেটী। আমার নিশানী দেওয়া থাকবে তোমার কাছে—যখনই প্রয়োজন হবে এস—কেউ বাধা দেবে না। তবে এইটুকু অনুরোধ—প্রয়োজন পড়লেই চলে এস, এতটুকু দ্বিধা কি সঙ্কোচ কোর না। তুমি আমার মেয়ে—এটা কেবল কথার কথা নয়, মনে প্রাণে বিশ্বাস কোর।'

শেষের দিকে কেমন যেন ধরা-ধরা শোনায় মুনিম খাঁর গলাটা। একটু থেমে আবার বলেন, 'আজ তাহলে এইখানেই বিশ্রাম কর, বেটী। কাল ভোরেই উঠতে হবে।...আমার এই তাঁবুর পেছনেই জানানা-তাঁবু আছে—সেখানে নিয়ে যাক তোমাকে। দরকার হয় তো স্নানের জলও পাবে। খানাও তৈরী। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

তিনি ওর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ডাকলেন, 'আনওয়ার খাঁ!'

আনওয়ার খাঁ এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়াল।

নফিসাকে সেও চিনতে পেরেছে। সে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তারই এই সগৌরব প্রত্যাবর্তনে রীতিমত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছে সে। একটু বিদ্বেষও অনুভব করছে এই জাদুকরী বেদেনীটার ওপর। (বখ্‌ৎ খাঁর কাছে সবই শুনেছে সে।)। সে নফিসাকে সম্পূর্ণ অবহেলা দেখাতেই যেন একটু এগিয়ে এসে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

মুনিম খাঁ অতটা লক্ষ্য করেন নি, আনওয়ারের মুখের ভ্রূকুটিও না।

তিনি সহজ কণ্ঠেই বললেন, 'আনওয়ার, এঁকে সঙ্গে ক'রে জানানা-তাঁবুতে নিয়ে যাও। স্নানের জল দেবে, পোশাক কিছু দরকার থাকলে ব্যবস্থা ক'রে দেবে। খানা ও বিছানার ব্যবস্থাও ক'রে দেবে। এঁর কোনরকম অসম্মান বা অসুবিধা না হয়। ইনি আমার মেয়ের মত—আমার মেয়ে থাকলে তাঁকে যেমন সম্মান করত সকলে, সেই রকমই যেন করে—বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও সকলকে।...তুমিও সকাল ক'রে বিশ্রাম করতে যাও, কাল খুব ভোরে সূর্য-অভ্যুদয়ে এঁর সঙ্গে তুমি যাবে—ইনি তোমাকে একটা রাস্তা চিনিয়ে দেবেন। বুঝেছ? সব কথা ঠিক-ঠিক ইয়াদ রেখো।'

আনওয়ার খাঁ মনে মনে, তার যত পীরের নাম শোনা ছিল, সকলকেই স্মরণ করার চেষ্টা করল।

এ মেয়ে নিশ্চয়ই জাদু জানে। হিন্দুস্থানের কালা জাদু।

হয়ত বা ডাইনীই হবে। আনওয়ার শুনেছে ওরা হামেশাই সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে মাথা খেতে আসে লোকের। পুবে কামরূপ না কী একটা মুলুক আছে, সেখানকার মেয়েরা নাকি চোখের চাহনিতেই পুরুষমানুষকে ভেড়া ক'রে ফেলে।

এ মেয়ে নিশ্চয়ই সেখানকার কোন মায়া-জানা ডাইনী।

নইলে তার এতদিনের এত পোড়-খাওয়া এমন জবরদস্ত্ মনিবকে এক-লহমায় এইরকম ভেড়া করে ফেলতে পারে!

খোদা তাকে রক্ষা করুন।

ভালয়-ভালয় যদি আবার কোনদিন দিল্লীতে ফিরতে পারে—বড় পীর-সাহেবের দরগায় সিন্নি চড়াবে।

॥ ১৪ ॥

দায়ুদ কররাণী আবারও পালালেন। বিনাযুদ্ধেই পালালেন।

মুঘলবাহিনী অতর্কিতে এসে পড়েছিল সত্য কথা। এভাবে এ-পথে এমন ক'রে দুশমন এসে পড়তে পারে তা আফগানরা কখনও ভাবে নি। বস্তুত, এদিকে যে একটা পথ আছে তাও তারা জানত না।

কিন্তু তাহলেও—এমনভাবে পালাবার মতো ভয়াবহ ঘটনা সেটা নয়।

যুদ্ধ তো হয়ই নি—মুঘলরা আক্রমণও করে নি। শুধু এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র, হয়ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। যা এসেছে তা ছাড়াও পিছনে আরও কিছু লোক আসছে, এটাও বোঝা গিয়েছিল।

কিন্তু তাতেই কি এত ভয় পেয়েছিলেন দায়ুদ ও তাঁর সেনাপতিরা?

এমন কিছু ভয় পাবার কারণও কি ছিল?

যারা যুদ্ধ করে—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, তাদের কাছে তো এটা অতি সম্ভাব্য ঘটনা।

তা ছাড়া এরা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ত ছিল, কিন্তু অসহায় ছিল না একেবারেই।

গভীর পরিখা কাটা চারিদিকে, তার সামনে সামনে সেই মাটিই উঁচু ক'রে ক'রে প্রাচীরের মতো করা; অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থা। যুদ্ধের উপকরণও সামান্য নয়, সুশিক্ষিত বিপুল হস্তিবাহিনী, নূতন কামান, গোলা-বারুদের ভাণ্ডার পূর্ণ। লড়াই বাধলে কোন্ পক্ষ শেষ পর্যন্ত হারত তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। মুঘলদেরও ভয়ের কারণ কম ছিল না।

তবু লড়াই করলেন না দায়ুদ কররাণী। ভয়ে বিহ্বল হয়ে পালাবার, পিছু হঠবারই হুকুম দিলেন। বিরক্তিতে ক্ষোভে অসহায় ব্যর্থ রোষে সেনানায়কদের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল—নিজেদের ঠোঁট নিজেরাই কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে ফেললেন—তবু কিছুতেই তাঁরা দায়ুদকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাতে রাজী করাতে পারলেন না।

কারণ?

সেনাপতিদের জানবার কথা নয় সে কারণ।

দায়ুদের এ আচরণের কারণ দায়ুদই জানেন শুধু।

দায়ুদ সেদিন সেই মুহূর্তে শুধু মুঘলবাহিনীই দেখেন নি। তা ছাড়াও কিছু দেখেছিলেন।

দেখেছিলেন একটা আগুন।

মুঘলবাহিনীর পিছনে—দূর দিগন্তে আকাশের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত আচ্ছন্ন ক'রে একটা আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার লোলুপ লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে।

তখনও সেটা খুব ভোর। ফরসা হয় নি ভাল ক'রে চারিদিক। রাত্রির স্মৃতি তখনও গাছপালায় পাহাড়ে অরণ্যে নিবিড় হয়ে লেগে আছে। প্রত্যূষের সেই প্রায়ান্ধকার আকাশে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল অনল-শিখার প্রজ্বলন্ত রক্তাভ রূপ।

শেষরাত্রে শত্রুসৈন্যের আকস্মিক আগমন-বার্তায় ঘুম ভেঙে বিস্মিত বিহ্বল হয়ে ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে প্রথমেই তাঁর চোখে পড়েছিল ব্যূহমান মুঘলবাহিনী নয়—তার বহু পিছনে সেই অগ্নিশিখা।

ঘুমের ঘোর তাই—হয়ত বা দুর্মতিরও অন্ধতা—নইলে দায়ুদ সেই বহ্নিকাণ্ডকে অত বড় ক'রে দেখতেন না। নইলে, দৃষ্টি সহজ থাকলে, বুঝতেন এমন কিছু বড় একটা আগুন জ্বলে নি কোথাও, বনের মধ্যে কোন চাষী বা মজুর শুকনো পাতা জড়ো ক'রে তাতে আগুন লাগিয়েছে হয়ত, বনপথ পরিষ্কার করার জন্যই।

কিন্তু অত খুঁটিয়ে দেখার মত অবস্থা তখন দায়ুদের নয়।

সামনে শত্রুসৈন্য—তার পিছনে আকাশের পৃষ্ঠপটে এই বিচিত্র বহ্নিলিপি। এইটুকুই তো যথেষ্ট।

অমোঘ, নিষ্ঠুর সে-লিপির ভাষা, শুধু দায়ুদই পড়তে পেরেছিলেন তা।

যেমন পেরেছিলেন আর একদিন রাত্রে, পাটনায়—যখন ওপারে হাজিপুর কিলায় আগুন লেগেছিল—তখন।

সেদিন ভয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন তিনি—দিগ্বিদিকৃজ্ঞানশূন্য হয়েই পালিয়েছিলেন, সব কিছু ছেড়ে। নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই ভয় পেয়েছিলেন।

সে বিহ্বলতা, সে ছেলেমানুষির দণ্ডও দিয়েছেন ঢের। বহু মূল্যবান জিনিস তিনি হারিয়েছেন সেই রাত্রে, বহু মূল্যবান প্রাণ। যা গেছে তা আর কোনদিন ফিরবে না—অনেক সঞ্চয়, জীবন-যাত্রা-পথের অনেক পাথেয়। পাথেয় আর সাথী। বিশ্বস্ত সেবক-সেবিকা।

না, বড়ই ভুল করেছিলেন সেদিন, বড় ভুল করেছিলেন। সে ভুলের দণ্ড হয়ত বাকী জীবনভোর বইতে হবে।

আজ তাই আর অত বিহ্বলতা প্রকাশ করলেন না দায়ুদ কররাণী। শুধু পিছু হঠবার হুকুম দিলেন। সপ্তগ্রাম হয়ে সিংভূমের পথে সুবর্ণরেখা ডিঙিয়ে তিনি উড়িষ্যা চলে যাবেন। সম্ভবত অত দূরে গিয়ে মুঘলরা তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে চাইবে না। অত জঙ্গলে যাওয়ার উদ্যম বা ইচ্ছা তাদের থাকবে না। কিছুকাল অন্তত নিরাপদে থাকতে পারবেন তিনি।

গুজর খাঁ কতলু খাঁর দল অনেক বোঝাল তাঁকে। এখনও কিছুই হয় নি—লড়াই একটা হোক। বরং দায়ুদ তাঁর হারেম এখনই পাঠিয়ে দিন কোনও নিরাপদ স্থানে। না হয় উড়িষ্যাতেই পাঠান। কিন্তু এমনভাবে বিনাযুদ্ধে ওদের কাছে হার মানলে আফগান শক্তি আর কোনদিন মাথা তুলতে পারবে না। বিহার তো গেছেই, গৌড়বাংলাও যাবে চিরদিনের মত।…অথচ যদি দৈবাৎ কোনরকমে এ লড়াইয়ে জিতে যান দায়ুদ তো সসম্মানে একটা সন্ধি করতে পারবেন—অন্তত গৌড়বাংলা তাঁদের থাকবে।

কিন্তু দায়ুদ শুধুই ঘাড় নাড়েন।

পাংশু বিবর্ণ উদ্বিগ্ন তাঁর মুখ। কেমন একটু অন্যমনস্কও।

এতটা ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী নন আর।

তাঁর সেই একই নির্দেশ।

পালাও। পিছু হঠ। খুব চুপি-চুপি কাজ হাসিল কর—দুশমন না জানতে পারে।

অগত্যা পিছুই হঠতে হল। যে প্রধান, যে নায়ক সে যদি পিছু হঠে তো অনুগামীরা আগে যেতে পারে না।

পড়ে রইল পরিখা, পড়ে রইল তাঁবু। খুচরো বহু জিনিসই পড়ে রইল। মায় হাতী-ঘোড়াও কিছু কিছু ফেলে যেতে হল। হাতিয়ারগুলোও সব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না। এবারও বহু জিনিস দুশমনের হাতে গিয়ে পড়বে।

পিছু হঠবার হুকুম দিলেই সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়—আতঙ্কের কারণ না থাকলেও তারা খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়। ফলে সময় থাকলেও সব গুছিয়ে নিতে পারে না তারা—মানের চেয়ে 'জান্'টা বড় হয়ে ওঠে, কোনমতে প্রাণটা নিয়ে পালাবার জন্য উৎসুক উন্মুখ হয় তখন।

অত তাড়া কিন্তু সত্যিই ছিল না—কারণ মুনিম খাঁ তাদের আক্রমণ করেন নি।

নফিসা তাঁকে নিষেধ করেছিল। কেন করেছিল তা কিছু খুলে বলে নি। শুধু বলেছিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মুঘলরা এদিক দিয়ে গিয়ে পড়লেই ওরা পালাতে শুরু করবে, মিছিমিছি আপনি লড়াই করবেন কেন? অনর্থক কতকগুলো প্রাণ আর রসদ গুলি গোলা নষ্ট।'

তাকে বিশ্বাস করেছিলেন মুনিম খাঁ।

এই বিচিত্র মেয়েটা তাঁকে ক্রমশই অভিভূত ক'রে ফেলছে। ওর অদ্ভুত শক্তি—আশ্চর্য উত্তম আর কর্মদক্ষতা। এই দু'দিনেই ওর যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে বুঝেছেন, নিজেই একটা যুদ্ধ-পরিচালনার ক্ষমতা রাখে ও।

ওর কথার ওপর তাই তিনি পুরোপুরি ভরসা করেছিলেন। অধস্তন সেনাপতিরা বিস্মিত হয়েছিল তাঁর এই আচরণে। সুবর্ণ-সুযোগ চলে যাচ্ছে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিহ্বল অবস্থা থাকতে থাকতে ওদের ওপর হাম্‌লা করা দরকার। নইলে—ওদের যদি তৈরী হবারই সময় দেবেন তো এত কাণ্ড করার কী প্রয়োজন ছিল? ওরা শত্রু হিসেবে আদৌ সামান্য নয়—যদি তৈরী হয়ে নিতে পারে তাহলে কি খুব সহজ হবে ওদের হারানো?

কিন্তু মুনিম খাঁ ওদের কথায় কান দেন নি। হাতীর ওপর বসে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে একচোখে একটা দূরবীন লাগিয়ে ওদিকে চেয়েছিলেন স্থির হয়ে। এ সময় নফিসাকে কাছে পেলে ভাল হ'ত, কিন্তু নফিসা কাল রাত্রে তাঁদের যাত্রা শুরু হতেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার পাত্তা পান নি। মুনিম খাঁর মনটা ক্ষণে-ক্ষণেই এই যুদ্ধক্ষেত্র, এই আসন্ন বিপদ এবং রাজনীতির জটিলতা ছেড়ে, ভবিষ্যৎ কর্তব্যের বিরক্তিকর সমস্যা ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেই মেয়েটির কাছে। অনেক দুঃখ পেয়েছে বেচারী, অনেক লাঞ্ছনা। এখন যদি তাঁর কাছে থাকতে রাজী হ'ত! অন্তত তাঁর জীবনের বাকী ক'টা দিন!

সেই ক'দিনের মধ্যে তার ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারতেন।

অদ্ভুত মেয়ে! তাঁর ঔরসজাতা বলেই শুধু নয়—ওর সমগ্র পরিচয়টাই বিচিত্র!

এ মেয়েকে কাছে পাওয়া—এর সেবা, সাহচর্য, পরামর্শ পাওয়া সৌভাগ্যেরই কথা।

কোথায় যে গেল মেয়েটা! কে জানে, আর কোনও দিন তাঁর কাছে ফিরে আসবে কিনা!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই মুনিম খাঁ আবারও দূরবীনটা তুলে নেন চোখে।

সুদূর অতীত এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে মনটাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন সমস্যা-জটিল বর্তমানেই।

না, মেয়েটা ঠিকই বলেছিল। খান-ই-খানানের অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত চোখ ওদের স-সন্তর্পণ পশ্চাদ্‌গতি টের পায় ঠিকই। পিছুই হঠছে ওরা, প্রাণপণে চলে যাওয়ার চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তাজ্জব, ভারি তাজ্জব!

এত আয়োজন, এত তোড়জোড়—লড়াইয়ের এত 'সামান', এত জঙ্গী ফৌজ থাকতে একবার চেষ্টাও করলে না! অথচ এরা কাপুরুষ নয়। সে প্রমাণ বহুবারই পেয়েছেন মুনিম খাঁ।

নিতান্তই ভাগ্য। ভাগ্যই ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে ওদের মন্দভাগ্যই ওদের সবচেয়ে বড় দুশমন। মুঘলরা নিমিত্ত মাত্র।

মুনিম খাঁ হাতীর পিঠে স্থির ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন প্রায় সারাদিনই।

॥ ১৫ ॥

অন্তঃপুরিকারা নিরাপদে চলে গেছেন। তোশাখানাও বিশ্বাসী ইউসুফজাই সেনাদের পাহারায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাজানা ও খাজাঞ্চীখানা নিয়ে গেছে উজবেগী দেহরক্ষীরা। তোপখানাও চলতে শুরু হয়েছে এবার। দায়ুদ কররাণী অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন। বাকী আছে শুধু সাধারণ সিপাহীরা—তা তারা ঠিকই যাবে, তাদের জন্য অতটা উদ্বেগ নেই।

কিন্তু গতবারের মত—অর্থাৎ পাটনার মত—দায়ুদ নিজে সর্বাগ্রে যাবার চেষ্টা করেন নি এবার। কে জানে কেন, তিনি এখনও পর্যন্ত এখানেই থেকে গেছেন। যুদ্ধসীমার বাইরে, নিরাপদ পথের ধারে তিনি কয়েকজন মাত্র তাঁর দেহরক্ষীকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কেন করছিলেন তা কেউ জানে না, হয়ত তিনি নিজেও না। দেহরক্ষীরা ভাবছিল—তোশাখানা ও খাজাঞ্চীখানা নিরাপদে না সরানো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না বলেই সুলতান অপেক্ষা করছেন। যদিও এগুলো পাঠানোর কোন কাজেই তিনি লাগছেন না—তার জন্য যোগ্যতর কর্মচারীরাই আছে—তিনি শুধুই ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে শূন্য দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে প্রভাত মধ্যাহ্নে এবং মধ্যাহ্নও একসময় অপরাহ্ণে চলে পড়ল। দেহরক্ষীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সারাদিনই তাদের এইভাবে কেটেছে—ঘোড়ার পিঠের ওপরই বলতে গেলে। মধ্যে মধ্যে দু-একজন ক'রে নেমে একটু-আধটু পায়চারি ক'রে নিয়েছে বটে, মধ্যে খাবারও খেয়ে নিয়েছে এমনি ভাবেই—তবু সারাদিনের এই কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন প্রতীক্ষা তাদের অসহ্য লাগছে। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে একভাবে বসে থেকে থেকে। তা ছাড়া একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, চারিদিকে জঙ্গল—এখন একটা কোথাও নিরাপদ আশ্রয় খোঁজ না করলে সারারাত সশস্ত্র ও সশঙ্ক কাটাতে হবে হুঁশিয়ার হয়ে। রাত্রে রওনা দেবার মত পথ এসব নয়।

সবচেয়ে কষ্টকর অবস্থায় পড়েছেন শ্রীহরি গুহ। তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নন—নেহাতই কেরানী। হিসেবের খাতা সামনে পেলেই তাঁর প্রতিভা খোলে ভাল। তলোয়ার একটা কোমরে গোঁজা আছে বটে, কিন্তু কার্যকালে তা চালাতে পারবেন না—সে-কথা তিনিই ভাল জানেন। তিনি যা চালাতে পারেন তা কলম, ঐ বস্তুটি হাতে পেলে একলহমায় ভেল্‌কি দেখিয়ে দিতে পারেন। তাঁকে যে মিছিমিছি সুলতান কেন আটকে রাখলেন তা এখনও বুঝতে পারছেন না। ঘোড়ার পিঠ থেকে অবশ্য অনেকক্ষণই নেমে পড়েছেন—তবু বসে বসে তাঁর মাজা টন্‌টন্ করছে। খাজাঞ্চীখানার সঙ্গে গেলে শুধু যে গাড়িতে চেপে যেতে পারতেন তাই নয়—এতক্ষণ বহুদূর কোন স্থানে পৌঁছে আরাম করতে পারতেন। ঘোড়া ও বলদের জন্যও অন্তত—এতক্ষণে কোন নিরাপদ আশ্রয় খোঁজ করতে হ'ত, একটু বিশ্রামের আশা ছিল। কিন্তু এ তো—যা তাঁর এই অর্বাচীন মনিবের কাণ্ড দেখা যাচ্ছে—সারারাত হয়ত এইভাবেই কাটাতে হবে। ওঁর তো মাতালের কাণ্ড, ঘোড়ার পিঠেই খুব সম্ভব মদের কুপি বাঁধা আছে, এর পর কেউ ঢেলে দেবে আর উনি খেতে শুরু করবেন। আর ও-বস্তু পেটে পড়লে লোকে পৃথিবীর সব কিছুই ভুলে যায়, তা সামান্য মাজার ব্যথা! কিন্তু শ্রীহরির ওসব বিশেষ অভ্যাস নেই—খেলেও একটু-আধটু কখনও-সখনও দৈবাৎ খেয়েছেন—আর খেলেই বা এই মাঠের মধ্যে তাঁকে দিচ্ছে কে? তিনি এই মাজা-টন্‌টনানি নিয়ে করেন কী? উঃ, কী যে দুর্মতি হল সুলতানের—খাজাঞ্চীর স্থান খাজাঞ্চীখানায়, এটা কিছুতেই মাথায় গেল না!

অথচ দায়ুদ আজ যেন বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরেছেন শ্রীহরিকে।

তাঁর আর সমস্ত পারিষদদের মত শ্রীহরি কখনও মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলেন না—বড় বড় ভরসাও দেন না। বরং ভয়ই দেখান। দায়ুদের যে পতন শুরু হয়েছে তা তিনি বোঝেন একমাত্র শ্রীহরির মুখের দিকে চেয়েই। শ্রীহরি কিছুদিন থেকেই ছুটি চাইছেন। তিনি বলেন, মুঘলরা সমস্ত বাংলাদেশটাই নেবে, আকবর বাদশার জন্মলগ্নে নাকি একাদশে বৃহস্পতি আছেন। সে বস্তুটা কী তা দায়ুদ জানেন না—তবে এটা বোঝেন যে, সে একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের লক্ষণ। পাঠানশক্তি থাকবে না—তাই সময় থাকতেই তিনি সরে পড়তে চান। তা বলে তিনি এখনই ছুটে গিয়ে মুঘলদের পায়ে পড়তেও চান না। আসলে তিনি বিশ্রাম চান। তাঁর বয়সও হল ঢের। শূরবংশের আমল থেকে চাকরি করছেন, স্থলেমান কররাণীকে রাজস্বের হিসাব নিয়ে যে কোনদিন মাথা ঘামাতে হয় নি—সেও তাঁরই দৌলতে। স্থতরাং আর কেন? ঢের দিন চাকরি করেছেন—এবার একটু বিশ্রামও দরকার। আর সে স্থানও তিনি ঠিক করেছেন। পাখিরা দুপুর থাকতে-থাকতেই সন্ধ্যার নীড় রচনা ক'রে রাখে, তিনিও সেই পক্ষিধর্মই গ্রহণ করেছেন। বাংলার একেবারে দক্ষিণে, বলতে গেলে সমুদ্রের কাছাকাছি, অসংখ্য নদীপরিবেষ্টিত খানিকটা জমি দেখে রেখেছেন। পরগনা ধুমঘাট। সেখানে অনেক দিন আগে থেকেই প্রজা বসতি ক'রে লোক রেখে বেশ একটু জমিদারি পত্তন করেছেন। তাঁর ভাই বসন্ত সেটা দেখাশুনো করে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বহুদিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, দায়ুদ সিংহাসনে বসার পরই। যেন এই ভবিষ্যৎ সেদিন তিনি নখদর্পণে দেখতে পেয়েছিলেন।...অতদূরে গিয়ে জনপদ পত্তন করার কারণও খুব স্পষ্ট। প্রথমত অত নদী চারদিকে, মুঘলদের পক্ষে যাওয়া সহজ নয়, তা ছাড়া ওসব নোনা দেশ, এমনিই তারা যেতে চাইবে না। শরীর টিকবে না।

শ্রীহরির এই স্পষ্ট ও সত্য-ভাষণের জন্যই দায়ুদ ওঁকে পছন্দ করেন। কেমন ক'রে তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর চারিদিকের অসংখ্য মিথ্যাচারীর মধ্যে শ্রীহরিই সাচ্চা লোক। তিনি যে টাকা-পয়সা উপরি রোজগার করেন—তাও গোপন করেন না। শ্রীহরি বলেন, 'জাহাঁপনা তো জেনেশুনেই আমাকে ত্রিশ তঙ্কা বেতন দিচ্ছেন। এতে যে আমার চলা সম্ভব নয় তা কি জানেন না আপনি?'

আজকাল দায়ুদ তাই এমন ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন শ্রীহরিকে, লুদী মিয়া চলে যাবার পর তাঁর শুভ বা কল্যাণ চিন্তা করার লোক আর-কেউ নেই, অন্তত স্পষ্ট কথা ও সত্য কথা বলার মত একটা লোক কাছে থাক্।

ফলে শ্রীহরির হয়েছে প্রাণান্ত।

তিনি না পারছেন পালাতে, না পাচ্ছেন ছুটি।

সত্যি-সত্যিই কিছু মনিবকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যায় না—নিজে থেকে ছুটি না দিলে। ওঁদের বংশের অনেক নিমক খেয়েছেন তিনি। তিনি বুদ্ধিমান—কিন্তু নিমকহারাম নন।...

অবশেষে একসময় তিনিই কথাটা পাড়লেন।

গলা-খাঁকারি দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'জাহাঁপনা কি রাতটা তাহলে এখানেই কাটাতে চান?'

'রাত?' কতকটা বিহ্বল নেত্রে চান দায়ুদ শ্রীহরির মুখের দিকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত্রের কথাই বলছি। রাতটাও কি এই ভাবে কাটাবেন?'

'কেন বল তো?'

'তাহলে তার একটু আয়োজন আছে। এখনও খুব বেশী অন্ধকার হয় নি, এখনও চোখ চলছে। চেষ্টা করলে কিছু শুকনো কাঠ-কুটো জোগাড় করা যাবে।...চকমকি পাথরও একটা গাঁ থেকে জোগাড় করতে হবে। এদের কাছে তো ওসব নেই শুনছি। আগুন তো একটু করা দরকার।'

'আগুন!' চমকে ওঠেন দায়ুদ কররাণী। তাঁর গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরোয় একটা। যেন আর্তনাদই করে ওঠেন।

'আগুন কী হবে?'

'বাঘ তাড়াতে হবে, জনাব। একটু আগুনের ব্যবস্থা রাখা দরকার।'

'বাঘ?'

'হ্যাঁ। বাঘ—এদিকের শের মুঘলের চেয়ে কম ভয়ানক নয়, জাহাঁপনা। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে শেষে কি বাঘের হাতে প্রাণ দেব?'

এইবার যেন একটু একটু ক'রে দায়ুদের মাথায় কথাটা গেল। এতক্ষণ সমস্ত সময়টাই অন্যমনস্ক ছিলেন—এবার মনটা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বর্তমান পরিবেশে।

ইস্, সত্যিই দিন আর নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

অস্নাত অভুক্ত রক্ষীর দল নিষ্ক্রিয়তাতেই যেন আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সূর্যের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। ইতিমধ্যেই দূর পাহাড়ের মাথার ওপর ঢলে পড়েছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে যাবে এখনই। তারপর—। দায়ুদ একটু ইতস্তত করলেন। বিপন্নমুখে একবার তাকালেন অনুচরদের দিকে।

তারপর বললেন, 'শ্রীহরি, তুমি এক কাজ কর।...আচ্ছা, আমাদের তাঁবু ফেলবার জায়গা কোথায় ঠিক হয়েছে?'

'আজ্ঞে, কোথাও ঠিক হয় নি। হবে কী করে? আপনি তো কোন হুকুম দেন নি।'

'সেগুলো কোথায়?'

'তুটো তিনটে হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কথা আছে, বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যেই আমরা যদি ওদের ধরে ফেলতে না পারি তো—সেই সময় ওরা যেখানে পৌছবে, তারই কাছাকাছি একটা ভাল জায়গা দেখে অপেক্ষা করবে।'

'তাহলে তুমি এখনই এদের নিয়ে রওনা হয়ে যাও। এখন খুব জোরে ঘোড়া হাঁকালে তুমি একপ্রহর রাত হবার আগেই তাদের ধরে ফেলতে পারবে। সেখানে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে রাতটার মত বিশ্রামের আয়োজন ঠিক কর, রসুই-টসুইও একটু তদারক কর—আমি একটু পরে আসছি।'

এবার বিস্মিত হবার পালা শ্রীহরির।

'আপনি এখানে একা থাকবেন? একা?'

'এখানে ঠিক থাকব না হয়ত।—একটু ঘুরে যাব।...আমার—আমার একটু কাজ আছে—'

'কোথায় ঘুরবেন আবার আপনি? চারদিকে তুশমন, সন্ধ্যাবেলা, জঙ্গলের পথ।...শের আছে, ভালু আছে। না না, আপনি চলুন। নয়তো আমরাও চলি আপনার সঙ্গে—যা ঘোরবার ঘুরে একসঙ্গেই পৌছব।'

'না—না—এত ক্লান্ত হয়ে গিয়ে তখন আর তাঁবু ফেলবার জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। তোমরা এগিয়ে যাও। আমি একাই থাকব। আমার কিছু হবে না।'

'না জনাব। একা রেখে আপনাকে যাব না। এ জঙ্গলের পথে একা কোথাও যেতে দেব না। সাফ কথা আমার কাছে।'

শ্রীহরির কণ্ঠে আন্তরিক দৃঢ়তা।

তাঁর এই দৃঢ়তায় কে জানে কেন দায়ুদের চোখে জল এসে যায় অকস্মাৎ। আছে তাহলে, এখনও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সেবক তু-একজন আছে। সত্যকার শুভানুধ্যায়ী তু-একজন। তারা তাহলে একেবারে পরিত্যাগ করে নি ওঁকে!

অথচ এ বিশ্বস্ততার তিনি যোগ্য নন।

সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং শুভানুধ্যায়ী যে ওঁর বংশের, তাকে তিনিই হত্যা করিয়েছেন—অকারণে, অন্ধ মূঢ়তায়।

দায়ুদের মরাই উচিত। তাঁর জন্য অন্তত এইসব লোকের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই।

তবু তিনি শ্রীহরিকে কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর আন্তরিকতার সামনে নতি-স্বীকার করতেই হল ওঁকে। একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যদি নিতান্তই একা যেতে না দাও তো গোলাম কাদের থাক্। তোমরা এগিয়ে যাও। আমায় একটা খোঁজ নিয়ে যেতেই হবে শ্রীহরি, নইলে স্বস্তি পাব না। আমার এক গোপন শত্রুর খবর নিতে হবে। কিন্তু একা যাওয়াই দরকার, গোপনে। বেশী লোক থাকলে সুবিধা হবে না। দুশমন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।...যাক্, একলা যখন ছাড়বেই না—একজন থাক।'

গোলাম কাদেরও বহুদিনের লোক। ছেলেবেলায় বলতে গেলে ওর কোলেপিঠেই মানুষ হয়েছেন দায়ুদ। শুধু শক্তি নয়, যথার্থ নিরাপত্তার জন্য মানুষের চারদিকে স্নেহের প্রাচীরই দরকার হয়—এটা এতদিনে সুলতান জেনেছেন।

শ্রীহরি আর কথা বাড়ালেন না। সকল প্রভুধর্মের চেয়েও আত্মরক্ষা বড় ধর্ম। তাঁর শরীর এখনই ভেঙে পড়তে চাইছে, এর পর আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে এতটা পথ যাওয়াই হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি সংক্ষেপে সুলতানের আদেশ সকলকে জানিয়ে, গোলাম কাদেরকে ইঙ্গিতে এখানেই থাকতে বলে বাকী সকলকে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ দূর বনপথে মিলিয়ে গেল। এখানে রইলেন শুধু দায়ুদ ও গোলাম কাদের।

॥ ১৬ ॥

সকালে উত্তর-পূর্ব দিকে তাকিয়ে তন্দ্রাজড়িত চোখে শুধুই কি মুঘলবাহিনী আর তার পিছনে একটা আগুন দেখেছিলেন দায়ুদ কররাণী?

না।

আরও কিছু দেখেছিলেন। আর সেইটেই কিছুতে ভুলতে পারছেন না। সেই আগুনের শিখার পটে দেখেছিলেন মিয়া লুদী খাঁকে।

স্পষ্ট, জীবন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার, হাসি-হাসি মুখ। যেমন সস্নেহ সকৌতুক প্রশ্রয়ের একটা হাসি তাঁর মুখে লেগে থাকত—তেমনি হাসিটুকুও যেন চোখে পড়েছিল সে-মূর্তির দিকে তাকিয়ে।

অতদূর থেকে অমনভাবে দেখতে পাবার কথা নয়—তবু স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন—এটাও ঠিক।

মুঘলবাহিনীর অগ্রগামী সর্পিল রেখার পিছনে, আগুনের কাছাকাছি সে দাঁড়িয়ে ছিল—সেই ছায়ামূর্তি। ছোট্ট এতটুকু দেখাবার কথা। তবু মনে হয়েছিল, তিনি যেন সামনাসামনি দেখছেন লুদী মিয়াকে।

এতবড় বিরাট মূর্তিতেই কি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি? তা কি সম্ভব?

চোখের ভ্রম?

অনুতপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা?

সেইটেই তিনি যাচাই ক'রে দেখতে চান। কাছে গিয়ে, নিজের চোখে।

আর সেই সঙ্গে আগুনের কারণটাও। কিসের আগুন ওটা? নাকি আগুনটাও কল্পনা? অথবা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সামান্য আগুন একটা?

কই, আর তো কেউ একবারও বললে না আগুনের কথা।

অত ভয়ের মধ্যে, অত বিরক্তিকর কথা-কাটাকাটি জবাবদিহির মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করেছিলেন দায়ুদ, উন্মাদও যেমন এক-একটা জিনিস সহজ মানুষের মতই লক্ষ্য করে—তেমনিই।...একথাটাও একবার মনে হয়েছিল তাঁর। তবে কি তিনি পাগলই হয়ে যাচ্ছেন? আর ঐ আগুনটা সেই উন্মত্ততারই একটা লক্ষণ? সেদিন থেকে—পাটনার সেই ঘটনার পর থেকে মনের মধ্যে স্থির হয়ে আছে ছবিটা, ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিরদিনের মত? ভয় পেলেই একটা আগুন দেখছেন?

না কি সত্যি-সত্যিই তাঁর পাপের ফল?

খোদার অভিশাপ?...

সেইটেই জানতে চান তিনি। কারণটা দেখতে চান নিজের চোখে।

ভয় পেয়েছিলেন সেদিন, আজও পেয়েছেন।

নামহীন, আকারহীন, কারণহীন আতঙ্ক অনুভব করেছেন।

তবু তিনি কাপুরুষ নন ঠিক।

অল্পবয়সে অতিরিক্ত মদ্যপান ও লাম্পট্যের ফলে হয়ত তাঁর স্নায়ু কিছু দুর্বল—কিন্তু তবু পাঠানেরই রক্ত তাঁর ধমনীতে, তিনি সুলেমান কররাণীর পুত্র।

ভয়ের বাসা স্নায়ুতে—সাহসের বাসা তাঁর রক্তে।

তিনি এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলতে চান আজই। এমন করে একটা অকারণ ভয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর অর্থ হয় না—এমন করে সকলকার কাছে, তাঁর কর্মচারীদের কাছে অপদস্থ হওয়ার। এমন শূন্যে-ভেসে-থাকা আতঙ্কে আর অভিভূত হতে চান না তিনি।

ঐখানে যাবেন তিনি, আগুনটা যেখানে জ্বলেছিল।

দিকটা ঠিক আছে। তাঁর পথটা ঘুরে এদিকেই এসে পড়েছে।

এই জঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে ওখানে গিয়ে পড়লে কেউ টের পাবে না। মুঘলরা নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ করছে, শিবির ফেলতেও ব্যস্ত। তাছাড়া মধ্যে ঘন জঙ্গল এবং একটা নদীর ব্যবধান আছে। এখানে ওদের আসবার সম্ভাবনা নেই।

দায়ূদ মুহূর্তের মধ্যেই ভেবে নিলেন কথাগুলো। বিচার ক'রে দেখলেন অবস্থাটা। তারপরই ঘোড়াকে ইঙ্গিত করলেন এগিয়ে যেতে।

সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। তাড়াতাড়ি করা দরকার।

আগুনটা যেখানে জ্বলছে বলে মনে করেছিলেন—তার একটা আন্দাজী হিসাব ছিল মনে মনে। সূর্যের দিকে চেয়ে দিকটা ঠিক ক'রে নিয়ে সেইদিকেই চললেন দায়ূদ কররাণী। গোলাম কাদেরের দেখাদেখি তিনিও তলোয়ার খাপে পুরে পিঠে-বাঁধা বর্শাটা খুলে নিয়েছেন। এসব জঙ্গলের পথে লম্বা হাতিয়ার থাকাই সুবিধা। সাবধানের বিনাশ নেই।

যথাসম্ভব দ্রুতই যাচ্ছিলেন। বনের পথ—শাখা-প্রশাখায় ঢাকা। নীচে মাটিতে আগাছার জঙ্গল কম, এসব অঞ্চলে দক্ষিণ-বাংলার মত ঘন আগাছা থাকে না—কিন্তু তেমনি বন্য-লতার উপদ্রব। শক্ত শক্ত লতাগুলো এ-গাছ থেকে ও-গাছে প্রসারিত হয়ে পথ বন্ধ ক'রে রেখেছে। তা ভেদ ক'রে যাওয়া রীতিমত কঠিন। এক এক জায়গায় ওপর থেকে ঝুলে পড়েছে—মাকড়শার মতই জাল রচনা ক'রে রেখেছে যেন।

সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, পথ দেখা শক্ত হবে তখন। সঙ্গে আলো বা আগুনের কোন আয়োজন নেই। এত দেরি করা কিছুতেই উচিত হয় নি। যদি অন্ধকার হয়ে যায় তো সারারাত এই জঙ্গলেই কাটাতে হবে, আর সেটা খুব নিরাপদ হবে না।

এইসব ভেবেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে এগোচ্ছিলেন দায়ূদ। আজকের মত

ফিরে গিয়ে কাল সকালে আবার আসাই হয়ত উচিত—এটাও ভাবছেন এক-একবার, কিন্তু থামতেও পারছেন না। তেমন বিপজ্জনক অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই না হয় ফিরবেন, মনকে এই প্রবোধ দিচ্ছেন—তার আগে পর্যন্ত দেখতে দোষ কী?

তবু—আশায় আশায় এগিয়ে গেলেও—এত সহজে যাত্রা শেষ হবার আশা করেন নি দায়ুদ। অথচ তা-ই হয়ে গেল।

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটু চমকে যেতে হল। সচেতন হয়ে উঠলেন দায়ুদ—কই, সেই কষ্টদায়ক কঠিন লতাগুলো তো আর তেমন বাধা দিচ্ছে না। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—সত্যিই একটা লতাও এখানের কোন গাছে ঝুলছে না। আশেপাশের গাছগুলোর দিকে আরও ভাল ক'রে তাকালেন—মনে হল শুকনো ডালপালাগুলো কোন মানুষই ভেঙে নিয়েছে।

ঝাপসা হয়ে এসেছে দিনের আলো। গাছপালার ছায়ায় আরও ঝাপসা লাগছে।…নজর খুব বেশী চলে না। দায়ুদ গাছগুলোর তলায় তলায় গিয়ে ভাল ক'রে দেখলেন।

মানুষের হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।

গোলাম কাদের প্রভুর নীরব প্রশ্নটা বুঝল। বললে, 'কোন মানুষই এসে ভেঙে নিয়ে গেছে জাহাঁপনা—কোন কাঠুরে হয়ত এসেছিল কাঠ কাটতে।'

গহন অরণ্য। পায়ে-চলা পথের চিহ্ন পাওয়াই কঠিন। এতক্ষণ ধরে খুব কষ্ট ক'রেই সে-চিহ্ন খুঁজতে হয়েছে। কদাচিৎ কেউ আসে এখানে। কিন্তু যে-ই আসুক সে বনের একেবারে প্রান্ত থেকে কাঠ কাটতে কাটতে ভেতরে এগোয়, এ-ই নিয়ম। এমন নির্জনে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে শুকনো লতা আর ডালপালা ভাঙবে কেন?

দায়ুদ চিরদিনই ঝোঁকের মাথায় কাজ ক'রে বসেন। আজও একটা অসম-সাহসিক কাজ করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

সেই গভীর বনের মধ্যে, প্রায়ান্ধকার অপরাহ্ণে পায়ে হেঁটে এগোনো মানে আত্মহত্যারই চেষ্টা করা। সাপ আছে, বাঘ আছে—ভালুক থাকাও বিচিত্র নয়। গোলাম কাদের কী বলতে গেল, কিন্তু দায়ুদ সে সময় দিলেন না। একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, 'নেমে এসে ঘোড়া দুটোকে কোন গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল। এখানটা একটু পায়ে হেঁটেই ঘুরতে হবে।'

মনিবকে বিলক্ষণ চেনে গোলাম কাদের। তাঁর জন্মাবধিই তাঁকে দেখছে

বলতে গেলে। সুতরাং প্রতিবাদের চেষ্টা না করে নেমেই পড়ল। ঘোড়া দুটোকে গাছে বেঁধে পাংশু বিবর্ণ মুখে খোদাকে স্মরণ করতে করতে দায়ুদের পিছু পিছু চলল।

কিন্তু গোলাম কাদের যত তাড়াতাড়িই করুক—ঘোড়া দুটোকে বাঁধতে অবশ্যই কিছু দেরি হয়েছিল।

ততক্ষণে দায়ুদ খানিকটা এগিয়ে গেছেন।

একটা বড় পুরনো সেগুনগাছের গুঁড়ি ঘুরে অপেক্ষাকৃত একটু খোলা জায়গায় এসে পড়েছেন তিনি। আর সেখানে আসতেই নজরে পড়েছে মাঝামাঝি স্তূপাকার করা শুকনো কাঠ-কুটো লতাপাতার রাশি, আর খুব সম্ভব সেই পর্বতপ্রমাণ ইন্ধন থেকেই এক বোঝা সংগ্রহ করে নিয়ে বিপরীত দিকে যাচ্ছে—একটি মেয়ে।

ঝাপসা আলো—মেয়েটিও পিছন ফিরে আছে, তবু দায়ুদ চমকে উঠলেন। অকস্মাৎ নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বিছা কামড়ালে যেমন মানুষ যন্ত্রণা পেয়ে চমকে ওঠে, তেমনিই চমকে উঠলেন।

চিনেছেন, চিনেছেন।

এ-ই তো সেই স্বপ্নে-দেখা সর্বনাশিনী, মৃত্যুদূতী!

মূর্তিমতী প্রতিহিংসা!

চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা শব্দও বোধ করি বেরিয়ে গিয়েছিল ওঁর মুখ দিয়ে।

নির্জন নিস্তব্ধ শান্ত বনমধ্যে সামান্য শব্দই বহুদূর যায়—প্রতিধ্বনি জাগাতে জাগাতে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মেয়েটির কানেও গেল সে-শব্দ।

অন্যমনস্ক ছিল হয়ত খুব বেশী—নইলে জুতোর শব্দও—তা সে যত সন্তর্পণেই দায়ুদ চলুন না কেন—পাবার কথা।

কিন্তু এই শব্দেই সে-ও চমকে উঠল।

চমকে উঠে ফিরে চাইল।

আর যাই হোক—এই ঝাপসা আঁধারে এই গহন বনে অন্তত দায়ুদ কররাণীকে দেখবার আশঙ্কা করে নি সে।

আলো যতই কম হোক, চেনবার অসুবিধা হয় নি তারও।

নিমেষে পাথর হয়ে গেল মেয়েটি।

এবং সে বিমূঢ়তা সামলে সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই দায়ুদ কররাণী প্রায় চোখের নিমেষে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ওর—একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমিই তাহলে আজ ভোরে আগুন জ্বেলেছিলে? এইসব কাঠ-কুটো নিয়ে গিয়ে?...আমাকে ভয় দেখাতে?... বল বল, জবাব দাও।'

দুই চোখে আগুন দায়ুদ কররাণীর। অসহ ক্রোধে দুই রগের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে, সমস্ত মুখ অরুণবর্ণ। উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি।

এতদিনের এত অপমান রক্তের তৃষা নিয়ে জেগে উঠেছে মাথার মধ্যে—প্রতিশোধ-কামনায়।

তখনই মুরগীর ঘাড় ছেঁড়ার মত মেয়েটাকে ধরে দু টুকরো ক'রে ফেলতে পারলে স্বস্তি পান তিনি।

এতদিনের এত লাঞ্ছনার মূল এই তুচ্ছ মেয়েটা—আর তার ভয় দেখানোর উপকরণও এত হাস্যকর রকমের তুচ্ছ! এটা মনে হলেই আরও অপমান বোধ হয় যে!

তিনি মেয়েটার হাত ধরে ঝাঁকানি দেন গোটাকতক।

পিছনে গোলাম কাদের এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে বর্শা। বাঁ-হাতখানা কোমরের তলোয়ারে।

মেয়েটা বুঝল যে পালাবার উপায় নেই। কিন্তু সে বিচলিতও হল না—শুধু অপূর্ব কৌশলে মাথাটা নেড়ে কাঠের বোঝাটা ফেলে দিল, তারপর বুক আর মাথা সোজা করে দায়ুদের চোখের উপর চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই জ্বেলেছি আগুন। আরও জ্বালাতুম আজ রাত্রে। আপনি এখনও এ অঞ্চলে আছেন শুনেছিলুম।'

স্তম্ভিত হয়ে যান দায়ুদ ওর এই স্পর্ধায়।

'তুমি! তুমিই দিয়েছিলে আগুন? সত্যি-সত্যিই?'

বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে যান দায়ুদ।

হাতে হাতে ধরে ফেলেছেন, তবু যেন বিশ্বাস হয় না।

'হ্যাঁ, আমিই।'

'কিন্তু তা কী ক'রে হবে? পাটনায়—'

'আকবর শাকে আমিই পরামর্শ দিয়েছিলুম হাজীপুর কিলায় আগুন লাগাতে।' বিজয়িনীর কণ্ঠে বিজয়গর্ব চাপা থাকে না—আপাত-শান্ত স্বরের মধ্যে তা ধরা পড়ে।

'তুমি ?...তাহলে তুমিই—'

'হ্যাঁ জনাব, আমিই আপনাকে ঘুমের মধ্যে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে এসেছিলুম।'

'কিন্তু কেন, কেন তুমি এ শয়তানী করতে গেলে আমার সঙ্গে ? কেন, কেন ? উঃ! তোমাকে টুকরো-টুকরো করে কাটলে—একটু একটু করে আগুনে পোড়ালেও যে আমার এই ক্ষতির দাম শোধ হবে না।'

আরও গোটাকতক ঝাঁকানি দেন ওকে।

হাত ছেড়ে দু হাতে দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেন।

দায়ুদ খাঁর মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হয় সত্যি-সত্যিই উনি বুঝি ওকে টুকরো-টুকরো করে ফেলবেন।

কিন্তু তবুও ব্যস্ত হয় না মেয়েটা।

শান্ত অচঞ্চল কণ্ঠে বলে, 'জনাব, আমি লুদী খাঁর বাঁদী—তাঁর অকারণ নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নেব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

অকস্মাৎ শিথিল হয়ে পড়ে দায়ুদ কররাণীর হাত দুটো। চমকে উঠেন তিনি আবারও। মানুষ তার সামনে ভূত কল্পনা করলে যেমন চমকায়—হয়ত তেমনিই চমকে ওঠেন।

একটা আতঙ্ক অনুভব করেন। যেমন সে-রাত্রে করেছিলেন পাটনায়—যেমন কতকটা আজও করেছেন ভোরবেলায়, অগ্নিশিখার পৃষ্ঠপটে লুদী খাঁর মূর্তি অঙ্কিত দেখে—

সর্বাঙ্গ-শিথিল-করা হিম-শীতল আতঙ্ক একটা।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে প্রায় চুপি-চুপি বলেন দায়ুদ, 'লুদী মিয়া ? লুদী মিয়া ?'

বহুদিন পরে নফিসার মুখ হাসিতে বিস্তারিত হয়।

নিঃশব্দ হাসি—কিন্তু তবু তা বিজয়েরই হাসি, তৃপ্তিরই হাসি।

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন দায়ুদ কররাণী। কতক্ষণ থাকেন তা তাঁর খেয়ালও হয় না।

অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে শাল-সেগুন-মহুয়ার জঙ্গলে। একটু পরে হয়ত আর পথ খুঁজে পাবার ক্ষীণ আশাও থাকবে না।

গোলাম কাদের সেই কথাটাই স্মরণ করাতে আস্তে আস্তে ডাকে, 'জাঁহাপনা!'

সে-ডাকটা ঠিক হয়ত কানে পৌঁছয় না। তবু মানুষের গলার শব্দ পেয়েই সচেতন হয়ে ওঠেন।

গোলাম কাদেরকে উত্তর দেন না, বোধ হয় কাউকেই দেন না—আপন মনেই বলেন কতকটা—কেমন একরকম চুপি-চুপি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেন, 'তুমি ঠিকই করেছ বাঁদী, তুমি ঠিকই করেছ।'

তারপর যেন সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকান একবার। এতক্ষণে বুঝি গোলাম কাদেরের উপস্থিতি চোখে পড়ে। তেমনিই অর্ধভগ্ন কণ্ঠে বলেন, 'এই যে যাই। চল্—'

গোলাম কাদের বিস্মিত হয়। সব কথা না বুঝলেও এটা অন্তত সে বুঝেছে যে, এই মেয়েটা নিতান্ত গর্হিত কিছু করেছে। আরও সেই কারণেই, ওকে ধরতেই মালিকের জীবন-বিপন্ন-করা এই অভিযান। অথচ অপরাধিনীকে হাতে পেয়ে শাস্তি না দিয়ে বা অন্তত কয়েদ না ক'রে চলে যাওয়াটা কী রকম প্রস্তাব?...

বিস্মিত হয় নফিসাও। একটু বিচলিতও হয় সে। অবাক হয়ে তাকায় দায়ুদের মুখের দিকে। আজ এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম তার দৃষ্টি থেকে বুঝি উদ্ধত স্পর্ধা ও বিদ্বেষ মিলিয়ে আসে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'কই, আমাকে শাস্তি দিলেন না?'

দায়ুদ খাঁ একটু ম্লান হাসেন। সঙ্কোচের হাসি। তারপর বলেন, 'না, বাঁদী—তোমার কোন দোষ নেই। আমার কৃতকর্মের ফল আমাকে ভোগ করতে হবে বইকি!...আমি নির্বোধ, তাই যে আমার সবচেয়ে বড় ভরসা তাকেই আগে ক্ষুইয়ে বসে আছি—নিজেই ইচ্ছে ক'রে। তার ফল সর্বত্রই ভোগ করছি—সর্ব ক্ষেত্রেই।—যা পেয়েছি এ আমার প্রাপ্যই।...তুমি ঠিকই করেছ বাঁদী—আর তুমিই বা কী করবে—লুদী মিয়ার আত্মাই এ শোধ নিচ্ছেন।'

সকালে আকাশের গায়ে আঁকা সে-ছায়ামূর্তির কথাটাই বুঝি মনে পড়ে দায়ুদ কররাণীর।

নফিসা প্রতিবাদ করে। কে জানে কেন, তার কণ্ঠে আর কিছুতেই উগ্রতা ফোটে না—ফোটে না স্পর্ধা। তবু সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'আবারও আপনি মৃত ব্যক্তির উপর অবিচার করছেন সুলতান, লুদী মিয়া সে-মানুষ ছিলেন না। তিনি আপনাকে মৃত্যুর সময়ও নিশ্চয় ক্ষমা করে গেছেন। তাঁর আত্মা অন্তত আপনার ওপর প্রতিশোধ তোলবার জন্য ঘুরে বেড়াবে না।'

'তাও ঠিক।' অত্যন্ত দীন ভাবেই স্বীকার করেন দায়ুদ, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এ খোদারই অভিশাপ। অভিশাপও নয়—ন্যায়বিচার। তিনিই করিয়েছেন। তোমাকে দিয়ে।···না বাঁদী, আজ আর তোমার বিচার অন্তত আমি করব না।'

গোলাম কাদের ইতিমধ্যে ঘোড়া ছুটো খুলে এনেছে। দায়ুদ তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হন।

'কিন্তু মনে রাখবেন জনাব, আমি যতদিন বেঁচে থাকব—আপনার অনিষ্টই ক'রে যাব।'

'সে ভয়ও আর করি না। স্বয়ং খোদার কাছে শাস্তি নেবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি—তোমার কথা আর ভাবব না।···তবে হালও ছাড়ব না, ভেঙে পড়ব না। যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে চেষ্টা ক'রে যাব মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার। ···কিন্তু আশা আর কিছুই রাখি না। বিদ্বেষও নেই কারুর ওপর। তোমার ওপর তো নয়-ই।'

দায়ুদ রওনা হবার জন্য ঘুরে দাঁড়ান।

অকস্মাৎ একটা কাণ্ড করে বসে মেয়েটা।

এতক্ষণ ধরে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল ওর—আবেগের সঙ্গে যুক্তির, বিবেকের সঙ্গে প্রতিজ্ঞার।

অবশেষে আবেগেরই জয় হয়। নারী মাত্রেরই মনে বোধ হয় তাই হয়—চিরকালই হয়েছে আর চিরকালই হবে।

সে বলে ওঠে, 'দাঁড়ান, জাহাঁপনা। ওদিকে গেলে আজ রাত্রের মধ্যে আর বন থেকে বেরোতে পারবেন না। এদিকে একটা পথ আছে, এখনই বনের বাইরে গিয়ে পড়তে পারবেন। আসুন—আমি সে-পথে পৌঁছে দিচ্ছি।'

একবার মুহূর্তের জন্য একটা কুটিল সন্দেহে মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে দায়ুদের। অভ্যস্ত জীবন ও পরিচিত পরিবেশের সহজাত সন্দেহ।

কিন্তু জোর ক'রেই সে সন্দেহকে দমন করলেন দায়ুদ।

গোলাম কাদের যে যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্নভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে—তা লক্ষ্য ক'রেও গ্রাহ্য করলেন না তিনি।

বেশ সহজকণ্ঠেই বললেন, 'চল।'

আজ তিনি যেন তাঁর ঈশ্বরেরই সামনাসামনি দাঁড়িয়েছেন, প্রাপ্য শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়েই। তাই ভয় আর-কাউকেই নেই তাঁর, কিছুতেই নেই।

শুরু হল সেই অপূর্ব যাত্রা।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল নিয়তির মত সেই নারী, সেই মূর্তিমতী প্রতিহিংসা—লুদী মিয়ার রহস্যময়ী বাঁদী নফিসা। দায়ুদ কররাণীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে।

তখন একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক, এমন কি দু হাত আগে নফিসাকেও দেখা যায় না। অবস্থা বুঝে শেষ পর্যন্ত সে দায়ুদের ঘোড়ার লাগামটা নিজের হাতে টেনে নেয়—অনায়াসে, অবলীলাক্রমে।

না হলে যে আর উপায় ছিল না তা গোলাম কাদেরও বোঝে। নিজেরা রওনা হলে আজ রাত্রে এ বনের বাইরে পৌঁছনো যেত না কিছুতেই—যদিও নির্মেঘ আকাশে অসংখ্য তারা ইতিমধ্যেই ফুটতে আরম্ভ করেছে—তবু তারা দেখে দিক ঠিক ক'রে যাওয়া—এ গভীর ছায়ান্ধকার বনে সম্ভব হত না। শের কী ভালুকের হাতেই জানটা দিতে হত।...

বন শিগগিরই শেষ হয়ে আসে। সত্যিই এদিকে একটা পথ পাওয়া যায়।

পথের ওপর উঠে ঘোড়ার লাগামটা ছেড়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেয় নফিসা, 'ঐদিকে সোজা গেলেই পাকুড়ের রাস্তা পাবেন, আপনার তাঁবু আর সেবকরা গেছে ঐদিকে। আশা করি আর কোন অসুবিধা হবে না।'

'না, তা হবে না। ··বাঁদী, তুমি বিচিত্র, তোমাকে বুঝতে পারলুম না। হয়ত পারবও না।···তুমি নিজে বলেছ তুমি লুদী মিয়ার বাঁদী। সামান্য বাঁদী মালিকের মৃত্যুর জন্য এমন সর্বস্ব-পণ-করা প্রতিহিংসার আয়োজন করে না।···কেনই যে আমার সর্বনাশের জন্য এত কাণ্ড করেছ, আবার আজ কেনই যে আমার ওপর শোধ নেবার সব আয়োজন থাকতেও গরজ করে বাঁচাতে গেলে—তা তুমিই জান।···কিন্তু একটা কথা—তোমার মালিকের মৃত্যুর পূর্ণ শোধ যদি এই মুহূর্তে তুলতে চাও তো অনায়াসে তা তুলতে পার। একটি

মাত্র দেহরক্ষী আমার—তাকেও সরিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমারই অস্ত্রে আমাকে বধ করতে পার, আমি বাধা দেব না।'

নফিসা হাসল। অদ্ভুত এক রকমের হাসি। অন্ধকারে তা দেখতে পেলেন না দায়ুদ, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে-হাসির আভাস পেলেন। নফিসা বলল, 'না জনাব, মৃত্যুটা কোন শোধই নয়। শোধ তুলব বলেই যত্ন করে বাঁচালাম।...যান এখন, নিরাপদে আপনার লোকজনের মধ্যে ফিরে যান। কোনও ভয় নেই।'

একটা নিশ্বাস ফেলেন দায়ুদ।

'বাঁদী, তোমার নামটা তো জানা হল না!'

'এ বাঁদীর নাম জেনে আপনার কী হবে জনাব? লুদী মিয়ার বাঁদী—এই পরিচয়ই তো যথেষ্ট।'

'তা বটে। লুদী মিয়াই ধন্য! উপযুক্ত ছেলেও যা পারে না অনেক সময়, তাঁর এক বাঁদীই তাই করল। তাঁর হত্যার শোধ তুলল।.. চল, গোলাম কাদের।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা পায়ের চাপ দেন তার বুকে।

শিক্ষিত ঘোড়া ইঙ্গিতমাত্র ছুটতে শুরু করে।

দেখতে দেখতে সেই গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দুই অশ্বারোহী, শুধু নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে চার-জোড়া ক্ষুরের শব্দ বহুদূর আর বহুক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে।

তারপর একসময় তাও মিলিয়ে যায়।

ক্লান্ত নফিসা সেই পথের ধুলোর ওপরই বসে পড়ে।

॥ ১৭ ॥

গুরুন্দার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিনা যুদ্ধে যেদিন আফগানরা পিছু হটে এল—সেদিন মুঘল সেনাপতির উল্লসিত হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু তা তিনি হলেন না। বরং কেমন যেন হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর মতিগতি তাঁর আচরণ কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। সবাই বলতে লাগল, ভীমরতি। বলতে লাগল, মৃত্যুর পূর্ব-লক্ষণ। মরণকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়, এ নাকি তাই। কানাকানি গা-টেপাটেপিটা ক্রমে প্রকাণ্ড হাসাহাসিতে পরিণত হতে দেরি হল না। প্রধান সেনাপতি খান-ই-খানানের আচরণ

তাঁর নগণ্যতম সিপাহীর কাছেও নিত্য বিদ্রূপ ও আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল।

আর হওয়াই তো উচিত।

কোন বিরাশি বছরের বৃদ্ধ যদি একটা উনিশ-কুড়ি বছরের অনাত্মীয় অপরিচিত বিদেশী মেয়ের সংবাদের জন্য একেবারে পাগল হয়ে ওঠেন—গুরুতর রাজকার্য ভাসিয়ে দিয়ে তারই সন্ধান করার জন্য সমস্ত রাজশক্তি প্রয়োগ করেন তো সে আচরণকে ভীমরতি ছাড়া কীই বা বলা যায়?

মুনিম খাঁ ঠিক সেই কাজই করেছেন।

গুরুন্দার যুদ্ধে—অথবা বলা যায় বিনা যুদ্ধেই—হেরে গিয়ে যখন দায়ুদ কররাণী সাতগাঁ হয়ে হুগলীর পথ ধরে মেদিনীপুর চলে গেলেন—তখন সামান্য চেষ্টা করলেই তাঁকে বন্দী করা যেত, আফগান বিরোধিতার মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলা চলত। গুরুন্দা থেকে দায়ুদের বাহিনী পিছু হঠেছে প্রকাশ্য দিবালোকে—অসংখ্য সুসজ্জিত সশস্ত্র মুঘল সৈন্যের সামনে দিয়ে—তবু মুনিম খাঁ তাদের পিছু নেবার বা তাদের দিক লক্ষ্য করে একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করারও হুকুম দেন নি।

তখনও নয়—তার পরেও নয়।

দু-পা এগিয়ে গেলেই বিপর্যস্ত করা যেত দায়ুদ খাঁর বাহিনীকে—কিন্তু একটি পাও কেউ এগোতে পারে নি। তিনি গুরুন্দার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আগের-দিন-দেখা একটি জাদুকরী বেদেনী মেয়ের সন্ধানের জন্যই বেশী উদ্বিগ্ন, বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেন সেই খবরটার ওপর তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর করছিল। ও আফগান সৈন্য রইল কি গেল—দায়ুদ খাঁ নিরাপদে পালালেন কিংবা ধরা পড়লেন—সেটা তাঁর কাছে গৌণ, তুচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

অনেক পরে—বোধ করি অধীনস্থ সেনানায়কদের বিশেষ অনুযোগেই শেষ পর্যন্ত তিনি মুহম্মদ কুলী বর্লাসের সঙ্গে একদল সেনা পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন বর্ধমানে গিয়ে অপেক্ষা করতে—তিনি নাকি শিগগিরই গিয়ে পড়বেন এবং গিয়েই সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

কিন্তু তিনি তা যান নি। সম্ভবত কথাটা মনেও ছিল না।

তিনি যা করছিলেন, তা এক বিচিত্র ব্যাপার। হিন্দু মুসলমান যেখানে যত জ্যোতিষী পাওয়া যায় সকলকে মোটা মোটা বকশিশের লোভ দেখিয়ে রাজধানী টাণ্ডায় এনে জড়ো করছিলেন এবং তাদের সকলকে একই প্রশ্ন

করছিলেন—একটি বিশেষ বর্ণনার বিশেষ নামধারিণী বাঁদী এখন কোথায় আছে কেউ তার সন্ধান দিতে পারে কি না।

বলা বাহুল্য, প্রায় কারও গণনার সঙ্গেই কারও গণনা মেলে নি—একজন হয়ত বলেছে, সে-বালিকা উড়িষ্যায় গেছে; আর একজন হয়ত তাকে বিদ্রূপ করে নিজের অভ্রান্ত গণনা পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে—বলেছে, সে-মেয়ে এখনও তিনপাহাড়ের কোন গিরিকন্দরেই অপেক্ষা করছে। কেউ বা বলেছে, সে দিওয়ানা হয়ে তপস্যা করতে গেছে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায়; কেউ বা বলেছে, সে এক রাজপুত্রকে বিবাহ করে মনের সুখে ঘরকন্না করছে।

প্রথম প্রথম প্রায় সবাইকার কথাই নির্বিচারে বিশ্বাস করেছেন আকবর বাদশার প্রিয় সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁ। সেই মত খোঁজ-খবরও করিয়েছেন; কিন্তু কোন খবরই পান নি। তাই ইদানীং ঘোষণা করেছেন যে তাঁর বড় জায়গীর পুরস্কারের কথাটা ঠিকই আছে তবে গণনা সত্য না প্রমাণিত হলে গণৎকারের প্রাণ যাবে। ফলে আর কোন জ্যোতিষীই প্রায় টাণ্ডার ত্রিসীমানায় থাকতে চাইছে না।

'দিল্লী হানৌজ দূরস্ত্।' দিল্লী অনেক দূর। আগ্রাও কম নয়।

আকবর বাদশা কিছুকাল দিল্লীতে থাকেন, কিছুকাল আগ্রায়। কখনও বা আরও দূরে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত থাকেন। তবু সেখানেও খবর পৌছয়—সব খবরই পৌছয়; এমনিই নির্ভুল ব্যবস্থা তাঁর।

এ খবরও পৌছল।

রাজা টোডরমলকে পাঠালেন বাদশা। না, মুনিম খাঁকে ডিঙিয়ে শাসক হিসাবে নয়—মানীর মান তিনি জানেন—পাঠালেন তাঁর সহকারী সেবক হিসেবে।

টোডরমল গৌড়বঙ্গের মাটিতে পা দেবার আগেই শুনতে পেলেন অনেক কথা—টাণ্ডায় পৌছেও কিছু কিছু শুনলেন, কিন্তু কার্য সম্বন্ধে সবাই একমত হলেও কারণটা কেউই ভাল রকম বলতে পারলেন না—ভীমরতি ছাড়া।

ভীমরতিই নাকি একমাত্র কারণ।

অথচ মুনিম খাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় সে রকম লক্ষণও বিশেষ দেখতে পেলেন না রাজাসাহেব। রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল।

তখন অবশ্য সে রহস্যভেদের সময়ও ছিল না। এখনই যুদ্ধযাত্রা করতে হবে—নইলে উড়িষ্যায় পাকাপোক্ত হয়ে বসে ক্ষমতার শিকড় বিস্তার করার সময় পেলে আফগানদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা শক্ত হবে।

কথাটা যে মুনিম খাঁও না বোঝেন তা নয়। কিন্তু—

'কিন্তু'ও অনেক।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের শ্যামল-হরিৎ ক্ষেত্র মায়া বিস্তার করেছে মুঘল শার্দুলদের মনে ও মস্তিষ্কে। এখানকার বিচিত্র ও অসংখ্য রকমের পাখীর গান, সুগন্ধি ফুল এবং অগণিত নদীনদ তার মোহ দিয়ে আচ্ছন্ন করেছে ওঁদের উত্তম ও কর্মশক্তিকে। এখানে মধুমাখা স্নিগ্ধ বাতাস নিদ্রার আরামের জাল বিস্তার করেছে ওঁদের চারিদিকে।

আসল কথা কেউই আর হাঙ্গামে যেতে চান না। প্রাচুর্যের মধ্যে, আরামের মধ্যে দুটো দিন হেসে-খেলে কাটাতে চান। এ মাটির বুঝি এ-ই দস্তুর।

সেই কথাই বললেন মুনিম খাঁ রাজা টোডরমলকে।

'কেউ যে যেতে চাইছে না লড়াই করতে রাজা সাহেব। আমি একা কী করতে পারি?'

এ কথা রসনাগ্রে এসেছিল বইকি রাজার যে—'আপনি এগিয়ে গেলে ওরা পিছনে যেতে বাধ্য হত'—কিন্তু সে কথা বললেন না। তার বদলে তিনিই সেনানায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন।

চতুর তীক্ষ্ণধী রাজা জানতেন, বর্তমান আরামের মোহ কাটাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুরা একটু বেশী করে পান করাতে হয়। তিনি সেই পথেই গেলেন —বেশীর ভাগকে লোভ দেখিয়ে—দু-একজনকে বা ভয় দেখিয়ে নড়ালেন শেষ পর্যন্ত রাজধানী থেকে।

প্রথমেই এলেন তিনি বর্ধমান। সেখান থেকে গোঘাটের পথে একসময় গড়মান্দারণও পৌছলেন। এইখান থেকেই মেদিনীপুরের সোজা রাস্তা শুরু হয়েছে, এই পথেই শত্রুও গেছে একদা উড়িষ্যায় আশ্রয় নিতে।

গড়মান্দারণে কয়েকদিন বিশ্রাম করার ইচ্ছা ছিল মুঘল সেনাধিনায়কদের, কিন্তু টোডরমল রাজী হলেন না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলেন মেদিনীপুরের দিকে, দ্রুত এগিয়ে কোলিয়াতে এসে পৌছলেন। এইখানে এসে আফগান বাহিনীর গতিবিধিরও খবর মিলল।

শোনা গেল দাঊদ খাঁও এগোচ্ছেন—ভেবরায় ছিলেন, এগিয়ে এসেছেন গড়হরিপুর পর্যন্ত। সেইখানেই পরিখা কেটে বসে অপেক্ষা করছেন এঁদের।

বর্তমান দাঁতন স্টেশনের সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে গড়হরিপুর। নিবিড় শালের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। সে জঙ্গলও একটু-আধটু নয়—অরণ্য ভেদ করে বহু ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে তবে সেখানে পৌছনো যাবে।

টোডরমল কিন্তু একটুও ইতস্তত করলেন না।

তিনি জানতেন—যে নেতা তার ইতস্তত করার অধিকার নেই; সেনানায়কের এক মুহূর্তের দ্বিধা সেনাদের অগ্রগমন-পথে পর্বত-প্রমাণ বাধা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

তিনি ঈষৎ ঘুরে মেদিনীপুর পৌছলেন। ঐখান থেকে একেবারে গড়হরিপুরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন—এই ইচ্ছা।

কিন্তু তার আগেই এক অঘটন ঘটল—বীর ও সাহসী সেনাপতি—সূচ্যগ্রবুদ্ধি সামরিক নেতা মুহম্মদ কুলী বর্লাস মারা গেলেন। আর এই ঘটনাকে ঈশ্বরের স্পষ্ট নির্দেশ মনে করে সাধারণ সিপাহী ও সিপাহ্‌সলাররা বেঁকে বসল। তারা স্পষ্টই বললে, 'পাঠানরা অনেকদিন হেরেছে—এবার ওদের জেতবার পালা। খোদার তাই মর্জি। আমরা বেশী এগোলে খোদার কোপে পড়তে হবে।'

অনেক সাধ্যসাধনা করলেন টোডরমল—হাতে-পায়ে ধরলেন বলতে গেলে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। যারা বেঁকে ছিল তারা বেঁকেই রইল।

টোডরমল সেখানে অপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না—ফিরে এলেন গড়মান্দারণে। সেখান থেকে বর্ধমানে দূত পাঠালেন পত্র দিয়ে—মুনিম খাঁ একবার নিজে এসে দাঁড়ান সসৈন্যে—নইলে এদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ছে।...

লিখলেন—তবে আশাভরসা খুব একটা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল মুনিম খাঁরও আর বিশেষ আপত্তি নেই বর্ধমান ছেড়ে আসতে। কারণ—কারণটা শুধু তিনিই জানেন—ওখানে পীর কুতুব শার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ—কোন প্রশ্ন করার আগেই ওঁর কপালের দিকে চেয়ে বলেছেন, 'তুমি যাকে খুঁজছ বাবা, তাকে পাবে দক্ষিণের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে। তুমি এগিয়ে যাও—সে নিজেই এসে দেখা দেবে।'

ঠিক সেই বিশেষ ক্ষণটিকেই টোডরমলেরও পত্র গিয়ে পৌছল।

তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন খান-ই-খানান। তিন দিনের মধ্যে তিনি সসৈন্যে রওনা হবেন—কোন মতে যেন দেরি না হয়।

টোডরমলের অনুরোধ বিধাতার নির্দেশ বলেই মনে করলেন তিনি।

আবার গড়মান্দারণ থেকে যাত্রা শুরু হল।

কিন্তু পথ সেই একই—নিবিড় শালবনের মধ্য দিয়ে; পথ বলতেও বিশেষ কিছু নেই—বন কেটে পথ করে নিতে হচ্ছে প্রতিপদেই। শুধু দিকটা ঠিক আছে, আর আছে মধ্যে মধ্যে সরু পায়ে-চলা পথ। স্থানীয় দু-একজন ক্ষীণজীবী বাঙালী চাষীও সংগ্রহ হয়েছে রাস্তা চিনিয়ে দেবার। কিন্তু কামান আর তাঁবুর গাড়ি, জল ও খাবারের গাড়ি যাবার মত চওড়া রাস্তা চাই—আর ততটা রাস্তা পেতে গেলে গাছ কাটা ছাড়া উপায় নেই। প্রাচীন অভ্রভেদী শাল ও পিয়াশাল, সম্ভবত এই দক্ষিণ-বঙ্গ সৃষ্টির প্রথম থেকে—নদীর পলিতে অঙ্কুর দেখা দেবার দিনটি থেকেই—তারা এমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোন কাঠুরিয়ার লৌহকুঠার স্পর্শ করে নি তাদের অঙ্গ আজও পর্যন্ত। সে গাছ কাটাও খুব সহজ বা অল্পায়াসসাধ্য নয়।

কিন্তু তবু যদি তা-ই একমাত্র বাধা হত!

টোডরমলের গড়মান্দারণ ফিরে যাওয়া, বর্ধমানে লোক পাঠানো এবং মুনিম খাঁর গড়মান্দারণ পৌছনো—এর মধ্যে বহু সময় কেটে গেছে। দায়ুদ কররাণীর অভিজ্ঞ ও রণকুশলী দুই প্রধান সেনানায়ক কতলু লোহানী এবং গুজর খাঁও ইতিমধ্যে চুপ করে বসে নেই। তাঁরা জানেন যে জঙ্গলের পথ ছাড়া কোন দ্বিতীয় পথ নেই মুঘলবাহিনীর অগ্রসর হবার; সেই পথকে কণ্টকাকীর্ণ করাই সুবিধা। তাঁরা সমস্ত বনপথে সৈন্য ছড়িয়ে দিলেন। তারা দীর্ঘ সময় পেয়ে গাছে ওঠানামার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে—প্রায় বানরের মতই ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ গতিতে উঠতে নামতে পারে এখন। ফলে মেঘনাদের মত অদৃশ্য থেকে লড়াই করতে শিখেছে তারা—ইন্দ্রজিতের মতই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। শীতকাল পড়াতে তাদের পক্ষে বনে থাকারও খুব সুবিধা হয়েছিল—সাপখোপ মশার ভয় নেই—ভয় বলতে বাঘ-ভালুক। তা তারাও সাধারণত শস্ত্রধারী মানুষকে এড়িয়েই চলে।

এখন মুঘলবাহিনীর ত্রাস হয়ে উঠল এই জঙ্গলচারী আরণ্যবাহিনী, চোখে দেখা যায় না তাদের—আগমনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কোথা থেকে

অলক্ষিতে অতর্কিতে এসে পড়ে, এক জায়গায় কতকগুলো লোককে মেরে তাদের হাতিয়ার কেড়ে অথবা এদের খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করে আবার চকিতে কোথায় মিলিয়ে যায়। না যায় তাদের ধরা, না পাওয়া যায় তাদের খবর।

এমনি চলে দিনের পর দিন—প্রত্যহ।

অথবা সত্যি কথা বলতে গেলে দিনে বহুবার।

চতুর টোডরমল সে সংবাদ গোপন করার চেষ্টা করেন—দীর্ঘ বাহিনীর মধ্যে কোন এক অংশে বিশ-পঞ্চাশজন গেল কি রইল সে সংবাদ শেষ অংশের কি প্রথমাংশের পাবার কথা নয়—চিহ্ন পর্যন্ত দ্রুত ঢেকে ফেলা যায়। কিন্তু তবু কথাটা চাপা থাকে না কিছুতেই। জনশ্রুতি জনরব আরও বেশী আতঙ্কের সৃষ্টি করে। দৃশ্য শত্রুর চেয়ে অদৃশ্য শত্রুকে অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী ভয়ঙ্কর বোধ হয়।

আবারও কানাঘুষো ওঠে। আবারও দেখা যায় অসন্তোষের চাপা গুঞ্জন।

অবশেষে এক সময় আবারও সবাই বেঁকে দাঁড়ায়। তারা এমন ক'রে জঙ্গলের মধ্যে প্রাণ দিতে আসে নি—তারা আর-এক পাও এগোবে না এই দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্য দিয়ে।

প্রথমে মৃদু গুঞ্জন—তারপর প্রকাশ্য অনুযোগ। ক্রমে সে শব্দ-তরঙ্গ দাবির গর্জনে পরিণত হয়।

চারিদিক থেকে শব্দ উঠতে থাকে—'সন্ধি কর। সন্ধি কর। মিটিয়ে নাও দায়ুদ কররাণীর সঙ্গে এই অনর্থক ঝগড়া। সে উড়িষ্যায় সুখে থাক্, শান্তিতে থাক্।'

এইবার রাজা টোডরমল চোখে অন্ধকার দেখলেন। তিনি রাজপুত—সন্ধি করতে তিনি শেখেন নি। কিন্তু একা কী করতে পারেন?

তিনি ও মুনিম খাঁ স্বয়ং—বড় মনসবদার তো বটেই, ছোট ছোট সিপাহ্-সলারদেরও হাতে-পায়ে ধরলেন, সম্ভব অসম্ভব বহু প্রলোভন দেখালেন পুরস্কারের—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাদের সেই এক কথা।

'মিটিয়ে ফেল। সন্ধি কর। আর আমরা এক পাও এগোতে রাজী নই এই যমের দক্ষিণ দোরে।'

॥ ১৮ ॥

রাজা টোডরমল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সংবাদদাতার মুখের দিকে। দুবার তিনবার শুনেও যেন কথাগুলোর মর্মোপলব্ধি হল না তাঁর—তাকিয়েই রইলেন তাই।

বিপদের দিনে এমন অনুকূল হাওয়া যে এইভাবে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে বইবে—তা তিনি কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। অসম্ভব জেনেই বুঝি ইষ্টদেবী ভবানীকে পর্যন্ত এমন অনুরোধ জানান নি। তবে নাকি 'তিনি' যখন দেন তখন এমনি ভাবে—আশা ও কল্পনার অতীত ভাবেই দেন!

রাজা যুক্ত দুই কর ললাটে ঠেকালেন। এতদিনের পুজা বুঝি এইভাবে সফল হল। মা প্রসন্ন হলেন এবার।

আশ্চর্য! কাল যখন অকস্মাৎ এই ফাল্গুনের আকাশে উত্তর-পশ্চিম কোণে কাল-বৈশাখীর মেঘ দেখা দিয়েছিল তখন তিনি বিরক্তই হয়েছিলেন। ভাগ্যের কাছে অনুযোগ করেছিলেন মনে মনে—বিপদের ওপর এই বিপদ দেখা দেবার জন্য। সৈন্যদের তাঁবু নেই, পত্রের আচ্ছাদনও এখানে নিরাপদ নয়—যথেষ্ট শীতবস্ত্র পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নেই—এ অবস্থায় অসময়ে এই ঝড় বৃষ্টি তাদের মনোবল আরও বেশী করে নষ্ট করবে এই ছিল তাঁর আশঙ্কা।

কিন্তু তখন কে জানত যে এই আপাত-দুর্ভাগ্যই অপ্রত্যাশিত অলৌকিক সৌভাগ্য বহন করে এনেছে তাঁর জন্য—তাঁদের জন্য। দুর্যোগই সুযোগ হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও একবার প্রশ্ন করলেন, 'সন্ন্যাসিনী, দেওয়ানা? তুমি ঠিক জান? কী সে—হিন্দু না মুসলমান—না এ-দেশের কোন অরণ্যচর আদিম জাতি?'

'সে যে কী তা বলতে পারব না হুজুর।' ওঁর বিশ্বস্ত অনুচর রামসুভগ সিং নিবেদন করে, 'তার পরনে রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের তিলক—অথচ গলায় মুসলমান ফকির দরবেশের মত মালা। আদিম জাতি—না হুজুর, তা অন্তত নয়। কারণ এ রূপ বাদশার হারেমেও দুর্লভ। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—সাক্ষাৎ ভবানী বুঝি নেমে এসেছেন মাটিতে।'

'জয় মা!' নিজের মনের গোপন ধারণার সঙ্গে কথাটা আকস্মিক ভাবে মিলে যেতে রাজা টোডরমলের গায়ে কাঁটা দিল। তিনি আবারও জোড়হাত কপালে ঠেকালেন।

তারপর বললেন, 'সে সন্ন্যাসিনী একা এসেছিল? বয়স কত?'

'বয়স কত তা বলতে পারব না—মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কাঁচা—খুবই কাঁচা তাতে সন্দেহ নেই। কুড়ি একুশের বেশি নয়।'

'বল কী রামস্বভগ! অল্প বয়স, অসাধারণ সুন্দরী বলছ—সে এই এতগুলো অশিক্ষিত বর্বর সিপাহীর মধ্যে একা এসেছিল? আর ঢুকলই বা কী করে? ঢুকতে দিলে কে?'

'কী করে ঢুকল তা বলতে পারব না হুজুর,—কে যেন একজন বললে তার কাছে খান-ই-খানানের দেওয়া নিশানা ছিল। তবে না থাকলেও ক্ষতি নেই। তার দেহে এমনই একটা জ্যোতি ছিল, চোখের চাহনিতে এমনই নির্ভয় যে দেখে মনে হল সে মেয়ে একা লক্ষ দানবের মধ্যেও এমনি অকুতোভয়ে যেতে পারে। ভয় কী জিনিস তা সে জানে না—ভয়ের রাস্তায় কখনও হাঁটে নি। আর কোন পাপীর সাধ্য নেই তার কেশাগ্র স্পর্শ করে, কারও সাহসে কুলোবে না হুজুর, অতিবড় সাহসীরও না।'

আবারও মনে মনে ইষ্টকে স্মরণ করলেন রাজা টোডরমল।

এ দেবীর দয়া—প্রত্যক্ষ দয়া। তিনি নিজে না আসুন—তিনি আসবেনই বা কেন?—তাঁর কোন ডাকিনী যোগিনী সহচরীকে পাঠিয়েছেন এই দারুণ সংকটে ত্রাণ করতে।

'কী বললেন সে দেবী রামস্বভগ—তুমি নিজে কানে শুনেছ তাঁর কথা?'

'শুনেছি বইকি হুজুর। মুসলমান সিপাহীদের আড্ডায় যখন গিয়েছিলেন তখন অবশ্য আমি ছিলুম না—তবে শুনলুম যে বলেছেন, কররাণীদের পাপের ভরা পুর্ণ হয়েছে—খোদা নারাজ হয়েছেন তাদের ওপর। এবার যদি মুঘল ফৌজ ওদের ওপর হামলা না করে তো খোদা ওদের ওপরও নারাজ হবেন। তিনি চান ওদের দিয়েই কররাণীদের ধ্বংস করতে।…আরও বলেছেন, খোদার যে এই ইচ্ছা তা আজ তিনি নিজেই জানাবেন—অসময়ে তুফান উঠবে আজ—বৈশাখ মাসের মত তুফান।'

'তারপর?' রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করেন রাজা।

'তারপর আমাদের দিকে এসেছিলেন। আমাদের বললেন, শিব ভগবান আর দেবী ভবানীর কোপে পড়েছে কররাণীরা—ওদের এবার নিস্তার নেই। মুঘল বাদশা আকবর অন্তরে মহাশৈব—পুর্বজন্মের সামান্য পদস্খলনে বিধর্মীর ঘরে জন্ম নিয়েছেন। এ-জন্মে ওঁর সম্ভোগের অবসান করবেন ভগবান—তাই

সসাগরা পৃথিবীই তিনি ওঁকে দেবেন এবার। বললেন, তাঁর কথা বিশ্বাস না হয়, বিকেলেই প্রমাণ দেবেন তিনি। একেবারে অসময়ে—ফাল্গুনের আকাশে কালবৈশাখীর তুফান তুলবেন।'

'সিপাহীরা কী বললে সে কথা শুনে?'

'প্রথমটা কেউই বিশ্বাস করে নি—মাসুম খাঁ কিল্লাদার তো তেড়ে মারতেই উঠলেন ওঁকে--বললেন যে, টোডরমলের ঘুষ খেয়ে যাত্রা গাইতে এসেছে। আরও হয়ত কিছু অপমান করতেন কিন্তু এমনভাবে চাইলেন সে-দেবী ওঁর দিকে যে, কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন কিল্লাদার।—তবু বিশ্বাস ঠিক কেউই করে নি।'

মাসুম খাঁ কিল্লাদার। এবারই বাদশা তাকে এক হাজারী থেকে তিন হাজারী মনসবদার করেছেন। বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি বাদশার।

নিয়তি!

তিন-হাজারী মনসবদারকে কী করে পথের ভিখারী করতে হয় তাও টোডরমল জানেন। মনে মনে বিদ্যুৎচমকের মত সেই বিশেষ খতের মুসাবিদা করে মুখে শুধু বললেন, 'হুঁ। তারপর?'

'হাসাহাসি করেছিল অনেকেই। তিনি যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ বিশেষ কেউ মাথা তুলতে পারে নি বটে, কিন্তু তিনি অন্তর্হিত হতেই হাসির হল্লা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই ঐ কথাটা ভেবেছিল—মনে করেছিল বুঝি আপনিই পাঠিয়েছেন ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে। তবে আমাদের দিকের কেউ কেউ বলেছিল তেমনি বটে যে, শেখানো লোক হলে অমন করে ভবিষ্যদ্বাণী করে যায় কেন? জানে তো দু প্রহর পরেই চালাকি ধরা পড়ে যাবে।…এর মধ্যে আর-কিছু আছে, দেখই না একটু।… তা ছাড়া—মানুষটাও যেন কেমন-কেমন, সাধারণ মেয়েছেলে কিংবা মাইনে-করা গুপ্তচর হলে কি আর অমন নির্ভয়ে এতগুলো বুনো পুরুষের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে! দেখলে না —ওর গায়ে হাত দেবার কথা কারও মনে পর্যন্ত পড়ল না!…এমনি কথা-কাটাকাটি চলছিল—হঠাৎ হুজুর, আপনার এই বান্দারই প্রথম নজরটা পড়ে যায় আকাশের দিকে—একেবারে সেই বায়ু কোণে শাল জঙ্গলের মাথায় সামান্য কালো-মত এক টুকরো মেঘ। আপনি বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলেন তখন—তখনও বেশ রোদ—পুরো এক প্রহর বেলা আছে—'

'ঘুম! মায়ের কোল ছাড়বার পর দুপুরে ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না

রামস্বভগ।···আর এখন? এখন তো রাতেও ঘুম আসে না, তা দিনের বেলায়!···তা নয়—সে মেঘ আমিও দেখেছি। তখন তো—'

চুপ ক'রে যান রাজা বলতে বলতেই।

সত্যিই দেখেছেন। হয়ত রামস্বভগ দেখবার আগেই দেখেছেন।

বেশ মনে আছে। বিরক্তিতে সমস্ত অন্তর তিক্ত হয়ে গিয়েছিল—তবু মনে মনে তারিফ না করেও পারেন নি।

সামান্য একটি বিন্দুর মত কালো—দেখতে দেখতে সে কালি বহুদূর অবধি আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। নিকষ কালো হয়ত তাকে বলা যায় না—কারণ কষ্টিপাথরের রঙ সে নয়—তবু আর-এক ধরনের পাথরের মতই ভয়াবহ রকমের কালো। ডেলা-ডেলা, কবিদের ভাষায় পুঞ্জ-পুঞ্জ সেই মেঘে ছেয়ে গেল আকাশের সমস্ত উত্তর-পশ্চিম দিকটা। তারপর দ্রুত এগোতে লাগল সেই মেঘ—যেন মেঘেরই মধ্য থেকে নতুন মেঘ জন্ম নিচ্ছে—ছায়াপথের ঘূর্ণায়মান বহ্নিপিণ্ড থেকে যেমন বহ্নিময় অসংখ্য নক্ষত্র জন্ম নেয় তেমনিই—কোথা থেকে এত মেঘ আসছে তা কেউ জানে না—গড়িয়ে গড়িয়ে এগোচ্ছে মেঘগুলো—এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই—অথচ ওধারের মেঘ একটুও কমছে না, আকাশের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কোথাও—ওদিকেও দুই দিক ব্যেপে তারা বিস্তারলাভ করছে শুধু।

অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলেন সে মেঘ রাজা টোডরমল। অন্যমনস্ক, চিন্তাকুল, বিপন্ন—তবু দু চোখ ভরে দেখেছিলেন বাদশার বাদশা ভগবানের সে খেলা। জানতেন যে এখনই প্রলয়ের দুর্যোগ ভেঙে পড়বে মাথায়, তবু নড়তে পারেন নি।

তারপর এক সময় উঠল সেই ঝড়।

আগে দূর থেকে শোনা গেল একটা গর্জন,—তারপরই সমস্ত বন কাঁপিয়ে তীব্রবেগে সেই বাতাস এসে পৌঁছে গেল। আর্তনাদ করে উঠল যেন গাছপালাগুলো, হাহাকার জাগল বনস্পতিদের শাখা-প্রশাখায়—যন্ত্রণায় নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল বিরাট গাছগুলোর মাথা। ঝড়ের সম্ভাবনাতেই পাখিগুলো আকাশে উঠেছিল—এখন তারা সেই ঝঞ্চাবলয় ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। পাখা ঝাপটে আছড়ে এসে পড়তে লাগল মাটিতে—কেউ বা তাদের চিরকালের নিরাপদ ও পুরাতন আশ্রয় গাছের গুঁড়িতে এসেই পড়ল—কেউ মরল, কেউ বা জীবন্মৃত হয়ে পড়ে রইল।

চলল ঝড়ের মাতামাতি, প্রচণ্ড গর্জন বাতাসের। বন্য জন্তুদের ভীত আর্তস্বরে আর শাখাপ্রশাখার ধাক্কা-খাওয়া বাতাসের শব্দে চলল প্রতিযোগিতা। রাজা টোডরমলের দরবারী তাঁবুও কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—কড়কড় শব্দ উঠল ওর দড়ির বাঁধনে—মনে হল সে বস্ত্রাবাস বুঝি টেনে ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে এখনই কোথাও, উধাও করে নিয়ে যাবে এই খ্যাপা বাতাস।

ঝড়—উদ্দাম, প্রলয়ঙ্কর। সেই সঙ্গে বজ্রপাত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। তেমনি গুরু গুরু ডাক আকাশের।

একটু পরেই নামল জল। শুরু হয়ে গেল বড় বড় ফোঁটায় মুষলধারে বৃষ্টি। স্থলজল-এক-করা প্রবল বর্ষণ। মনে হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভগবানের গোটা সৃষ্টিটাই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মনে হল—এর বুঝি শেষ হবে না—এই দুর্যোগের শেষ হবে একেবারে তাঁদের শেষ করে।

দেখেছিলেন সে দুর্যোগ টোডরমল আগাগোড়াই—বিরক্তিতে ক্ষোভে হতাশায় বুঝি এক সময় তাঁর চোখে জলও এসে গিয়েছিল—কিন্তু এই দুর্যোগ যে সুযোগ হয়েই এসেছে, এই বর্ষা যে নেমেছে ভবানীর আশীর্বাদরূপেই—তা তো একবারও ভাবেন নি।

মনে মনে আর একবার নিজের ইষ্টদেবীকে স্মরণ করে টোডরমল প্রশ্ন করলেন, 'ঝড় যখন উঠল, জল নেমে এল চারিদিক ভাসিয়ে—তখন ঐ মূর্খ অবিশ্বাসীগুলো কী বললে রামসুভগ?'

'ওঃ, তখন যদি তাদের মুখের চেহারাটা দেখতেন একবার!···আমি ইচ্ছে করে মাসুম খাঁদের দিকে গিয়েছিলুম। দেখি মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে লোকটার—সেই জলকাদার মধ্যেই বসে পড়ে পশ্চিম দিকে ফিরে দোয়া মাগছে খোদার কাছে। কসুর মাপ করতে বলছে।'

'ঠিক হয়েছে। কিন্তু রামসুভগ—সে দেবী গেলেন কোন্‌দিকে, সেটা লক্ষ্য করেছিলে? কাছাকাছি কোথাও আছেন কিনা?'

'এমন যে হবে তা তো ভাবি নি রাজা সাহেব—তাই ওদিকে অত খেয়ালও রাখি নি। তারপর তো ঐ দুর্যোগ, তখন নিজের জান বাঁচানোই দায় হয়ে উঠেছিল, কে কার খবর রাখবে বলুন! রাত্রেও আর সময় পাওয়া যায় নি, জলে কাদায় অন্ধকারে কোথায় খুঁজব?···আজ ভোরে উঠে অনেককেই প্রশ্ন করলুম, কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারলে না। কেউই দেখে নি, খবর রাখা দরকার তাও কেউ বোঝে নি, প্রায় আমার মতই অবস্থা সকলকার।'

'হু।' একটু চুপ করে থেকে টোডরমল একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার ঘোড়াটা তৈরি করতে বল তো রামস্থভগ। এখনই একবার বেরোব।'

'আপনি—আপনি কি তাঁকে খুঁজতে যাচ্ছেন রাজা সাহেব?' সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে রামস্থভগ সিং।

'ন্-না—তাঁকে কি আর খুঁজে পাব? তিনি যে কাজ করতে এসেছিলেন—সম্পন্ন করে নিজের স্থানে ফিরে গেছেন।...আমি যাচ্ছি আমার লোকজনের অবস্থা দেখতে। কালকে যা কষ্ট গেছে ওদের ঝড়-জলে—ওদের খবর নেওয়া আমার কর্তব্য। তাছাড়া—সত্যিই মতি বদলাল কিনা ওদের সেটাও একটু দেখি বাজিয়ে!'

টোডরমল উঠে দাঁড়ালেন।

খবরটা কানে গিয়েছিল খান-ই-খানান মুনিম খাঁয়েরও।

তাঁর ওপরও প্রতিক্রিয়া হল কতকটা ঐ রকমেরই।

রাজা টোডরমলের মত তিনি ইষ্টদেবীকে স্মরণ করলেন না—কিন্তু খুশিতে যেন দিশাহারা হয়ে উঠলেন। দুই চোখ আনন্দে সজল হয়ে উঠল—যে লোকটি খবর এনেছিল তাকে তৎক্ষণাৎ একটা মোহর বকশিশ করলেন। এ ছাড়া তখনই ব্যবস্থা করলেন দ্রুততম অশ্বারোহী একজনকে বর্ধমানে পাঠাবার—পীর কুতুব শাহের আস্তানায় নানা ভোজ্যবস্তু নিয়ে পৌছে দিয়ে আসবে সে—সেই সঙ্গে দেবে একশখানা মোহর—পীর সাহেবের নজরানা।

আর একবার মুচকি হাসির একটা তরঙ্গ উঠল তাঁর অনুচরদের ঠোঁটের কোণে কোণে—চোখে চোখে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। অর্থাৎ মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে লোকটার।

কিন্তু মুনিম খাঁ তা লক্ষ্য করলেন না। অনুচরদের মনোভাব কিংবা মুখভাব নিয়ে মাথা ঘামাতে অভ্যস্ত নন তিনি কোনদিনই।

তিনি ঘোড়া বার করবার আদেশ দিলেন।

বললেন—তাঁর সিপাহীদের অবস্থা তাঁর নিজের চোখে দেখা কর্তব্য—তাদের এই দুঃখ দুর্দশার দিনে পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে তিনি তাদের কিসের সেনাপতি?

॥ ১৯ ॥

রাজা টোডরমল মুখে যা-ই বলুন না কেন—মনের কোণে তাঁর একটু ক্ষীণ আশা ছিলই—সেই দেবী-স্বরূপিণী, তাঁর ও মুঘলদের মূর্তিমতী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে দেখবার।

কিন্তু সে আশা কেমন করে সফল হবে সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না তাঁর। তাঁর সেনানিবেশের মধ্যে অবশ্য এতক্ষণ তিনি নেই—তা হলে তো তিনি শুনতেই পেতেন সে খবর।

তবে ?

তবে যে কী—তা তিনি জানেন না। তবু মনের নিভৃত একটি অংশে আশাটা পোষণ করছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মধ্যাহ্নের কিছু পরে যখন মোটামুটি সমস্ত বড় সেনানিবেশগুলো পরিদর্শন শেষ হয়ে গেল তখন তিনি অন্তরে একটা অপরিসীম ক্লান্তি অনুভব করলেন।

দৈহিক ক্লান্তি ? না, তা সম্ভব নয়। রাজা টোডরমল তিন দিন তিন রাত অশ্বপৃষ্ঠে থাকলেও ক্লান্তি বোধ করেন না।

এটা সম্পূর্ণ মানসিক—হয়ত বা ঠিক ক্লান্তিও নয়—একটা হতাশা-জনিত অবসাদ।...

সেনানিবেশের যে প্রান্তে এসে তাঁর পরিদর্শনের কাজ শেষ হল—তার সামনে জঙ্গলটা যেন হঠাৎ আরও নিবিড় হয়ে গেছে। শালবনের নীচের দিকটা সাধারণত পরিষ্কার থাকে—এখানটা ঘন আগাছায় ঢাকা। রাজা টোডরমলের মনে হল ওর ভেতর নিশ্চয় কোন ঝরনা আছে। এ ধারণা হওয়ার আরও কারণ—সামনে এক জায়গায় বনের ঘন সবুজ রেখাটা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। সম্ভবত ওটা একটা পাহাড়ের মত কিছু হবে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ পার হয়ে এসেছেন—অপরাহ্ণ বললেই হয় এখন। তাঁর মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার সময় গেছে উত্তীর্ণ হয়ে। যদি ঝরনাই থাকে তো সে কাজটা এখানে সারা যেতে পারে। নইলে নিজের তাঁবুতে ফিরতে আরও বহু বিলম্ব হবে।

তিনি ঘোড়ার লাগামটা এক দেহরক্ষকের হাতে দিয়ে একাই সেই ঘন জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলেন। ইঙ্গিতে তাদের সেইখানেই অপেক্ষা করতে বলে

গেলেন। এ-দিকটা তাঁদের দিক—এখানে শত্রু আসবার সম্ভাবনা নেই। দেহরক্ষীরাও তাই উদ্বিগ্ন বোধ করল না বা ব্যস্ত হল না।

আগাছার জঙ্গল ঠেলে একটুখানি ভেতরে যেতেই টোডরমল বুঝলেন তাঁর অনুমানে ভুল হয় নি। সামনেই একটি ছোট্ট ঝরনা। অতি ক্ষীণ অতি সামান্য তার জলরেখা, বালির মধ্য দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে—তবু ঝরনাই। স্বচ্ছ শীতল জল। চারদিকে বালি আর পাথরের ছোট ছোট উপল—তাই কালকের অত দুর্যোগের পরও জল ঘোলা হতে পারে নি।

সে জল দেখে টোডরমল প্রথম অনুভব করলেন যে তিনি শুধু ক্লান্ত নন—তৃষ্ণার্তও।

ওরই মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে তিনি জুতো আর উষ্ণীষ খুলে একটা পাথরের ওপর রেখে জলের ধারে এসে বসলেন। হাত-পা ধুয়ে মাথায় মুখে জল দিলেন। মধ্যাহ্ন-উপাসনার অনেক হাঙ্গামা—আপাতত সংক্ষেপে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে একটু জলপান করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে দু হাত জোড় করে ইষ্টদেবীকে প্রণাম করতে যাবেন—সহসা নজরে পড়ল—তাঁর থেকে কয়েক হাত দূরে একটু উঁচুতে অপূর্ব রূপসী একটি মেয়ে—সম্ভবত স্নান করে উঠেই বেশ পরিবর্তন করছে।

সামান্য একটি নিমেষ মাত্র। লজ্জায় রাজা টোডরমলের দুই কান লাল হয়ে উঠল। অনিচ্ছাতেই হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে, তবু অপরিচিতা নারীর অসম্বৃত দেহ দেখা লজ্জার কথা। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রণামে মন দিলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা মনে পড়ে গেল।

এ কি তবে সেই দেবী ? অথবা দেবীর প্রেরিত কোন সহচরী—দেবদূতী ?

কিন্তু রামসুভগ সিংয়ের বর্ণনার সঙ্গে তো কিছুই মিলছে না !

সে রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন অথবা মুসলমানী দেওয়ানার মত মালা—কিছুই তো নেই !

তবু, একমনে যখন সেই দেবীর কথাই চিন্তা করছেন, হাত জোড় করে যখন ইষ্টদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন তখনই বা ওকে দেখতে পেলেন কেন ?

আশায়, আনন্দে, সংশয়ে উত্তেজিত হয়ে রাজা টোডরমল উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু ওদিকে চাইতেও ঠিক ভরসা হয় না, সহজ ভদ্রতায় বাধে। দেবী হলে কিছু বাধা নেই, যদি কোন সাধারণ মানবী হয় ?

ছি-ছি! সে ক্ষেত্রে সে লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে ইতস্তত করতেও হল না—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটিই এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

'আমার অপরাধ নেবেন না জনাব। শালীনতা বা সৌজন্যের অভাবও মনে করবেন না। নির্জন অরণ্য—কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই দেখেই আমি স্নান করতে নেমেছিলাম।'

যেন গুরুতর একটা আঘাত পান টোডরমল। অনেকখানি আশাভঙ্গ হয় যেন।

মাথা হেঁট করেই উত্তর দেন, 'না মা, অপরাধ আমারই। কিন্তু আমি আগে দেখি নি—কাউকে দেখব আশাও করি নি।...আমি, আমি এখনই চলে যাচ্ছি—'

খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি বলে, 'বাঃ রে, এখন আপনার যাওয়ার দরকারই বা রইল কী? আমার তো স্নান হয়েই গেছে।...তা ছাড়া আমি আপনাকেই যে খুঁজছিলাম জনাব।'

'আমাকে?'

এবার বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকান টোডরমল। ভাল করেই চেয়ে দেখেন।

অপরূপ সুষমাময় মুখে স্নিগ্ধ কৌতুক। তবু তার ভেতরই একটি সকরুণ বিষাদের ছায়াও টোডরমলের বহুদর্শী অভিজ্ঞ চোখে এড়ায় না।

'আমাকে?' আবারও প্রশ্ন করেন তিনি, 'আমাকে তুমি চেন?'

'চিনি বইকি! বাদশার প্রিয়পাত্র, বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজা টোডরমলকে কে না চেনে!'

অধিকতর বিস্মিত হন রাজা।

'কিন্তু তোমার পরিচয় তো পেলাম না মা?'

'না-ই বা পেলেন জনাব। দেবার মত পরিচয় আমার কিছু নেইও।'

'তোমার পরিচয় আমি জানি না—অথচ তুমি আমার সব পরিচয় জেনে রইলে—এতে একটু অসুবিধা হয়ে থাকল যে।...যদিচ তোমার বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি একটু আছে। নবাব বাদশার প্রিয়পাত্র কে কতক্ষণ থাকে তা বলা শক্ত। আমি শাহানশা দিল্লীশ্বরের একজন দীন সেবক—এইটুকুই আমার যথার্থ পরিচয়।'

'আপনার বিনয় আপনারই যোগ্য রাজাধিরাজ। কিন্তু বৃথা বাক্যে সময় চলে যাচ্ছে—আপনার পুজার বিঘ্ন ঘটছে। পুজা না শেষ হলে আপনি তো একটু বিশ্রামও পাবেন না!'

বড় বেশী জানে মেয়েটি। বড় বেশী।

কুটিল একটা সংশয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে রাজার।

তিনি বলেন, 'কিন্তু আমাদের সেনানিবেশের এত কাছে—এই নির্জন বনে তুমি কী করছিলে—সেটা আমার জানা দরকার যে! তুমি যে শত্রুর গুপ্তচর নও—তা কী করে বুঝব? তাছাড়া তুমি আমাদের খবর অনেক রাখ দেখছি—এটা আমাদের পক্ষে অস্বস্তিকর।'

মেয়েটি আবারও হাসল। বলল, 'শত্রুর গুপ্তচর হলে সংবাদ সংগ্রহ করেই সরে পড়তাম জনাব—আপনাদের এত কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে নামতাম না। তাছাড়া—সন্দেহ হয় আমাকে কয়েদ করুন। আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমার বক্তব্যটা নিবেদন করে নিতে চাই—'

'বেশ, বল।' কুঞ্চিত ভ্রূ কিন্তু আর সরল হয় না রাজার।

'আপনার সৈন্যরা এবার অনেকটা ভরসা পেয়েছে, তারা পাঠানদের আক্রমণ করতে হয়ত রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু এই পথেই যদি আবার এগোতে যান—সেই একই বিপদে পড়তে হবে। এ-বনের প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি জানে ওরা, ঠিক জায়গা বুঝে ওত পেতে থাকবে। আকস্মিক আক্রমণে নাস্তানাবুদ করবে, অকারণে আপনাদের লোকক্ষয় হবে, আবার আপনার লোকদের মন ভেঙে পড়বে।'

'কিন্তু এছাড়া আর পথও তো নেই।'

কথাগুলো বলেন বটে—কিন্তু বলেন কতকটা অন্যমনস্কভাবেই। ভ্রূকুটি গভীরতর হয় টোডরমলের। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেন। যেন আশেপাশেই শত্রুর উপস্থিতি আশঙ্কা করেন।

'আছে পথ জনাব। আমি সে পথ জানি। কিছু লোক এখানে থাক্—শত্রুপক্ষ না টের পায়, তারপর আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এ জঙ্গল বেড়ে ওদিক দিয়ে গিয়েছে যে পথ, এর বাঁ দিক দিয়ে—সেই পথ ধরে গেলে আপনারা নানজুরা পৌছবেন। একটু ঘুর হবে বটে—পথও অনেকটা, কিন্তু নানজুরা থেকে গড়হরিপুর মাত্র এক ক্রোশ। পিছন থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর ওপর—ওরা পালাতে পর্যন্ত পারবে না। কারণ ওরা

এই দিকেই পরিখা কেটেছে, এই দিক দিয়েই আপনাদের আশঙ্কা করছে—পিছনে ওদের আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।'

টোডরমল অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মানব-চরিত্রে বহু অভিজ্ঞতা তাঁর—সে অভিজ্ঞতা বলছে, ও-মুখে ছলনা নেই। অথচ এ বিশ্বাসই বা করা যায় কী করে ?

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'তুমি যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছ না তা কী করে বুঝব ?···তুমি এই পথে নিয়ে গিয়ে আমাদের শত্রুর কবলে ফেলবে না তার কোন প্রমাণ আছে ?'

'প্রমাণ !' মুখভাব সামান্য একটু কঠিন হয় মেয়েটির। বলে, 'সদিচ্ছা বিশ্বাস করানোটাই এ পৃথিবীতে শক্ত দেখছি। মানুষের উপকার করতে গিয়েও আগে প্রমাণ দিতে বসতে হবে ! আশ্চর্য !···প্রমাণ ! প্রমাণ দিয়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত রাজা সাহেব।···বলছি তো আমাকে আটকে রাখুন। আর আমি যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই তো সঙ্গেই যাব—'

'তাতে সুবিধা কী? অতর্কিতে শত্রুর সামনে যদি পড়ি, নিজেদের সামলাতেই ব্যস্ত থাকব। তুমি যা বুদ্ধিমতী, মানবচরিত্রের এ রহস্যটাও জান নিশ্চয়।'

চুপ করে থাকে মেয়েটি। তারপর যেন মরীয়া হয়েই বলে, 'বেশ। এক জন সিপাহী দিন আমার সঙ্গে, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি—যদি সে নিরাপদে ফিরে আসে আপনার বিশ্বাস হবে তো ?'

'হয়ত হবে। কিন্তু সেটাও খুব নিশ্চিত প্রমাণ নয়। যদি আগে থাকতে সেই রকমই ইশারা থাকে তো একজন গেলে কিছুই বুঝবে না।'

এইবার বোধ হয় মেয়েটির ধৈর্যচ্যুতি হয়। সে বলে, 'দেখছি আপনার বাদশা বয়সে আপনার চেয়ে তরুণ হলেও ঢের বেশী মানুষ চেনেন। তাঁকে বিশ্বাস করানো সেই জন্যে অনেক সহজ। তাছাড়া তাঁর আত্মবিশ্বাস আছে। আপনার মত সর্বদা সন্দেহে কাঁপেন না।'

একটা কী যেন মনে পড়ে টোডরমলের। কী যেন—

কী একটা গল্প তিনি শুনেছেন। কে এক রহস্যময়ী নারীকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরা হয়েছিল। অথচ তারই কথাতে নাকি শেষ পর্যন্ত বাদশা হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়েছেন। আর সেই আগুন দেখেই নাকি দায়ুদ কররাণী পালিয়ে যান। পাটনা শহর, বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র হাতি ঘোড়া টাকা-কড়ি—একেবারে কোন আয়াস না করেই এঁদের হস্তগত হয়।

সেই সঙ্গে আরও একটা কী জনশ্রুতি যেন ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়তে চায়—অথচ ভাল করে পড়ে না।

যন্ত্রের মত উত্তর দেন টোডরমল—প্রাণপণে সেই মনে-না-পড়া কথাটা মনে করার চেষ্টা করতে করতে, 'তিনি বাদশা, মালিক। আমার দায়িত্ব ঢের বেশী মা। আমি নোকর মাত্র।'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়। ওঁর দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমারই ভুল হয়েছিল রাজা সাহেব। আপনার ওপরওলা খান-ই-খানানের কাছে কথাটা বললে তিনি এক লহমাও ইতস্তত করতেন না।···বেশ, আমি চললাম, পথের কথা বলে দিয়ে গেলাম। আপনি বরং মুনিম খাঁকেই বলবেন। আমার বর্ণনা দিয়ে বলবেন যে এমনি একটি মেয়ে আফগানদের গুপ্তচর হয়ে এসে আমাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল—। তারপর তিনি যা বলেন তাই করবেন।'

মেয়েটি চলে যাবার উপক্রম করতে টোডরমল বিদ্যুৎগতিতে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন, 'একটা কথা। কাল শুনেছি কে এক সন্ন্যাসিনী দেবী এসে আমাদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে সিপাহীদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন, তিনি নাকি কালকের অকাল কালবৈশাখীরও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তুমিই কি সেই সন্ন্যাসিনী ?"

মেয়েটি আবারও হাসল। বলল, 'আমি দেবী তো নইই, আর সন্ন্যাসিনীও যে নই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছে অস্পৃশ্যা—যবনী ক্রীতদাসী মাত্র। বাঁদীর নাম নফিসা। আদাব জনাব!'

নফিসা চলে গেল। ঝরনার পথ ধরে উঁচু টিলাটায় উঠে গেল সে।

দেখতে দেখতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টোডরমল চিন্তিতমুখে আবার গিয়ে ঝরনার ধারে বসলেন।

ইষ্ট প্রণাম সেরে—দুই আঁজলা সেই সুমিষ্ট কাকচক্ষু জল পান করে কিছুটা সুস্থ হলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল কথাটা—যেটা মনে করার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করছেন।···

এইখানে এসেই গুজবটা শুনেছিলেন। তখন বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করেন নি বলেই ভুলে গিয়েছিলেন সম্ভবত।

খান-ই-খানান মুনিম খাঁর কথা।

কে এক অপরিচিতা তরুণী বেদের মেয়ের জন্য নাকি মুনিম খাঁ পাগল হয়ে উঠেছেন কিছুদিন থেকে। ইদানীং গুরুতর রাজকার্য যুদ্ধ সব-কিছু ছেড়ে শুধুমাত্র তাকে খোঁজ করার জন্যই নাকি সমস্ত শক্তি, সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত করেছেন। তেলিয়াগড়ির কাছে যুদ্ধ-শিবিরেই নাকি তার দেখা পান প্রথম, সে-ই রাজমহলের পাহাড় ঘুরে পথটা দেখিয়ে দেয়—তাইতেই নাকি বিনা রক্তপাতে গুরুন্দার অবরোধ দখল করেন মুনিম খাঁ।

সে সময় যে পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হয় নি—তারও নাকি এই কারণ। সে সময়ে মুনিম খাঁ তাকেই খুঁজছিলেন, শত্রুর কথা ভেবে দেখতে পারেন নি।...

তবে কি এ-ই সেই রহস্যময়ী?

কিন্তু কালকের সে সন্ন্যাসিনীই বা গেলেন কোথায়?

এঁর সঙ্গে কি তাঁর কোন সম্পর্কই নেই?

জঙ্গলের ঘন পত্রাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘোড়ায় উঠতে যাবেন, পিছনে একাধিক ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে টোডরমল চমকে উঠলেন।

কোমরের তলোয়ারে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সবাই। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অভিবাদনে মাথা হেঁট করতে হল।

খান-ই-খানান মুনিম খাঁ।

মাত্র চারজন দেহরক্ষী নিয়ে ছুটে আসছেন।

টোডরমলের আর ঘোড়ায় চড়া হল না। তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রধান সেনাপতির।

জঙ্গলের পথে যতটা দ্রুত আসা যায় প্রায় ততটাই আসছিলেন মুনিম খাঁ। এঁদের দেখে প্রাণপণে লাগাম টেনে ঘোড়ার বেগ সংযত করলেন।

উত্তেজনায় বৃদ্ধের মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। কিসের একটা আশায়ও যেন দুটি চোখ জ্বলছে। কাছে এসে টোডরমলকে চিনতে পেরে কোন রকম ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, 'রাজা সাহেব, এই পথে কোন দিওয়ানা ফকিরনীকে দেখেছেন?...কাল থেকে সে আমাদের ফৌজী শিবিরে শিবিরে ঘুরছে—শুনেছেন তার কথা কারও মুখে?'

'না জনাব, আমিও তাঁর খোঁজেই এসেছিলাম। কিন্তু কোথাও তাঁর কোন খবর পেলাম না।'

'পেলেন না? আপনি নিজে খবর নিয়েছিলেন—তবুও পেলেন না? তাই তো!'

স্পষ্ট হতাশা মুনিম খাঁর কণ্ঠে।

'তাকে যে—তাকে যে আমার বড় দরকার!'

'তাকে পাই নি বটে—কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ আগে এক অদ্ভুত নারীর দেখা পেয়েছি জনাব। মনে হল সে আপনাকে চেনে। তার কথাটাও আপনাকে বলা দরকার।'

'নারী? আর এক নারী—আমাদের শিবিরে?—আসে কেমন করে এত মেয়েছেলে? কেউ কি পাহারা দেয় না?'

রুষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মুনিম খাঁ। হতাশার ক্ষোভটা বিরক্তির আকারে কারও ওপর প্রয়োগ করতে পারলে বাঁচেন যেন তিনি।

একজন সেনানায়ক সঙ্গেই ছিলেন, তিনি বললেন, 'ওই ফকিরনীকেই কাল শুধু আসতে দেওয়া হয়েছিল জনাব—ওঁকে দেখে তেমন কোন সন্দেহ হয় নি বলেই—তা ছাড়া শুনেছি কী একটা নিশানীও উনি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাও নজরে নজরেই রাখা হয়েছিল। বরাবরই একজন সান্ত্রী সঙ্গে ছিল। কেবল বিকেলে ঝড়টা উঠতেই আর নজর রাখা সম্ভব হয় নি।...কিন্তু আর কাউকে তো—'

'থাক্। ঢের হয়েছে।...একটা অকর্মণ্যতা ঢাকতে গিয়ে নতুন অকর্মণ্যতার পরিচয় দিও না।...হ্যাঁ, কী বলছিলেন রাজা সাহেব? কী বলেছে সে মেয়ে-ছেলে?'

'দয়া করে যদি একটু নির্জনে আসেন তো ভাল হয়। সে কথা সকলের সামনে আলোচনা না করাই বোধ হয় ভাল।'

কৌতূহলী মুনিম খাঁর চোখে যেন নতুন করে আশার সঞ্চার হয়।

তিনি ঘোড়া থেকে নেমে গাছপালা সরিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন টোডরমলের সঙ্গে।

জঙ্গলের ধারে পৌঁছে টোডরমল সংক্ষেপে বিবৃত করলেন মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই উত্তেজিত খান-ই-খানান ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন: 'সেই! সেই! সে মেয়েটি কোথায়

গেল রাজা সাহেব? কোথায় গেল সে?…ছেড়ে দিলেন তাকে? ছেড়ে দিলেন? তাকে খুঁজে পাবার জন্য যে আমি সারা দুনিয়া তোলপাড় করছি!'

টোডরমলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

তিনি অকারণে একটু কুণ্ঠিতও হয়ে পড়েন। বলেন, 'তা তো আমি জানি না জনাব। অপরিচিতা মেয়ের মুখে এ-ধরনের প্রস্তাব—বিশ্বাস করবার তো কথা নয়!…তবু তার কাছে আমি তার বিশ্বস্ততার সামান্য একটু প্রমাণই চেয়েছিলাম, একেবারে উড়িয়ে তো দিই নি—'

'এ মেয়ে আমাদের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী রাজা সাহেব—এ-ই কাল ফকিরনীর বেশে এসে আমাদের সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে গেছে।…আপনি বুঝতে পারলেন না—নইলে সে এর মধ্যে আসবে কেমন করে।…ইস্, আমি যে কথাটা শুনেই বেরিয়ে পড়েছিলাম রাজা সাহেব, তাকে ধরব বলে। তাকে যে আমার বড় দরকার!'

এই আকুলতার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ ছিল তাতে ঈষৎ বিরক্ত বোধ করলেন টোডরমল। বললেন, 'এত ইতিহাস তো আমার জানবার কথা নয় জনাব। সাধারণভাবে এ প্রস্তাব শুনলে যা করা উচিত আমি তাই করেছি।'

'না না—আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না রাজাসাহেব।' একটু অপ্রতিভভাবে বলেন মুনিম খাঁ,—'এ আমার নসিবের দোষ!…কিন্তু সে গেল কোথায়?'

'এই দিকে—এই টিলাটার ওপর দিকে চলে গেছে সে।…চলুন না খুঁজে দেখি—কত দূর আর যাবে?'

'চলুন। কিন্তু তাকে ধরতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। গত ক-মাস সে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আছে তবু তাকে ধরতে পারি নি। সে আমাদের দেখে, আমরাই দেখতে পাই না।…সে নিজে ধরা না দিলে ধরা যাবে না রাজা সাহেব।'

তবু তাঁরা দুজনেই যান। ঝোপঝাড় সরিয়ে লতাপাতা ডালপালার আবরণ ভেদ করে সে-টিলার প্রত্যেকটি পাথরই খোঁজ করেন বলতে গেলে—টিলার ওপারে নেমে যান তার সন্ধানে—কিন্তু কোথাও খুঁজে পান না তাকে। সে রহস্যময়ী নারী যেন বাতাসে উবে গেছে।

অবশেষে ফিরে এসে খান-ই-খানান তাঁর দেহরক্ষীদের হুকুম দেন—

এখনই এই শিবিরের সর্বত্র, মুঘল সেনানিবেশের চারিদিকে বনের মধ্যে—যতটা নিরাপদে খোঁজ করা যায় খোঁজ করতে। অন্তত পাঁচশ লোক যেন বেরিয়ে পড়ে এখনই। যে ধরে আনতে পারবে বা সন্ধান দেবে তাকে তিনি একশ মোহর বকশিশ করবেন। তবে তাকে কোন রকম অসম্মান না করা হয়—তাঁর নিজের কোন অন্তঃপুরিকা হলে তারা যেভাবে সম্ভ্রমসূচক আচরণ করত—তেমনিই যেন করে।

হুকুম দিলেন, লোকও লেগে গেল—কিন্তু এ অনুসন্ধানের ওপর মুনিম খাঁ কোন ভরসা রাখলেন বলে বোধ হল না। তাঁর মুখ-চোখে যেন একটা সুগভীর ক্লান্তি—একটা অবসন্নতা।

বোধ করি একটা হতাশাও।

দুজনে নীরবে নিজেদের তাঁবুর দিকে ফিরলেন।

খান-ই-খানানের প্রাপ্য মর্যাদা হিসেবে রাজা টোডরমল তাঁর তাঁবুর প্রবেশপথ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অবশেষে একেবারে সামনে গিয়ে মুনিব খাঁ ঘোড়া থেকে নামতে টোডরমলও নেমে পড়লেন। তারপর দস্তুর-মাফিক বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে খান-ই-খানান যখন তাঁবুতে ঢুকতে যাবেন তখন সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে টোডরমল প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কী জনাব? আপনি কি মনে করেন ওই—ওই মহিলার নির্দেশ শোনাই আমাদের উচিত?'

'অবশ্যই। এ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ আছে নাকি? আপনি ওর কথা হদিসের মতই সত্য বলে মনে করতে পারেন।...বিশ্বস্ত জন-দুই লোক এখনই পাঠিয়ে দিন—এই জঙ্গল ঘুরে যেমন বলেছে তেমনি গিয়ে নানজুরা পর্যন্ত ঘুরে আসুক। যদি পথ ঠিক থাকে তাহলে পরশু ভোরেই আমরা রওনা হব।'

যে কৌতূকটা মনের মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠেছিল তা আর গোপন করতে পারলেন না টোডরমল। বললেন, 'উনিই যদি কালকের সেই সন্ন্যাসিনী বা দেবী হন—তাহলে উনি বললেন কেন উনি মুসলমানী আর বাঁদী!...ওঁর সত্য পরিচয়টা—যদি বাধা না থাকে—বলবেন?'

'ও মিথ্যা কথা বলে না রাজা সাহেব। যা শুনেছেন তা ঠিকই শুনেছেন। ও বাঁদী, ওর নাম নফিসা।'

'কিন্তু তাহলে তিনি অমন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কী করে?'

'সেটা আমিও জানি না। হয়ত সাধারণ অভিজ্ঞতা, হয়ত বাতাসের গতি দেখে, আকাশের রঙ দেখেই টের পায় ওরা। শুনেছি এমন আরও কেউ কেউ বলেন, সে সব ঠিক আমি জানি না। তবে এটা জানি যে সে মিথ্যা বলে না এবং তার মত শত্রু আফগানদের আর নেই। সুতরাং আমরা নির্ভয়ে ওর কথামত কাজ করতে পারি।'

কৌতূহল তবু থেকেই যায়।

'কিন্তু এইটুকু ছাড়া আর কোন কথাই কি জানা যায় না ওর সম্বন্ধে জনাব?'

'আর যেটুকু জানি—সেটা আর-একদিন আপনাকে বলব রাজা সাহেব। আজ মাফ করবেন। বড়ই ক্লান্ত আমি।···আর সন্ধ্যারও তো বেশী দেরি নেই —নমাজের সময় হয়ে এল।'

খোজা প্রহরীরা তাঁবুর পরদা সরিয়ে অপেক্ষা করছিল অনেকক্ষণ থেকেই— খান-ই-খানান আর-একবার আঙুলটা কপালে ঠেকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

তাঁর চলে যাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন টোডরমল। এবার তিনিও ঘোড়ায় চাপলেন। সত্যিই সন্ধ্যার আর বড় দেরি নেই। প্রথম ফাল্গুনের অপরাহ্ণ বহুক্ষণ ম্লান হয়ে এসেছে—বাতাসে ঈষৎ শীতের আমেজ ঘোষণা করছে রাত্রিরই আসন্ন আবির্ভাব।

তিনিও ক্ষুৎপিপাসার্ত। তাঁরও সন্ধ্যা-পূজার সময় হয়ে এসেছে।

টোডরমল নিজের তাঁবুর পথ ধরলেন!

॥ ২০ ॥

একই সঙ্গে দুটো খবর পেলেন দায়ুদ খাঁ কররাণী। গুপ্তচর চিরকাল সব রাষ্ট্রব্যবস্থারই অঙ্গ—চিরদিন ছিল এবং চিরদিন থাকবে। কিন্তু তাদেরও শক্তির সীমা আছে। দিওয়ানা নারীর অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদটা যখন এসে পৌঁছল, তার মাত্র একদণ্ড আগেই খবর পেয়েছেন তিনি—সামনের কয়েক পংক্তি সৈন্য ঠিক রেখে অধিকাংশ সেনা নিয়ে দীর্ঘতর বর্তুল পথ ঘুরে মুঘলরা নানজুরা পৌঁছেছে। নানজুরা এখান থেকে মাত্র এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

প্রথম সংবাদটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না দায়ুদ একেবারেই। এ-পথের খবর তিনিও জানতেন না, কোন গুপ্তচরই জানায় নি তাঁকে। বাধা দেবার ব্যবস্থা

দূরে থাক্—তিনি সেদিকে কোন পাহারা পর্যন্ত রাখেন নি। তাই প্রথমটা এই সংবাদে বিহ্বলই হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয় খবরটাতে আর বিস্ময় বোধ করলেন না। এমন কী প্রথম সংবাদটাও এবার পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। বরং মনে হল এটাই আগে ভাবা উচিত ছিল তাঁর। দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয় তেমনিই এ দুটো সংবাদে ঘনিষ্ঠ ও অবশ্যম্ভাবী কার্য-কারণ সম্পর্ক।

খবরটা শুনে একটু হাসলেনও দায়ুদ খাঁ কররাণী। বিচিত্র, দুর্বোধ্য হাসি—একটু বা সকরুণও। তবে আর দ্বিধা করলেন না, এটাও ঠিক। তাঁর ভাগ্য আরও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন যেন। কিন্তু ভয় পেলেন না। ভয় আর তিনি পাবেন না। অজ্ঞাতকেই বেশী ভয় মানুষের, জ্ঞাত সর্বনাশের সামনে অনায়াসে দাঁড়াতে পারে অনেকেই।

ভাগ্য তিনি টের পেয়েছেন। ওই সর্বনাশিনী যখন আবারও মুঘলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি হারবেনই। কিন্তু এর আগের বারের মত বিনাযুদ্ধে হার মানবেন না বা পালাবেন না। হাজীপুর কিলায় আগুন লাগবার দৃশ্য দেখে যে ভাবে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পালিয়েছিলেন, যে ভাবে গুরুন্দার মাঠ থেকে পিছু হটেছিলেন অকারণে, আজও সে কথা মনে পড়লে লজ্জা বোধ হয় তাঁর—নিজের অনুচর কর্মচারীদের দিকে তাকাতে পারেন না যেন। সে লজ্জার কারণ আর তিনি ঘটতে দেবেন না। হারতে হয় মানুষের মত হারবেন—মরতে হয় বীরের মত মরবেন, সুলেমান করবাণীর ছেলের মতই।

ভয় তিনি ঢের পেয়েছেন। আর নয়।

ওই মৃত্যুরূপিণী সর্বনাশিনী নারী তাঁকে অনেক খেলাই দেখিয়েছে—এবার তিনি ওকে কিছু খেলা দেখাবেন। মৃত্যুই আসুক আর সর্বনাশই আসুক, তার মুখের সামনে তুড়ি মেরে চলে যাবেন তিনি। তাকে উপেক্ষা করে যাবেন।...

উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল অনুচররা সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে সংবাদটার প্রতিক্রিয়ার।

কিন্তু সুলতানের সে সম্বন্ধে কোন সচেতনা আছে বলে মনে হল না। তাঁর চোখ তখনও সংবাদদাতার মুখের ওপর নিবদ্ধ বটে—দৃষ্টি যে তাতে নেই তা যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারে।

তাঁর দৃষ্টির সামনে তখন একমাত্র সেই সর্বনাশিনী।

বহু বিপদ, বহু লজ্জা, বহু অপমানের কারণ যে—সমস্ত সর্বনাশের মূল—তবু

আজ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন দায়ুদ—তার সম্বন্ধে তাঁর মনে আজ যেন কোন উষ্মা, কোন ক্ষোভ, কোন অনুযোগ নেই। তাকে তিনি ক্ষমাই করেছেন। অবশ্য যদি তাকে ক্ষমা করার কোন অধিকার তাঁর থাকে।...

অবশেষে গুজর খাঁই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। গুজর খাঁ সুলেমান কররাণীর আমলের রণকুশলী সেনাপতি, আফগানবাহিনীর প্রধান ভরসা।

গুজর খাঁ বললেন, 'তাহলে এখন কী করবেন জাহাঁপনা ?'

'করব !' যেন তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠেন দায়ুদ কররাণী।

তারপর উপস্থিত সকল শ্রোতাকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি বলেন, 'যুদ্ধ করব। এমনভাবে অপেক্ষা করে আর বসে থাকব না। যা হয় এসপার-ওসপার হয়েই যাক।...আমরাই আগু বেড়ে ওদের আক্রমণ করব। এখন বলুন আপনারা, কীভাবে এগোন উচিত হবে।'

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তারপর কথা বলেন কতলু খাঁ লোহানী—বলেন, 'যদি আগু বেড়ে যুদ্ধ দিতে হয়—তুকারয়ের মাঠই হচ্ছে প্রশস্ত। আমরা যদি একটু তাড়াতাড়ি কুচ করে যাই, তা হলে ওরা টের পাবার আগেই পৌছব। পিছনে একটা টিলা আছে,—পাশে ছোট পরিখাও আছে—ওখানে গিয়ে ব্যূহ রচনা করার সুবিধা হবে। আমরা ভাল করে বসতে পারলে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না—ওরা আসতে আসতে আমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

'তুকারয় !' মুহূর্তকাল মৌন থাকেন দায়ুদ কররাণী। তারপর গুজর খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'আপনি কী বলেন গুজর খাঁ সাহেব ?'

'মন্দ কী ! অনেক প্রাকৃতিক সুবিধা আছে বটে।'

'তবে তাই হোক। আমরা আজই যাতে রওনার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে পারি সেই-মত হুকুম দিন। খুব হুঁশিয়ার কিন্তু—যাত্রার আগে আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা কেউ টের না পায়।'

এই বলে আর-একটু থেমে কতলু খাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু যেন কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন, 'একটা কথা কিন্তু--আমার হারেম, আমার দরকারী কাগজপত্র এবং কিছু কিছু ধনরত্নও আমি সরিয়ে দিতে চাই। আপনি আপনার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসী জনকতককে বেছে নিয়ে এই কাজের ভার দিন— যারা প্রাণ দেবে তবু আমার এতটুকু লোকসান করবে না।'

আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী করে তাঁর মনে পড়ছে শ্রীহরির কথা। বিশ্বস্ত

হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীহরি। সে থাকলে আজ কিছুই ভাবতে হত না। কিন্তু সেও আজ নেই। হয়ত বা আকাশের লেখা আগেই পড়তে পেরে সে সরে দাঁড়িয়েছে। মেদিনীপুরে পড়বার মুখেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সুদূর সুন্দরবনে। মানুষের চেয়ে বাঘকে ভয় কম—এই কথাই বলে গেছে সে।

'কোথায় পাঠাতে চান?' কতলু খাঁ প্রশ্ন করেন।

'একেবারে কটক।'

এবার যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন কতলু খাঁ। এতক্ষণে যেন তাঁর অভ্যস্ত ও পরিচিত মনিবকে খুঁজে পান খানিকটা। যে-লোক এতকাল কোনরকম যুদ্ধ দেবার আগেই পালিয়ে আসছে বার বার—তার মুখে আগু-বেড়ে শত্রুকে আক্রমণ করবার কথা শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তাঁর।

'ঠিক আছে। আপনি ওঁদেরও প্রস্তুত হতে বলুন। আমি গাড়ি পাল্কির ব্যবস্থা করছি।'

॥ ২১ ॥

তুকারয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি পৌঁছেও কেন যে মুনিম খাঁ ওইটুকু ইতস্তত করেছিলেন, কেন যে তখনই দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার হুকুম দেন নি—তা আজও কেউ জানে না।

তিনি নাকি জ্যোতিষীর দোহাই দিয়েছিলেন! পাঁজির হিসেবে তিথি-নক্ষত্র-ফল নাকি সেদিন মুঘলদের অনুকূল ছিল না। কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোথা থেকে এমন জ্যোতিষী আর তার পাঁজীপুঁথি এল কেউ জানে না।

অধীর অসহিষ্ণু টোডরমল ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তুঘরীল খাঁ নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেললেন, তবু মুনিম খাঁর কাছ থেকে সেই বিশেষ আদেশটি বেরোল না।

তাঁর উৎসুক দুটি চোখ বার বার যেন কাকে খুঁজে নিজেদের শিবিরের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার দূর-দিগন্তের ঘনসবুজ বনরেখায় ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল—তিনি যেন কাউকে আশা করছেন, কারুর নির্দেশ, কারুর উপদেশ—ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতটা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি হুকুম দিতে পারছেন না কিছুতেই।

কিন্তু দায়ুদ খাঁ কররাণী মুঘলদের অনুকূল তিথি-নক্ষত্রের জন্য অপেক্ষা

করলেন না। তিনি হুকুম দিলেন নিজের সৈন্যদের অগ্রসর হবার। হুকুম দিলেন গুজর খাঁকে সর্বাগ্রে তাঁর করি-বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার।

দায়ুদ খাঁর এই সাহস এবং শৌর্যে বিস্মিত হল অনেকেই। বিশেষত যে পুরাতন সেনানায়ক সর্দাররা তাঁর পিতার আমল থেকে তাঁকে দেখেছেন—যাঁরা পাটনা ও গুরুন্দাতে তাঁকে ছায়ার ছায়ায় কাঁপতে দেখেছেন ফাল্গুন-শেষের শুকনো বাঁশপাতার মত—তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা এই অঘটনটা খোদার দয়ার ওপরই আরোপ করে নিশ্চিন্ত হলেন। যিনি ইচ্ছামাত্র মূককে বাচাল করতে পারেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করতে পারেন—তাঁর পক্ষে কাপুরুষকে সাহসী করা এবং নির্বোধকে বুদ্ধিমান করা এমন কি আর কঠিন কাজ!

হয়ত তাই। হয়ত ঈশ্বরেরই দয়া।

অথবা তাঁর ন্যায়বিচার। তাঁর রোষ।

সেদিনের সে বিচিত্র যোগাযোগ হয়ত তাঁরই সংঘটন।

তবে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক—অন্তত কাপুরুষতার লজ্জা থেকে তো মুক্ত হতে পারলেন তিনি।

এমন কি যুদ্ধের শেষেও দায়ুদ খাঁ কররাণী সেদিনের সে প্রেরণাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলেই মনে করেছিলেন।...

যুদ্ধের আগের দিন। অপরাহ্ণের আবছা আলোতে নিজেদের সৈন্য সংস্থাপন নিজের চোখে দেখতে ও তদারক করতে বেরিয়েছিলেন দায়ুদ খাঁ। মুঘলরা তখনও এসে পৌছয় নি—তবে আসবার দেরিও নেই এ খবরটা পেয়েছেন তিনি। তাদের আগমনের আভাসস্বরূপ প্রথম অশ্বপদ-শব্দের দিকে কান পেতে আছেন সকলেই। আর হয়ত ক-দণ্ডের মধ্যেই ওরা পৌছে যাবে।

এই অবস্থায় নিজেদের ব্যূহের একেবারে সীমানা দিয়ে যাচ্ছিলেন দায়ুদ। সুতরাং ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বার বার দূরের বনরেখার দিকেই গিয়ে পড়ছিল। কে জানে—শত্রুর কোন অগ্রগামী ক্ষুদ্র দল এসে পড়তে কতক্ষণ!

সেইভাবে চাইতে চাইতেই হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটি কৌতূহলী শিবা সহসা তার অরণ্যের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরের প্রান্তরে এসে তাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দায়ুদ খাঁর শিকারী রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাল্যে আর

কিছু না করুন—শিকারটা করেছেন। এ সংস্কার তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর যোজনা করলেন।

কিন্তু শিয়ালটাও ততক্ষণে স্থির হয়ে নেই, সে নিজের বিপদ বুঝতে পেরে বনের দিকে দৌড়তে শুরু করেছে। তার পিছনে পিছনে দায়ুদ খাঁও—স্থান কাল, বনের ছায়ায় শত্রুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সব ভুলে—ছুটতে লাগলেন।… তবু হয়ত সে জীবটি অনায়াসেই গাছের ছায়ায় অদৃশ্য হত, যতই তৎপর হোন দায়ুদ, শিয়ালের সঙ্গে ছোটা তাঁর সাধ্যে কুলোত না—কিন্তু ঠিক বনের প্রান্তে পৌঁছতেই আর-একটি তীর যেন আকাশ থেকে এসে বিঁধল তার পিঠে, সে-তীর সুদ্ধ মাটিতে গেঁথে গেল সে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দায়ুদ—কিছুটা আতঙ্কিতও।

বনের মধ্যে থেকে যে তীর ছুঁড়েছে সে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের লোক—মুঘলদের। দেহরক্ষী কজন সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু তারা অনেক পিছনে। দায়ুদ কোষ থেকে তরবারি বার করতে করতেই ঈষৎ চকিতচোখে চেয়ে দেখলেন—সামনেই একটা সেগুনগাছের ডালে এক নারীমূর্তি!

একবার মাত্র দেখা হলেও সেই ভয়ঙ্কর রাত্রের সে নারীকে ভোলেন নি তিনি। এ তাঁর জীবনের অভিশাপ, মূর্তিমতী সর্বনাশ। এই নারীর জন্যই তিনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—এর জন্যই তাঁর যত লজ্জা, যত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে।

চোখোচোখিও হল বইকি!

সন্ধ্যার আবির্ভাব সূচিত হয়েছে কিন্তু তার আঁধারের আঁচল দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে পারে নি—এখনও পশ্চিম আকাশে দিবসের শেষ স্মৃতিটুকু জেগে আছে। সে আলোতে পরস্পরকে চিনতে অসুবিধা হল না কারুরই।

আর চিনতে পেরে খিলখিল করে হেসে উঠল সে মেয়েটি। অবজ্ঞার হাসি, বিদ্রূপের হাসি।

তার মধুক্ষরা কণ্ঠের সে হাসি অরণ্যের স্তব্ধতায় প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে ছড়িয়ে পড়ল সেই প্রান্তরের এক দিক থেকে আর-এক দিকে—বহুদূর অবধি।

দায়ুদ কররাণীর সঙ্গী ইয়ার বেগ তাঁর বর্শা উঁচু করে ধরলেন, গুজর খাঁর চোখে ঘনিয়ে এল নিরুদ্ধ রোষের প্রলয়বহ্নি।

দায়ুদ খাঁর মুষ্টিও ধনু ও শায়কে বজ্র-বদ্ধ হয়ে উঠল একবার। কিন্তু তিনি প্রাণপণে নিজেকে দমন করলেন। সেই সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন

সঙ্গীদেরও। এ তাঁর প্রাপ্য। ওই নারীর কাছে এ লাঞ্ছনা ও অপমান—তাঁর কাছে খোদারই বিচার।

মাথা হেট করে চলে এলেন সেখান থেকে।...

কিন্তু সম্ভবত সেই জ্বালাই তাঁকে স্থির থাকতে দিল না।

তাঁর চিরকালের অভ্যাস ত্যাগ করে সমস্ত সতর্কতাকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে তিনিই এবার আক্রমণ করলেন মুঘলদের। অবরোধের মধ্যে বা পরিখার মধ্যে নিজেদের বাঁচবার বা নিজেদের ব্যূহকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টামাত্র করলেন না।

ওকে দেখিয়ে দেবেন—ওই পিশাচীকে যে—মরতে বা মারতে কিছুতেই দায়ুদ খাঁর ভয় নেই। তিনি পুরুষ-বাচ্চা, পুরুষ। কাল ওকে ছেড়ে দিয়েছিলেন অনুগ্রহ করেই—নারীর প্রতি পুরুষের চিরকালীন অনুগ্রহ ও অনুকম্পা!

॥ ২২ ॥

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ। প্রত্যূষকাল।

আফগানবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুঘলদের উপর।

কিন্তু মানুষে মানুষকে আক্রমণ করল না। মুঘল সৈন্য সভয় বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, বৃহদাকার পর্বতপ্রমাণ বীভৎসাকৃতি দৈত্য কতকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের ওপর। কী এ? কী এগুলো?

এ-ই হল গুজর খাঁর কৃতিত্ব। এই সকল দানবাকৃতি পর্বতগুলিকে নিয়ে তিনি বহুদিন অপেক্ষা করেছেন—বহুদিন ধরে এদের পুষেছেন। কৃতিত্ব দেখানোর অবসর পান নি।

আসলে এ সেই সুলেমান কররাণীর বিখ্যাত করি-বাহিনী।

কিন্তু শুধু হাতি নয়—হাতি দেখে আর কোন সৈন্য ভয় পায় না—তা গুজর খাঁও জানেন—তিনি আর একটু মাথা ঘামিয়েছেন।

তিব্বত ভোট্‌রাজ্য ও অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বহুদিন ধরে তিনি সংগ্রহ করেছেন—য়্যাক্ গরু, ভল্লুক আর পাহাড়ী ছাগলের চামড়া—ধূসর, কৃষ্ণ, তাম্রাভ, নানাবর্ণের—কিন্তু প্রত্যেকটিই লোমশ, লোমবহুল। সেই

চামড়া আজ কাজে লেগেছে—আজ জড়ানো হয়েছে প্রতিটি হাতির মাথায়, শুঁড়ে ও দুই দাঁতে। এমন ভাবেই জড়ানো হয়েছে যে সেগুলো অন্য পশুর চামড়া বলে চেনা যায় না—সহসা দেখলে মনে হয় দানবগুলোর এ সহজাত বর্ম। ভয়ঙ্কর, ক্রুর, জিঘাংসাময় একরকমের রাক্ষস এগুলো—আর এই এদের উপযুক্ত দেহসজ্জা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল রাক্ষসগুলো।

শান্ত নীরব পদক্ষেপ ; এদের সকল-শক্তি-আয়োজিত সমস্ত রকমের বাধা সম্বন্ধেই তারা যেন ভ্রূক্ষেপহীন, উদাসীন। অবাধ, অমোঘ তাদের গতি। সামনের সশস্ত্র মানুষগুলোর প্রতি চরম উপেক্ষা আর অবহেলা।

অতর্কিত আক্রমণ আসন্ন—এই সংবাদ পেয়েই মুঘলরা দ্রুত এক রকম করে ব্যূহ রচনা করে নিয়েছিল। তাদের আশা ভরসা সবচেয়ে বেশী ঘোড়-সওয়ারদের ওপরই ; তারাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী, সবচেয়ে সাহসী, শক্তিশালী। তাই তাদেরই দিয়েছিল সকলের আগে—পুরোভাগে। বর্শা, তরবারি, তীর-ধনুক—তার সঙ্গে ছিল কারুর কারুর হাতে নতুন আমদানী আধুনিক অস্ত্র—বন্দুক পর্যন্ত। ঘোড়সওয়ার আগে তার পিছনে ছিল পদাতিক—প্রাচীরের আড়ালে আত্মগোপন করার মত।

কিন্তু অশ্বারোহীদের অবস্থাই কাহিল যে। আরও অবস্থা কাহিল তাদের ঘোড়াগুলোর জন্যই।

পাহাড়ের মত বিপুল আর দানবের মত ভয়ঙ্কর ওই জীবগুলোকে ওইভাবে এগোতে দেখে ঘোড়ারা গেল বিষম ভয় পেয়ে।

তার ওপর অকস্মাৎ একবার ওই জীব বা রাক্ষসগুলো উঠল গর্জন করে।

বৃংহিতিমাত্র, কিন্তু মুঘলবাহিনীর অধিকাংশই কখনও হাতির ডাক শোনে নি। যারা শুনেছিল তাদেরও সে কথা এখন এই আতঙ্কের মধ্যে মনে পড়ল না। সে ডাক মনে করে রাক্ষসগুলোকে হাতি বলে চেনবার মত অবস্থা নয় তাদের। তাছাড়া ঘোড়াগুলো তাদের ভাববার অবসরও দিল না। তারাও চিৎকার করে উঠল ভয়ে—তারপর সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে পিঠের সওয়ার-গুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করল বারকতক—কিছু কিছু লোক তাইতেই খতম হয়ে গেল—তারপর সে চেষ্টা ছেড়ে পিছু হঠে ও সোজা পিছন ফিরে পালাতে শুরু করল। তাদের পায়ের চাপেই বহু পদাতিক ঘায়েল হল। ফলে তারাও আর সহ্য করতে না পেরে পড়ল ছত্রভঙ্গ হয়ে। আর-

একবার ছত্রভঙ্গ হলে যা হয় তাই হল—ভয়ে দিশাহারা হয়ে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

সেনাপতিরা প্রথমটা তাদের ফেরাতে চেষ্টা করলেন প্রাণপণে। কিন্তু বন্যার স্রোত একার শক্তিতে সামলানো যায় না—বাধা দিতে গিয়ে তাঁরাই ভেসে চলে গেলেন। গেলেন না শুধু একজন কিছুতেই। তিনি রাজা টোডরমল। স্বস্থানে অবিচলিত থেকে অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী নিয়েই প্রাণপণে লড়তে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে বিশেষ মনোযোগও দিল না কেউ। এক সিকান্দার বেগ তাঁকে সামলাতে লাগলেন, বাকী সকলে বিজয়োল্লাসে মুঘলদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। এত অনায়াসে জয়লাভ করবে তারা, তা কেউ ভাবে নি।

যেমন বিনা যুদ্ধেই এতকাল হেরে এসেছে—তেমনি প্রায় বিনাযুদ্ধেই এবার জিতল।

সামনে লুঠ—সেই আগ্রহেই পিছু নিল তারা মুঘলদের। হয়ত প্রচ্ছন্ন প্রতিশোধ-স্পৃহাও ছিল। এতকালের অপমানের প্রতিশোধ। তবু লুঠের আগ্রহই বেশী—বহুদূর পিছিয়ে গিয়েছে মুঘলরা—তাদের অরক্ষিত জনশূন্য তাঁবু সামনেই পড়ে—বহু ধনরত্ন তাতে। আর কিছু কিছু নারীও—

ছুটেছিলেন ওসমান খাঁও—কতলু খাঁ লোহানীর পরমাত্মীয়, বীর তরুণ সেনানায়ক। চোখে তাঁর প্রতিশোধের আগুন—মুখে উত্তেজনার আনন্দের আশার রক্তিমা। অনেকক্ষণ মাথা নত করে থেকেছেন—অকারণে, নিজের বিনা অপরাধে। আজ তাঁর শোধ নেবার পালা। আজ চাকা উল্টে গেছে। এতদিনের এত অপমানের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবার দিন আজ।

কিন্তু সেই বিদ্যুৎগতির মধ্যেই সহসা কে আরও দ্রুত ঘুরে এসে দাঁড়াল পথ রোধ করে!

কে এ, কার এত স্পর্ধা!

ভীষণ ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল ললাটে, দৃষ্টির বহ্নি উঠল দ্বিগুণ দীপ্ত হয়ে।

কিন্তু এ কে—সামনে?

ওসমান খাঁ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এই শবাস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে আর যাই হোক—রূপসী নারীকে দেখবার আশা করেন নি। হয়ত আছে তারা কোন তাঁবুর সঙ্গে পড়ে এখনও, কিন্তু সে সব তাঁবু এখান থেকে বহুদূর।

ওসমান খাঁর সে লক্ষ্যও ছিল না, সেদিকে তিনি যানও নি। তিনি সোজা শত্রুরই পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন—তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বয়ং খান-ই-খানান মুনিম খাঁ।

কিন্তু এ নারী—অশ্বপৃষ্ঠে নারী এই তো যথেষ্ট বিস্ময়—তার ওপর বলতে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে এই নারীর অভ্যুদয়—অবাক করে দেবারই তো কথা।

কে এ ? শত্রুপক্ষের নারী ? আশ্রয়প্রার্থিনী ? না কি গুপ্তচর ?

কে এ ? কী চায় ?

তাঁকে ইঙ্গিত করে থামাল কেন ?

অশ্বের উন্মত্ত গতি সংহত করলেন অতি কষ্টে। কিন্তু ললাটের মেঘ বজ্রগর্ভ হয়েই রইল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন এই সাহসিকার দিকে।

ঘোড়া থামতে থামতেও অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। স্ত্রীলোকটি ঘোড়া ঘুরিয়ে এনে সামনে দাঁড়াল তাঁর। তারপর কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'মূর্খ, এত দ্রুত কোথায় চলেছ ? মরনের বড় সাধ—না ?'

এ আবার কী কথা ? এ তো ঠিক গুপ্তচরের মত, ছলনাময়ীর মত কথা নয়! তবু 'মূর্খ' সম্বোধনে আরক্ত হয়ে উঠল তরুণ বীরের মুখ।

কতলু খাঁ লোহানীর পুত্রতুল্য তিনি—অন্যরকম সম্বোধন ও সম্ভাষণেই অভ্যস্ত। এই স্পর্ধার সমুচিত উত্তর দেবার জন্য তাঁর হাতের পেশীগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করলেন তিনি। ক্রোধের চেয়ে কৌতূহলের শক্তিই বুঝি বেশী। প্রাণপণে উষ্মা দমন করে প্রশ্ন করলেন শুধু, 'তার অর্থ ?'

'তার অর্থ এই যে—তোমাদের উচিত এখন কিছুদিন যুদ্ধ লড়াই ছেড়ে দিয়ে মুঘলদের পায়ের তলায় বসে শিক্ষা করা—রণকৌশল আর রাজনীতি কাকে বলে তাই!...তোমাদের কি এতদিনেও চৈতন্য হল না যে বিনা যুদ্ধে হার মেনে পালাবার মত কাপুরুষ আর যে-ই হোন মুনিম খাঁ নন।...এ সমস্তই ছল। নিজেরা ছত্রভঙ্গ হবার ভান করে তোমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে—তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে তোমাদের। কতদূর চলে এসেছ তা বুঝতে পারছ ? চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছ। এর পর পারবে ব্যূহ তৈরী করতে বা ঠিকমত প্রত্যাঘাত করতে ?...যাও—এ ছেলেমানুষি কোর না—ফের। এখনও সময় আছে, যতটা সম্ভব জমাট বেঁধে থাক, সম্ভব হলে ঠিকমত সেনা সাজিয়ে নাও, আক্রমণের আর বেশী দেরি নেই—বলে দিলাম।'

বিস্ময় তার আবির্ভাবে, বিস্ময় তার রূপে, বিস্ময় তার কথা বলার ভঙ্গীতে।

বিদ্যুতের মত তার চাহনি। আগুনের মত তার কথা।

বিহ্বলভাবে ওসমান শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

'দায়ুদ কররাণীর একজন হিতাকাঙ্ক্ষিণী—এই পরিচয়ই যথেষ্ট।'

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে—ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চকিতে মিশে গেল সেই জনারণ্যে।

ওসমান খাঁ সত্যই ছেলেমানুষ। তিনি তখনই ঘোড়ার মুখ ফেরালেন। কিন্তু বাহাদুরি নেবার লোভটা সামলাতে পারলেন না। কতলু খাঁকে খুঁজে বার করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে কাজটা তাঁদের কত ছেলেমানুষি ও অন্যায় হচ্ছে—তবে এটা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না যে বুদ্ধিটা আসলে তাঁর নয়, এটা অপরে দিয়েছে তাঁকে, আর যে দিয়েছে সে নারী—তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কথাটা কতলু খাঁর প্রাণে লাগল। তিনি ওসমান খাঁকে খুবই বাহবা দিলেন। তারপর তিনিও যথানিয়মে দায়ুদ খাঁকে খুঁজে বার করে এই সম্ভাবনার কথাটা আশঙ্কাটা জানালেন।

তবে তিনিও এটা বলতে পারলেন না যে এ ব্যাপারে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে এক তরুণ বালক। বলতে পারলেন না যে, যে-কথাটা তাঁর মত অভিজ্ঞ সেনাপতির আগেই ভাবা উচিত ছিল, সে কথাটা আদৌ তাঁর মাথাতে যায় নি।

অনেক সময় বয়স্করাও ছেলেমানুষের মত আচরণ করে বসেন—লোভ দমন করতে পারেন না। সামান্য একটু যশ, সামান্য একটু প্রশংসার মোহও পেয়ে বসে তাঁদের, আর সে জন্য প্রচ্ছন্ন মিথ্যাচরণ করতেও বাধে না।

ওসমান কতলু খাঁকে সত্য কথা বললে এবং কতলু খাঁও সেই কথাটা যথাযথ দায়ুদ খাঁকে জানালে হয়ত দায়ুদ খাঁ অন্য ব্যবস্থাই করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁরও এ আশঙ্কাটা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল। তাই তিনি অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করেই চারিদিকে হুকুম পাঠালেন—আফগান সৈন্যরা ফিরে এসে আবার নিজেদের স্থানে ব্যূহ রচনা করুক। আক্রমণ আসন্ন।

॥ ২৩ ॥

বিরাশি বছরের বৃদ্ধ সেনাপতি মুনিম খাঁ সহজে হাল ছাড়েন নি, দুর্বার বন্যাস্রোতকে প্রাণপণেই বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন—যতক্ষণ সম্ভব তাঁর একক শক্তি দিয়ে সে স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, আর তার জন্য ক্ষতবিক্ষতও বড় কম হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন আর সহজে থামতে পারেন নি। ঘোড়ার রাশ ঘোড়ার ওপর এলিয়ে দিয়ে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ঘোড়া একদমে প্রায় আড়াই ক্রোশ ছুটে চলে এসে থেমেছিল। মুনিম খাঁ পালাতে পালাতে এতটাই পিছনে এসে পড়েছিলেন।

একেবারে এই পর্যন্ত এসে—বোধ করি ঘোড়াটাই ক্লান্ত হয়ে থামল।

মুনিম খাঁও হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে এতটা পিছনে আসার প্রয়োজন ছিল না। আফগানরা তাঁদের পিছু পিছু আসা বহুক্ষণই বন্ধ করেছে। একটু পরে আরও খবর পেলেন টোডরমল এখনও প্রাণপণে যুঝছেন এবং দায়ুদ খাঁ আবারও ব্যূহ রচনা করে প্রস্তুত হচ্ছেন হয়ত বা আত্মরক্ষার জন্যই—তাঁদের তরফ থেকে আক্রমণ আশঙ্কা করে।

ততক্ষণে মুঘলফৌজও আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। বোধ করি লজ্জিতও হয়েছে কতকটা। এবার বৃদ্ধ খান-ই-খানানকে ফিরতে দেখে তারাও ফিরতে শুরু করল।

আবারও শুরু হল লড়াই।

ক্ষণিকের বিজয় গৌরব—খুবই সামান্য ক্ষণের—হয়ত বা এক প্রহরের বেশী নয়, তবু তাই যেন আফগানদের বাহুতে নতুন শক্তি, তাদের বুকে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছে। তারা এবার প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল। গুজর খাঁ রইলেন বাহিনীর মধ্যভাগে, স্বয়ং দায়ুদ খাঁ দক্ষিণে এবং কতলু লোহানী নিলেন বাহিনীর বামভাগ পরিচালনার ভার।

দায়ুদ খাঁ অবশ্য বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না—কারণ তাঁর সামনে, অর্থাৎ মুঘল বাহিনীর বামভাগে ছিলেন রাজা টোডরমল। তাঁর প্রচণ্ড তেজে আগেই সিকান্দার বেগ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন; তবু তখন তিনি ছিলেন সামান্য কজন দেহরক্ষী মাত্র বেষ্টিত হয়ে—এখন বিপুল একদল মুঘল ফৌজ এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পিছনে। এবার আর তাদের হাতির ভয় নেই, ঘোড়াগুলোও

সম্ভবত বুঝে নিয়েছে যে ঐ সচল পাহাড়গুলো তাদেরই জাতিগোত্রের মধ্যে পড়ে—নেহাত রাক্ষস-টাক্ষস জাতীয় কিছু নয়। বরং এখন মুঘল তীরন্দাজের সুতীক্ষ্ণ তীরে হাতিগুলোই পিছু হঠতে শুরু করেছে।

কতলু লোহানীও তাঁর দিকে খুব সুবিধা করতে পারছিলেন না—তাঁর নিজের জীবনই দু-দুবার একটুর জন্য বেঁচে গেল। কিন্তু মধ্যভাগে গুজর খাঁ দারুণ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড বিক্রমের সামনে কোন মুঘলসেনাপতিই দাঁড়াতে পারছিলেন না—তিনি দু দিকের মুঘলবাহিনীকে যেন উপেক্ষা করেই বহুদূর পর্যন্ত তাদের ব্যূহের মধ্যে চলে এসেছিলেন।

ক্রমে মনে হল যে আবারও বুঝি মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। গুজর খাঁ একাই আজকের যুদ্ধে মাত করছেন সবাইকে—তাঁর কাছে কেউই দাঁড়াতে পারছেন না। বেগতিক দেখে স্বয়ং মুনিম খাঁ এগিয়ে এলেন—বৃদ্ধ হলেও তাঁর শৌর্য বা সাহস কারুর থেকে কম নয়—কিন্তু মনে হল তিনিও আবার পিছু হঠতে বাধ্য হবেন। মুঘলবাহিনীর দক্ষিণে শাহাম খাঁ শেরের বিক্রমেই যুঝছিলেন—তাঁর জন্যই কতলু লোহানী এতক্ষণ সুবিধা করতে পারেন নি—এখন গুজর খাঁ তাঁর বহু পশ্চাতে মুঘল ব্যূহের ভেতরে চলে গেছেন দেখে তাঁরও মনোবল যেন ভেঙে পড়ল। সময় থাকতে নিজের দলবল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবেন কিনা ভাবতে লাগলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে—চরম সংকটক্ষণে এক অঘটন ঘটল।

কোথা থেকে একটি তীর সাঁ করে গুজর খাঁর মাথার উপর দিয়ে হাওয়া কেটে চলে গেল—বোধ করি তাঁর শিরস্ত্রাণ ছুঁয়েই—আর ব্যাপারটা কী হল দেখবার জন্য যেমন তিনি মুখ তুলে উপর দিকে চাইবেন সেই এক লহমার মধ্যে আর-একটি তীর এসে বিঁধল তাঁর গলায়।

একেবারে গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গেই গুজর খাঁ হাতির পিঠে এলিয়ে পড়লেন।

বর্ম ও শিরস্ত্রাণে ঢাকা দেহের ঐ স্থানটুকুই ছিল অনাবৃত—মুখ না তুললে সেখানটা বেঁধা যেত না। যে মেরেছে সে তা জেনেই আগের তীরটি ওঁর মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়েছিল।

সকলে, যারা কাছাকাছি ছিল অন্তত, সবিস্ময়ে দেখল—তীর ছুঁড়েছে মুঘল ফৌজের কেউ নয়, এমন কি সে কোনও পুরুষও নয়—নিতান্তই এক নারী, আওরৎ।

আর সেই সামান্য নারীরই অভ্রান্ত হিসাব এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে মুঘলবাহিনী সে যাত্রা বেঁচে গেল।

কারণ গুজর খাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আফগানবাহিনীর সমস্ত উদ্যম, সমস্ত পরাক্রম গেল শেষ হয়ে। এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দেবার মতই তাদের সমস্ত তেজ ঐ একটি মাত্র শায়কে নিবে গেল। একটা নামহারা অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন ঘনিয়ে এল তাদের মুখে চোখে। এদিকে ওদিকে দু-একজন ঘুরে দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে একটু পরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

সে আশ্চর্য বার্তা সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টোডরমলও শুনলেন। তিনি হাত তুলে নিজের ইষ্টদেবীকে প্রণাম জানালেন।

শুনলেন মুনিম খাঁও। তাঁর চোখ জলে উঠল। আশায় ও আনন্দে।

তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে টোডরমলের দিকে এগিয়ে গেলেন, ক্রমে তাঁর কাছেও পৌঁছলেন।

সেই রণব্যস্ততার মধ্যেই মুখ ফিরিয়ে টোডরমল মুনিম খাঁকে বললেন, 'আর ভয় নেই জনাব। সেই দেবী আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, আমাদের সাহায্য করছেন। শুনেছেন তো—স্বয়ং নৃমুণ্ডমালিনী মহিষাসুরমর্দিনী ভবানী ধনুর্বাণ হাতে বধ করেছেন গুজর খাঁকে। আরও শুনলুম যে তাঁরই জন্য নাকি আফগানরা আপনাদের পিছু নিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসেছে। তাঁরই কৌশলে।'

'সবই শুনেছি রাজা সাহেব। সে আপনার দেবী কিনা জানি না—তবে এইটুকু জানি যে সে আমার বেটী। তাকেই খুঁজছিলাম এত দিন। সে সম্পদে কাছে আসে নি, বিপদের দিনে বৃদ্ধ পিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক।'

'আপনার বেটী?' যুদ্ধ, বিপদ, এমন কি প্রাণের আশঙ্কাও ভুলে ঘুরে দাঁড়ালেন টোডরমল।

'হ্যাঁ, আমার বেটী। কিন্তু—খুব হুঁশিয়ার রাজা, খবরদার! সামনে দুশমন।'

দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শত্রু তাঁদের অনবধানতার সুযোগ নিতে চাইছে। এখন এতটুকু অন্যমনস্কতার অর্থ হল মৃত্যু। সুতরাং কথাটা স্থগিত রাখতে হল তখনকার মত।...

আফগানরা যে পিছু হঠতে শুরু করেছে ক্রমশ সেটা দিনের আলোর মতই

স্পষ্ট হয়ে উঠল। পিছনের একটা বিপুল অংশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ওসমান খাঁ সাংঘাতিক আহত, কতলু খাঁর অবস্থাও ভাল নয়—তিনি যে আর বেশীক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পারবেন তা মনে হয় না। এক কথায় আজকের এই লড়াইয়ে আফগানদের আর কোন আশা কোথাও অবশিষ্ট রইল না।*

কথাটা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে এল—কেবল দায়ুদ কররাণীর কাছে ছাড়া।

তিনি মানতে রাজী নন এ পরাজয়।

তিনি তখনও লড়ে যাচ্ছেন। তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী, অনুচর। তাঁকে যেন ভূতে পেয়েছে আজ। ভূতগ্রস্তের মতই লড়ে চলেছেন, একা—কোন দিকে না চেয়ে। এতকালের সমস্ত কাপুরুষতার লজ্জা ও অসম্মান তিনি যেন আজ দূর করতে চান। বহু হিতৈষী ওরই মধ্যে তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল—এখন নিরাপদ স্থানে পিছু হঠাই যে সবচেয়ে বড় রণ-কৌশল হবে তাঁর পক্ষে—সে কথাটা নবীন-প্রবীণ বহু সেনানায়কই তাকে সেই তুমুল কোলাহলের মধ্যে কানে ঢোকাতে চাইল; কিন্তু তিনি কোন কথায় কান দিলেন না, কোন দিকে ফিরে চাইলেন না। এ সময় দুঃসাহস যে চরম নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর—এই সহজ সত্যটা থেকে প্রাণপণে চোখ ফিরিয়ে রইলেন।

তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞা, হয় তিনি জিতবেন—নয়ত এইখানেই প্রাণ দেবেন।…

বলা বাহুল্য মুঘলরা এ নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিতে ছাড়ল না।

অপর সব দিকেই পাঠান-বিরোধিতা স্তিমিত হয়ে এসেছে, শত্রুর বিষদাঁত গেছে ভেঙে—এখন সমস্ত শক্তি একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করতে বাধা নেই। সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধাই এবার দায়ুদ খাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

এবং—যখন পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে প্রায়—পিছন ফিরলেই

* এই কতলু খাঁ ও ওসমান খাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ অধ্যায় অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী রচিত। ওসমান খাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পূর্বভারত থেকে আফগান-শক্তি লোপ পায়। প্রসঙ্গত আর-একটি কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে—এই কাহিনীতে উল্লিখিত শ্রীহরি গুহই যশোরেশ্বর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জনক।

সে দিক থেকে এই বিপুল শত্রুবাহিনীর ক্ষুদিত শার্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার সম্ভাবনা প্রায় প্রত্যক্ষ, তখন বোধ করি দায়ুদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হল।

কিন্তু তখন আর কোনও উপায় আছে কি ?

ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চাইলেন দায়ুদ। চারিদিকেই অগণিত শত্রুসৈন্য, শত্রুপক্ষের সমস্ত রণকুশলী শূর ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁকে।

নিজেরই দুঃসাহস, হঠকারিতার ফল।

নিজের পথ নিজেই বন্ধ করেছেন।

এখন আর বুঝি কোন উপায় নেই ফেরবার। ক্লান্ত হতাশ দায়ুদ খাঁ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু সে দিনটা বুঝি অঘটনেরই দিন। মানুষের ভাগ্য-নিয়ামক গ্রহনক্ষত্রগুলো বুঝি মানুষের সব সাধারণ হিসাব উল্টে দেবার জন্যই সেদিন বিশেষ একটি সৃষ্টিছাড়া ক্ষেত্রে এসে জড়ো হয়েছিল।

আবারও এক অঘটন ঘটল।

দায়ুদ খাঁর পিছন থেকে তাঁর অনুগামীদের ঠেলে সরিয়ে অশ্বারূঢ়া এক নারী এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

কোথা থেকে কেমন করে সে এল তা কেউ জানতে পারল না, কেউ লক্ষ্যও করে নি। যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূতা হল সে।

সাধারণ মুসলমান নারীর বেশ, তবু—চিনল হাজার হাজার মুঘল সিপাহী ও সিপাহ্‌সলার—সেদিনের সেই সন্ন্যাসিনীকে; রাজা টোডরমল চিনলেন নির্ঝরিণীতীরের সেই তরুণীকে। আরও বহু লোক চিনল আজকের গুজর খাঁর নিধনকারিণীকে।

সেই একই মেয়ে।···

অন্তত একশটি তীর এবং সমসংখ্যক বর্শা উদ্যত হয়েছিল দায়ুদ খাঁকে লক্ষ্য করে—সে তীর ও বর্শা তেমনই মধ্যপথে স্থির হয়ে থেমে গেল। বিচিত্ররূপিণী, সম্ভবত দিওয়ানা এই তরুণীর কার্যকারণের কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে সকলে বিস্মিত মূঢ় দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে রইল তার দিকে।

গুজর খাঁর নিধনকারিণী, মুঘলদের কল্যাণকামিনী এই নারী আজ এসে দাঁড়িয়েছে দায়ুদ খাঁর রক্ষাকর্ত্রীরূপে! এর চেয়ে দুর্বোধ্য, এর চেয়ে আপাত-অর্থহীন আর কী হতে পারে!···

রক্ষাকর্ত্রী তাতে কোন সন্দেহ নেই—কারণ সে মেয়ে ওঁকে আড়াল করেই দাঁড়িয়েছে। উদ্যত-আয়ুধ অসংখ্য অসুরের সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে সে—যদিচ তার নিজের হাতে কোন হাতিয়ারই নেই।...

সবচেয়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন মুনিম খাঁই।

আজ যে তাঁকে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে হয়েছিল সে লজ্জা তিনি ভুলতে পারেন নি—সেই লজ্জাই এখন প্রতিশোধ বাসনায় তাঁর বুকে জাগিয়েছে এক প্রবল জিঘাংসা। তাই তাঁর বর্শাই সবচেয়ে সাংঘাতিক এবং অব্যর্থ ভঙ্গীতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর হাতই নেমে এল সর্বাগ্রে।

ক্রোধ ক্ষোভ হতাশা বিস্ময়—একই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠল, যেন হাহাকার করে উঠলেন তিনি, 'বেটী। বেটী! এ কী করছিস মা!'

আর সেই শব্দেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন রাজা টোডরমল। তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মা ভবানী, এ কী তোর লীলা!'

কিন্তু কারও কোন উচ্ছ্বাস বা আকুতিতেই সে নারী এদের দিকে ফিরে চাইল না। এদের উপস্থিতিটাই যেন স্বীকার করল না সে। এমন কি—মনে হল—এতগুলি সমুদ্যত মারণাস্ত্রকেও সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। যেন সেগুলো নিতান্তই উপেক্ষণীয়, তুচ্ছ কোন খেলার সামগ্রী। পক্ষীমাতার পক্ষবিস্তৃতির মতই দুই হাত বিস্তার করে এই সমস্ত বিপদ ও মৃত্যুভয় থেকে সে দায়ুদ খাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল—এখন কতকটা যেন এদের প্রতি চরম এবং উদ্ধত অবহেলাতেই এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, ঘাড়টা যতদূর সম্ভব দায়ুদের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'পালাও পালাও দায়ুদ খাঁ কররাণী—এই বেলা পালাও। আত্মহত্যা শৌর্য নয়—এ দুঃসাহস দেখানোর কোন অর্থ নেই। ভবিষ্যতে ঢের সুযোগ পাবে মুঘলদের সঙ্গে নিজের শক্তি যাচাই করার। ফের, ফের—ঘোড়ার মুখ ফেরাও।'

অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন দায়ুদ খাঁও। সেই মুহূর্তে ওঁর হাত-পাও যেন নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল—তবু, সম্ভবত ওর কণ্ঠের আর্তিতেই তিনি ঘোড়ার মুখ ফেরালেন। একবার করুণ, অসহায়, কিছুটা বিমূঢ় দৃষ্টিতেই তাকালেন নফিসার মুখের দিকে—তারপর বললেন, 'সেদিনের ঋণ কি এইভাবে শোধ করলে নফিসা? কিন্তু তার তো দরকার ছিল না। আমিই যে ঋণী, অপরাধী। তোমার হাত থেকে সর্বনাশ এবং মৃত্যুই হাত পেতে নিতে চাই—অনুগ্রহ নয়।'

'আঃ, দায়ুদ খাঁ!...আমি যে আর পারছি না সামলাতে। যাও, যাও, কাব্য করার সময় এ নয়—অভিমান করার তো নয়ই—। তুমি এখন যাও। পেছন ফের।'

দায়ুদ খাঁ আর ইতস্তত করলেন না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ছোটালেন তাকে।

হয়ত মনিবের চরম বিপদ বুঝেই তাঁর বাপের আমলের ইউসুফজাই দেহরক্ষীর দল দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল আপনা আপনিই। এক ভাগ চলল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁকে ঘিরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালাবার জন্য লড়াই করতে করতে—আর-এক ভাগ ব্যবধান রচনা করে দাঁড়াল তাঁর গতিপথ ও তাঁর দুশমনের মধ্যে। আত্মহত্যার জন্যই প্রস্তুত তারা—জান দিয়ে মনিবের নিমক শোধ করবে।

মুঘলরা চেষ্টার ত্রুটি করল না অবশ্য, কিন্তু প্রথমত সন্ন্যাসিনী বা দিওয়ানা ঐ অপরিচিতা নারীর অসমসাহসে—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এতগুলি উদ্যত অস্ত্রের সামনে অকুতোভয়ে বুক পেতে দাঁড়ানোয়—সকলের মনেই একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত সম্ভ্রমের উদয় হয়েছিল; দ্বিতীয়ত ইউসুফজাই দেহরক্ষীদের আত্মনিবেদিত প্রাণপণ যুদ্ধ—এই দুই কারণ লঙ্ঘন করে এগোতে এগোতে দায়ুদ কররাণী চলে গেলেন ওদের নাগালের বাইরে বহুদূরে। তাঁকে আর কোন মতেই ধরা গেল না।

॥ ২৪ ॥

ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটল তা বুঝতে মুনিম খাঁরও একটু দেরি হয়েছিল। যখন বুঝলেন তখন আর মেয়েটিকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্রে সামান্য বুদ্বুদের মতই কোথায় মিশে গিয়েছে সে। এপক্ষে কি ওপক্ষে, এদিকে এসেছে কি ওদিকে গেছে, লড়াই করছে কিংবা দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে—তা আর তখন অনুমান করারও উপায় নেই। উভয় পক্ষের সেই প্রায় মরণ-বাঁচন প্রাণপণ যুদ্ধের ফাঁকে সে যেন একেবারে উবে গিয়েছে।

ভীষণ বিচলিত হলেন মুনিম খাঁ। পাগলের মত চেঁচামেচি করতে লাগলেন। আফগানদের পরাজয়ও যেন তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠল,

মনে হল সেটা যেন আদৌ কোন বিবেচনার বিষয় নয়। দিকে দিকে লোক ছুটল, প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করলেন, কল্পনাতীত অসম্ভব অঙ্ক ঘোষণা করলেন পুরস্কারের—অন্যথায় তিনি এই অকর্মণ্য ক্লীব লোকগুলোর ওপর দিয়ে চরম প্রতিশোধ তুলবেন এমন ভয়ও দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লোভ বা ভয় কোনটাই সেই সামান্য একটি মেয়েকে তুকারয়ের প্রান্তর থেকে খুঁজে ধরে আনতে পারল না।

বহুদিনের বহু অনুসন্ধানের সামগ্রী—বহু পথচাওয়া বহু উৎকণ্ঠা উদ্বেগ ঔৎসুক্যের লক্ষ্যবস্তু এমন করে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে বার বার পিছলে চলে যাচ্ছে—এ ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের ক্ষোভ মানুষকে পাগল করারই কথা—বিশেষত মুনিম খাঁর মত বিরাশি বছরের বৃদ্ধকে।

ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় তিনি ক্ষেপেই উঠলেন যেন। হুকুম দিলেন, কাউকে বন্দী করবার দরকার নেই—আফগানদের দেখা মাত্রই যেন বধ করা হয়। তিনি যেন পরদিন সকালে শুধু দুশমনের মৃত মুখই দেখতে পান—কোন জীবিত শত্রু না তাঁর চোখে পড়ে।...

বলা বাহুল্য—সেই আদেশ-মতই কাজ হল। ভীত, বিভ্রান্ত, রণশ্রান্ত আফগানেরা দলে দলে নিহত হতে লাগল। তাদের তখন পালাবার মত শক্তি বা বুদ্ধি কিছুই বিশেষ আর অবশিষ্ট ছিল না—হয়ত বা ইচ্ছাও। কতকটা যেন চরম ক্লান্তিতেই শত্রুর উদ্যত খড়্গের নীচে মাথা পেতে দিতে লাগল তারা—মরে অব্যাহতি লাভ করতে লাগল।

তাদের সে রক্তে সেদিন তুকারয়ের লাল রুক্ষ পাথুরে মাটিও সরস হয়ে উঠল। সরস আর রক্তিম। মাটির সে রক্তিমা বুঝি আকাশের রক্ত-বর্ণচ্ছটাকেও ম্লান করে দিল—তাই সূর্যদেব যেন কতকটা সেই লজ্জাতেই তাড়াতাড়ি বনের আড়ালে মুখ ঢাকলেন। কিন্তু দিনশেষের রাঙা রোদটুকু মুছে গেলেও রণপ্রান্তরের সেই শোণিতবর্ণাভার প্রতিফলনেই যেন আকাশের পশ্চিম দিগন্ত আরও বহুক্ষণ লাল হয়ে রইল।...

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার পরও বহুক্ষণ ধরে চলল সেই মৃত্যুমহোৎসব। ঠিক কত মানুষ যে মারা হল, তা কেউই তখন বুঝতে পারে নি। বুঝল —যখন পরের দিন সকালে মুঘল ফৌজ ছিন্নমুণ্ডের আটটি গগনচুম্বী স্তূপ উপহার দিলে তাদের প্রধান সেনাপতি খান-ই-খানানকে। যেমন—বহুকাল আগে তাঁর

বর্তমান মনিবের পুর্বপুরুষ তৈমুরকে তাঁর বাহিনী উপহার দিয়েছিল আটটি নরমুণ্ডের পাহাড়।

তফাতের মধ্যে সে আটটি পাহাড় নাকি আশি হাজার নরমুণ্ড দিয়ে রচিত হয়েছিল—আর এ আটটি স্তূপে হয়ত আট হাজারের বেশি ছিল না। তবু তা একই রুচির সাক্ষ্য বহন করছে বৈকি!

কে জানে—হয়ত মুনিম খাঁ সে বীভৎস দৃশ্যে লজ্জিত হয়েছিলেন, হয়ত হন নি। কিন্তু তিনি তাঁর অনুগামী অনুচরদের যে সেজন্য কোন তিরস্কার করেন নি এটা ঠিক। সম্ভবত—তাঁর চিত্ত-বিক্ষোভ এবং আশাভঙ্গের গ্লানি খানিকটা দূর হয়েছিল—এতগুলি মানুষের মৃত্যু-সঙ্গমে স্নান করে উঠে।

॥ ২৫ ॥

যুদ্ধশেষে মুনিম খাঁর তাঁবুতেই মন্ত্রণাসভা বসেছিল। দূর থেকে জয়োন্মত্ত রক্ত-পিয়াসী সৈন্যদের কোলাহল ভেসে আসছে। ভেসে আসছে আহত মৃত্যু-পথযাত্রীদের আর্তনাদ। ক্ষেত্রবিশেষে তীব্র ও তীক্ষ্ণ—কোথাও বা একটানা একঘেয়ে গোঙানির মত। এই অপুর্ব আবহসঙ্গীতের মধ্যে পুরু জাজিমে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে বসেছেন মুনিম খাঁ। তারই কিছু দূরে একটা চৌকিতে খান-ই-খানানের অনুমতি নিয়ে বসেছেন রাজা টোডরমল। কারণ তাঁর উরুতে সাংঘাতিক চোট লেগেছে—মাটিতে বসা মুশকিল। অন্য সেনানায়করা সামনে আর-একটা কার্পেটের ওপর এসে বসেছেন। সকলের মুখেই প্রসন্ন তৃপ্তির ছাপ, খালি মুনিম খাঁর ছাড়া। প্রধান সেনাপতির ললাট চিন্তাকুল, চিত্ত-বিক্ষোভের চিহ্ন সেখানে স্পষ্ট।

মন্ত্রণাসভা বেশীক্ষণ চলার প্রয়োজন ছিল না। প্রশ্ন এক : এখন কী করা হবে?

উত্তর দুটি মাত্র : হয় শত্রুর পিছু নিতে হবে—নয়ত এখানে বসে শক্তি সংহত করতে হবে নিজেদের।

মুনিম খাঁর নিজের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল দুটো দিন এখানেই থাকেন—কিন্তু কে জানে কিসের সঙ্কোচে কিছুতেই মুখ ফুটে সে কথাটা বলতে পারলেন না। বাকী সব সেনানায়কদেরই এক কথা—এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সাপকে একটা লাঠি মেরে ছেড়ে দিলে তার বিষ যায় না—বরং সে ক্রুদ্ধ হয়ে

থাকে, সুযোগ পেলেই প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করে। তাছাড়া এ-ই সুযোগ—শত্রুর বিষদাঁত চিরদিনের মত ভেঙে দেবার। শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ, রোগের শেষ এবং আগুনের শেষ যে রাখে সে আহাম্মক। শত্রু শেষ করার এ সুযোগ ছেড়ে দিলে চরম আহাম্মকি হবে।

মুনিম খাঁর ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি বস্ত্রাবাসের শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে নিবদ্ধ ছিল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজা সাহেব কী বলেন?'

'এ সম্বন্ধে কি কোন দ্বি-মতের অবসর আছে খান-ই-খানান? শত্রুকে আবার শক্তি সঞ্চয়ের অবসর দেব কী দুঃখে? তাহলে এত কাণ্ড করলামই বা কেন?'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মুনিম খাঁ বললেন, 'তাহলে কি এখনই রওনা হতে চান? দুটো দিন বিশ্রাম করবার অবসর দেবেন না ফৌজকে?'

'কী এমন পরিশ্রম তারা করল জনাব! একটা দিনের যুদ্ধ বই তো নয়। আচ্ছা, আর-একটা দিনই না হয় সময় দিন তাদের।'

'বেশ, তাই হোক। সেই মতই নির্দেশ দিন তাহলে আপনারা।' একটু অনিচ্ছুক কণ্ঠেই বললেন যেন মুনিম খাঁ।

এর পর আর সেনানায়করা কেউই বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলেন না, কারণ প্রায় সকলেই তখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, ক্লান্ত, আহত। রীতিমাফিক যেটুকু সৌজন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন, যেটুকু কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান আবশ্যক—সেইটুকু করেই সকলে বিদায় নিলেন।

কেবল উঠলেন না টোডরমল।

তিনিও ক্লান্ত, তিনিও আহত। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তিনি কৌতূহলী। আজ কিছু পূর্বেকার ঘটনাটা তাঁকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, তাঁর কৌতূহলকে একটি বিশেষ আঘাতে জাগ্রত করেছে।

তাঁর দেবী বিধর্মী শত্রুকে রক্ষা করার জন্য রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হবেন—বিস্ময় ও কৌতূহলের এইটেই তো যথেষ্ট কারণ। শ্রদ্ধা নষ্ট করার, পূর্ব ধারণা পরিবর্তিত করার পক্ষেও হয়ত যথেষ্ট। আর তা নষ্ট হতও—যদি না ঐ মানুষটিরই পূর্ব পূর্ব কীর্তিগুলো তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতেন। শুধু পূর্ব পূর্বই বা কেন—সর্বশেষ কীর্তিও তো সামান্য নয় খুব। শত্রুকে চরম বিপদ থেকে রক্ষা করার পরও সহস্র চক্ষুর সামনে থেকে চোখের নিমেষেই কি তিনি অন্তর্হিতা হন নি?

এর ওপর আবার মুনিম খাঁর আপাত-উন্মত্ত দুর্বোধ্য আচরণ—এটার সঙ্গেও তো ঐ দেবী বা সন্ন্যাসিনীর কার্য-কারণের কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে কি মুনিম খাঁ তাঁকে চেনেন?

তবে কি সত্যিই সে ওঁর আত্মীয়া? অথবা সত্যই বিধর্মী ক্রীতদাসী সে?

এ রহস্যটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

চাকর এসে ওঁদের চর্ম-পাদুকা শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়ে গিয়েছিল আগেই। এখন স্বর্ণভৃঙ্গারে জল এনে ধরল হাত পা ধোবার, ভিজা গামছায় হাত পা মুখ মুছিয়ে নিয়ে গেল—শরবত নিয়ে এল স্বর্ণপাত্রে ওঁদের জন্য। মুনিম খাঁর ইঙ্গিতে হিন্দু ভৃত্যই রাজা সাহেবের জন্য শরবত এনেছিল কিন্তু তিনি তা পান করলেন না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ইষ্টপুজা শেষ না করে তিনি কিছুই খাবেন না। এমনিই মুখহাত ধুয়ে অনেকটা ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে—আর এখন ব্যস্ত হবার প্রয়োজনও নেই। শরবতের পাত্র ললাটে ঠেকিয়ে মুনিম খাঁর সম্মান রক্ষা করলেন মাত্র।

মুনিম খাঁও বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। নিজে নিঃশব্দে নিজের শরবতটুকু পান করে নিয়ে ইঙ্গিতে ভৃত্যদের চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকিয়ার ওপর আর একটু এলিয়ে পড়ে বললেন, 'বলুন রাজা সাহেব, এবার আপনার কী হুকুম!'

'গোস্তাকী মাফ করবেন খান-ই-খানান, কিন্তু ঐ যে—মানে ঐ বালিকাটি ঠিক কে বলুন তো? ও কি সত্যিই আপনার পরিচিতা? ওর সমস্ত আচরণ এমন দুর্বোধ্য ও পরস্পর-বিরোধী যে আমি কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছি না। ও কি মুঘলদেরই হিতাকাঙ্ক্ষিণী, না কি পাঠানদের? নিজের ইচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরছে, না ওদের গুপ্তচর—কিছুই ঠিক করতে পারছি না। সমস্তটা হেঁয়ালী এবং অস্পষ্ট লাগছে।'

মুনিম খাঁ তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে ছিলেন। সেইভাবেই শুনলেন টোডরমলের সমস্ত কথাগুলো—শান্তভাবে নীরবে। আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, তারপর বললেন, 'ওর আচরণের কোন কৈফিয়তই আপনাকে দিতে পারব না রাজা সাহেব; তা আমার কাছেও সমান দুর্বোধ্য। আর সেই জন্যই আজ এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম—হয়ত কিছু কিছু অসৌজন্য এবং অশোভনতাও প্রকাশ করে ফেলেছি। কিন্তু সবটা শুনলে এ বৃদ্ধের দুর্বলতাটুকু

মাপই করবেন।...ও আপনাকে মিথ্যা বলে নি রাজা টোডরমল, আমিও বলি নি। ওর এই দুই পরিচয়ই সত্য। আমার বেটীও বটে—কিন্তু বাঁদীও। এই ওর ললাটলিপি—হয়ত আমারও অপরাধ।'

টোডরমল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই বসে রইলেন। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রতিভা-দীপ্ত দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে উঠেছে। বোঝাপড়া করার, প্রশ্ন করার বা কোন জবাব দেবার শক্তিটুকুও যেন আর অবশিষ্ট নেই।

অনেকক্ষণ পরে টোডরমল কোনমতে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে ?'

এবার মুনিম খাঁ সোজা হয়ে বসলেন। টোডরমলের দিকে কেমন এক রকম বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সে হয়ত এমন কোন কলঙ্কের কথা নয় রাজা সাহেব—তবু আজ সে কাহিনী বলতে লজ্জাই অনুভব করছি। লজ্জা যত, দুঃখও তার চেয়ে কম নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনার জন্যই দুঃখ। যা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হতে পারত—তাই আমার কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে—আর তার জন্য আমার সামান্য একটু অবিবেচনাই দায়ী।'

'আপনার যদি কষ্টই বোধ হয় সে কাহিনী বলতে তবে থাক্ জনাব। না-ই শুনলাম সে কথা। পৃথিবীতে অনেক কাজেরই তো অর্থ বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না, এটারও না হয় না পেলাম !'

'না, শুনুন। শোনাই ভাল। আমার নির্বুদ্ধিতা থেকে হয়ত কিছু শিখতেও পারবেন। তা ছাড়া আজ—আজ আমারও একটু পরামর্শ দরকার রাজা-সাহেব। আপনি ছাড়া কারো কাছে এ কথা বলতেও পারব না। পরামর্শ দেবার মতও আর কেউ নেই তো !...আপনিই বা সব না শুনলে যুক্তি দেবেন কেমন করে ?'

এই বলে একটু থেমে, আর কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আস্তে আস্তে বিবৃত করলেন মুনিম খাঁ, আশ্চর্য অবিশ্বাস্য এক কাহিনী।

অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে বসে শুনলেন টোডরমল—অভিভূত হয়ে। সারাদিনের অপরিসীম ক্লান্তি, ক্ষতের জ্বালা, পিপাসা—কিছুই যেন বোধ রইল না তাঁর—এমনই বিচিত্র সে কথা। দূরের উন্মত্ত কোলাহল ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। মুমূর্ষুর আর্তনাদও পড়েছে ঝিমিয়ে—হয়ত বা এঁদের মনোযোগ এই সমস্ত স্থান-কাল-পাত্রের বাইরে আর-এক অলৌকিক জগতে চলে গিয়েছিল বলেই এঁদের কানে সে কোলাহল আর তেমনভাবে প্রবেশ

করছিল না। সামান্য শামাদানের অতি ক্ষীণ আলোতে এক বৃদ্ধ এবং এক প্রৌঢ় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা কইতে কইতে আজকের এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন, সুদূর এবং অদূর অতীতের বিস্ময়কর এক ঘটনার রাজ্যে। একজন বক্তা, অপরজন শ্রোতা—কিন্তু শ্রোতার কৌতূহল, মনোযোগ এবং প্রয়োজনমত প্রশ্নই বক্তার উৎসাহে যোগান দেয়—এ-ক্ষেত্রে তাঁর কোনটারই অভাব হয় নি। এঁদের এখানে যে কল্পলোক সৃজিত হয়েছিল, তা দুজনেরই সৃষ্টি—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একটু একটু করে সবই বললেন মুনিম খাঁ।

বললেন সেই বালিকাটির বিচিত্র জীবনেতিহাস।

বললেন নিজেরও কলঙ্ক ও সুখস্মৃতির আশ্চর্য কাহিনী।

নফিসার অবিশ্বাস্য জীবন-কথা।

এ-ই সে নফিসা। আজ যাকে রণক্ষেত্রে দেখেছেন রাজা টোডরমল—কাল যাকে গিরিনির্ঝরের ধারে অরণ্যের নিভৃত প্রান্তে দেখেছিলেন। সে-ই কালকের সন্ন্যাসিনী, আজকের দেবী।

তেলিয়াগঢ়ির শিবিরে সে যখন আসে মুনিম খাঁর কাছে—তখনই তিনি দৈবাৎ ওর পরিচয় পান। না, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই—নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন তিনি অন্তরে বাইরে।

তিনি পরিচয় পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ওকে জানতে দেন নি। সে-ই আর এক নির্বুদ্ধিতা। মুখে এসেছিল বহুবার ; শুধু লজ্জাতে, অনুশোচনাতেই বলতে পারেন নি কথাটা। ওর মায়ের প্রতি, ওর প্রতি যে অবিচার করেছেন সেই লজ্জায়, সেই অনুশোচনায়।

তিনি ওকে শুধু সস্নেহে কাছে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু পর পরই—তার কাছে আশ্রয়ের লোভ কতটুকু থাকতে পারে—সেইটেই ভেবে দেখেন নি তিনি। নফিসা সে লোভ করে নি। গুরুন্দায় সে-ই শেষ দেখেছিলেন তিনি ওকে—তারপর এই আজ।

যখন জানতেন না চিনতেন না—তখন অত মায়াও ছিল না। কিন্তু আত্মজা বলে জানবার পর, তার ব্যক্তিত্বের, তার বুদ্ধির, সর্বোপরি তার হৃদয়ের পরিচয় পাবার পর তিনি তাকে কাছে পাবার জন্য, পিতৃস্নেহের ছত্রচ্ছায়ায়

তার তাপিত প্রাণকে আচ্ছাদিত করে শান্তি দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোথাও আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না—যেন ধরিত্রী-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সে।

প্রকৃতপক্ষে তাকে খুঁজে বার করার জন্য পাগলই হয়ে উঠেছিলেন—আজ স্বীকার করতে আর ইতস্তত করবেন না মুনিম খাঁ—তার জন্য রাজকার্যেও অবহেলা করেছেন ; কতকটা সেই জন্যই সময়ে যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন নি।

তারপর এই প্রথম খোঁজ পেলেন তার। খোঁজ ঠিক পাওয়া হয়ত সেটা নয়—তবে বর্ণনা শুনেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আর সে অনুমান ভুলও হয় নি।...

উপন্যাসের মতই অবিশ্বাস্য এই কাহিনী বলে যেন শ্রান্ত হয়ে চুপ করলেন খান-ই-খানান। চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

একটুখানি তাঁকে সামলে নেবার সময় দিয়ে মনে-মনে অধীর রাজা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যা বললেন তাতে তো এ-ই মনে হয় যে, আপনার কন্যা নফিসার চেয়ে বড় শত্রু দায়ুদের কেউ নেই, দায়ুদের সর্বনাশ-কামনাই তার একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু আজকের এই আচরণের সঙ্গে তো সেই পুর্ব ইতিহাসের কোন সামঞ্জস্য থাকছে না ! এটা যেন কেমন অদ্ভুত ব্যাপার হল না ?'

'সেইটেই আমিও তো বুঝতে পারছি না রাজা সাহেব—' ম্লান কণ্ঠে উত্তর দেন মুনিম খাঁ, 'এ কী হল !...আর সেই কারণেই আমি একবারটি তার দেখা চাইছিলাম—সামনাসামনি হতে পারলে আমি এর কৈফিয়ত নিতাম। সে মিথ্যা বলত না কিছুতেই।'

'কিন্তু দুদিন অপেক্ষা করলেই যে তার দেখা পেতেন—তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই।'

'তা ঠিক। তবু—।.. এবার, এবার আমি তাকে নিজের পরিচয় দিতাম, রাজা সাহেব। নতজানু হয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা করতাম। বৃদ্ধ বাবাকে সে ক্ষমা করত নিশ্চয়। আমার শেষ জীবনটা তাকে কাছে কাছে রাখতাম। যে কটা দিন আরও বাঁচি—যে ক্ষতি তার করেছি যৎসামান্য পুরণের চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে সুযোগ বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না। জানি না—খোদার কী মর্জি—তবে এটা ঠিক, অন্যায় সে কিছু করবে না রাজা সাহেব। আপাত-দৃষ্টিতে যা দুর্বোধ্য অর্থহীন মনে হচ্ছে—কোথাও নিশ্চয় তার কোন একটা কৈফিয়ত আছে।'

'তা তো আছেই।' সামান্য হেসে জবাব দেন টোডরমল—বৃদ্ধ পিতার আকৃতিতে করুণাই অনুভব করেন তিনি মনে মনে—'এও হতে পারে যে মৃত্যুতে সব জ্বালার অবসান হবে মনে করেই সে দায়ুদকে বাঁচাতে চেয়েছে। আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখে আরও যন্ত্রণা দেওয়াই হয়ত উদ্দেশ্য। সর্বনাশের অনুভূতিটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করুক দায়ুদ—এই হয়ত ইচ্ছা।'

'ঠিক বলেছেন রাজা সাহেব, ঠিক বলেছেন।' সোজা হয়ে উঠে বসেন খান-ই-খানান, উৎসাহে চোখ দুটো তাঁর জ্বলতে থাকে—উৎসাহে আর কতকটা টোডরমলের প্রতি কৃতজ্ঞতায়—'ঠিক বলেছেন। আমিই অন্ধ, তাই এটা দেখতে পাই নি, ওর প্রতি অবিচার করছিলাম, মনে মনে ক্ষুণ্ণও হচ্ছিলাম একটু। মূর্খ আমি।…এই তো—এই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওর উদ্দেশ্য।'

এক নিশ্বাসে উত্তেজিত কণ্ঠে এত কথা বলে আবার যেন একটু মিইয়ে যান মুনিম খাঁ—'কিন্তু তার দেখা তো পেলাম না রাজা সাহেব! আর কি সে কোন-দিন আসবে না? এই বৃদ্ধের শেষ জীবনটা স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে, উৎকণ্ঠা দিয়ে মধুর স্নিগ্ধ করে তুলবে না!…হায়, হায়, কেন সেদিন পরিচয়টা দিলাম না!'

শেষের দিকে গলা ভেঙে আসে মুনিম খাঁর।

'পাবেন বইকি। নিশ্চয়ই দেখা পাবেন। আমাদের বাহিনী থেকে দূরে সে কখনই থাকে না—এই তো একাধিক বার তার প্রমাণ পেলেন।'

'পাব? পাব? ইনসানাল্লাহ্!'

ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি মেলে বোধ করি বা খোদাকেই স্মরণ করতে চান মুনিম খাঁ। তাঁর চোখে জল এসে যায়।

॥ ২৬ ॥

নফিসা সেদিন রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যা বলেছিল ওসমানকে—হয়ত তার সবটাই ছলনা নয়—হয়ত সেটা তার মনের কথাও।

ওর মনের মধ্যে কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আজ সে নিজেই তার হদিস পায় না।

শৈশবের কথা তার মনে নেই, কিন্তু মার কোল ছাড়বার পর যে-সব পুরুষ তার চার পাশে দেখেছে সে, তারা কেউই মানুষ নামের যোগ্য নয়। লোভী, কুৎসিত রকমের লোভী, ইতর—পুরুষের কলঙ্ক তারা। তার গা ঘিনঘিন

করত ওদের দেখলে। তাদের লোলুপ বীভৎস মনের চেহারা দেখে দেখে কেমন যেন তার ধারণা হয়েছিল যে, সব পুরুষমানুষই বুঝি এমনি।

তাই মিয়া লুদীকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিল সে।

তাঁকে দেবতা বলে বোধ হয়েছিল। সে যে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় নি—তার মূলে সেই ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা-বোধ। কিছু বা বিস্ময়ও। পুরুষ এমন উদার, এমন মহৎ, এমন শক্তিশালী হয়?

সেই ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতাই তাকে ক্রমশ আত্মসম্মোহিত করে ফেলেছিল। সে নিজেকে বুঝিয়েছিল যে সে মিয়া লুদীকে ভালই বেসেছে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে। এ জীবনে আর কাউকে ভালবাসা তার সম্ভব নয়।

সেই ভালবাসার পাত্রকে হারিয়েই সে এমন পাষাণী হয়ে উঠেছে, এমন প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্রুর—এই ছিল তার বিশ্বাস।

তার প্রাণাধিক, তার প্রাণাস্পদ, তার মালিকের অকারণ হত্যার শোধ তুলবে,—হত্যাকারীর সর্বনাশ করবে—এই হয়েছিল তার ব্রত। সে ব্রতের, সে মন্ত্রের সাধন করতে গিয়ে তার শরীর যায় সেও ভাল। বস্তুত তার যে শরীর আছে, তার দেহেও যে বসন্ত আর যৌবনের পদার্পণ ঘটে—সে দেহও যে নিজ ধর্ম পালনের জন্য উন্মনা হয়ে ওঠে—এ তো ভুলেই গিয়েছিল সে।

আরও ভুলে গিয়েছিল যে সেই শরীরের মধ্যে মন বলে খোদার সৃষ্ট আর এক আজব পদার্থ আছে—যা কোন কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা ভক্তির পথ ধরে চলে না। সে বেপরোয়া স্ব-তন্ত্র। তার পথ সর্পিল, গতি কুটিল। তার ক্ষেত্র সীমাহীন। তার ধর্ম অসময়ে অপাত্রে এবং অস্থানে নিজেকে সমর্পণ করা—বিলিয়ে দেওয়া—হারিয়ে দেওয়া।

নেশার ঘোরে চলেছিল সে এক দিকে চেয়ে। একচক্ষু হরিণের মত দৃষ্টি ছিল নিরাপদ দিকটাতেই নিবদ্ধ। তাই বিপদ যে অন্য দিক দিয়ে কখন এসে পৌঁছে গেছে তা টের পায় নি।

সে বিপদ ছিল তার অন্তরে।

আসল শিকারী বুঝি তার যৌবন, অথবা যৌবন-পীড়িত তার মন।...

একেবারে চমকে উঠল সে সেই দিনই—যেদিন ক্লান্ত ক্লিষ্ট অনুতপ্ত দায়ুদ কররাণী বীরভূমের গভীর অরণ্যে তার সামনে একান্ত দীনভাবে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলেন—বুক পেতে দিয়েছিলেন তার অস্ত্রের সামনে।

নিয়তির মত সর্বনাশিনী নারীকে বিশ্বাস করে তার হাতে জীবন, সিংহাসন, সমস্ত ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠেছিল সে।

চমকে উঠেছিল দায়ুদ কররাণীর আচরণে নয়—নিজের মনের গতি দেখে। হয়ত বা ভয়ই পেয়েছিল একটু।

হাতের মধ্যে পেয়ে অতবড় শত্রুকে ছেড়ে দিয়েছিল তাই? না, তা নয়। হয়ত নিজের হাতে বধ করার ইচ্ছা কোনদিনই ছিল না তার।

চমকে উঠেছিল সে অন্য কারণে।

দায়ুদ কররাণীর সেই অপরাধীর দীন ভঙ্গী, নিজের অস্ত্র তার হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা—সর্বোপরি তার করুণ হতাশ কণ্ঠস্বর সেদিন নফিসার বুকে শেলের মত বিঁধেছিল।

করুণা অনুভব করেছিল সে ঐ চরম শত্রু সম্বন্ধে।

করুণা-উদ্বেলিত এক প্রকারের আবেগ।

শিকারী যদি নিজের শিকার সম্বন্ধে করুণা অনুভব করে তাহলে সমস্ত খেলাটাই মাটি হয়ে যায় যে! ভয় পেয়েছিল সে সেই কারণেই। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পেয়েছিল।

যে প্রতিহিংসাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে সে আর সব-কিছু ভুলে ছিল, সেই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিই যদি না থাকে তো সে থাকবে কী নিয়ে? তার আর রইল কী?

দীন, অনুতপ্ত, প্রায় নিঃসঙ্গ ও নিরস্ত্র কররাণী—তারই করুণায় ও আনুকূল্যে, তারই প্রদর্শিত পথে বিজয়ী বীরের মত চলে গিয়েছিলেন—আর তাঁর সেই পায়ের ধুলোর ওপর বসে পড়েছিল হতভাগিনী তার সব-কিছু হারিয়ে।

তার প্রতিহিংসাই তো এখন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র অবলম্বন---তা-ও কি আজ তাকে ছেড়ে চলে গেল?

অবশ্য বেশীদিন নিজেকে এভাবে মোহগ্রস্ত থাকতে দেয় নি নফিসা। এই জড়তা, মানসিক এই দৈন্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সে নিজের কাজে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভয়টা যায় নি। ওর অন্তরে আগের সেই একাগ্রতা, সেই তন্ময়তা যেন আর খুঁজে পায় না, কোথায় যেন মনের

জোরটাই গেছে কমে। এই সত্যটা যত সে অনুভব করে ততই যেন দমে যায় মনে মনে। আর ততই পরমুহূর্তে জোর করে নিজেকে সঞ্জীবিত করে, মনকে চাবুক মেরে কাজে লাগায়।

তার মালিককে মনে করবার চেষ্টা করে।

সৌম্য, শান্ত, উদার, স্নেহশীল তার মালিক। অন্যায় করে অকারণে যাঁকে মেরেছে তাঁর দুশমনেরা। তার দেবতা। তার দয়িত।

কিন্তু কে জানে কেন—তাঁর চেহারাটা আর তেমন মনে পড়ে না। বরং যাকে সে কিছুতেই মনে করতে চায় না, মনকে চোখ রাঙিয়ে যার ছবি মন থেকে মুছে দিতে চায় সে—সেই একটি একান্ত ক্লান্ত ক্লিষ্ট দীন মুখ কোথা থেকে এসে যেন মনের অগোচরেই মনের সামনে দাঁড়ায়।

শিউরে ওঠে নফিসা। নিজেকে গালাগালি দেয়। বেইমান বলে, অকৃতজ্ঞ বলে। শাসন করতে চায় নিজেকে। অকারণে উপবাস করে, কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনে নিজের এই যৌবন-পীড়িত দেহটাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করে—কিন্তু তবু কিছুতেই যেন কিছু হয় না।

ও লোকটা পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক, হত্যাকারী। ওকে কিছুতেই মনে করবে না সে। মনে আনবে না তার ক্লিষ্ট দীন মুখ। বেইমান, বেসরম ঐ ঘাতকটার প্রতি এতটুকু মেহেরবানি রাখাও পাপ।

কিন্তু যতই চাবুক মারে নিজেকে, নিজের মনকে—ততই এসে দাঁড়ায় মনের সামনে—না, তার মালিক নয়, ঐ নর-পশুটাই।

আশ্চর্য হয়ে নিজের ভাবগতিক দেখে নফিসা।

তার কান্নাই পায় এক এক সময়। কাঁদেও। কিন্তু সে অশ্রু না পারে বিস্মৃত স্মৃতির পটকে ধৌত উজ্জ্বল করতে, আর না পারে অবাঞ্ছিত স্মৃতিচিত্রকে ঝাপসা অস্পষ্ট করতে। নিজের কান্না নিজেকেই পীড়িত করে শুধু।

তবু কাজ করে যায় নফিসা। এবং সফলও হয় বইকি।

এ যেন তার মধ্যে দুটো মানুষ কাজ করছে।

একজন চাইছে সর্বপ্রযত্নে পূর্বপ্রতিজ্ঞায় অটল থেকে দায়ুদ কররাণীর সর্বনাশ-সাধনের ব্রত পালন করে যেতে, আর-একজন মনে মনে লালন করছে সেই এক দীন অসহায় অনুতপ্ত দায়ুদের স্মৃতি, ব্যথা বোধ করছে তার আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে।

তাই একজন যখন নষ্টসাহস ছত্রভঙ্গ মুঘলবাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে

সহায়তা করে, গুজর খাঁকে হত্যা করে কররাণী বংশের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়—আর-একজন তখন সেই বংশেরই প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উদ্বিগ্ন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওসমানকে সে ছলনা করতেই গিয়েছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি মনের কোন নিভৃত প্রদেশে সে ওদের জন্য উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছিল এটাও কম সত্য নয়।

আর এই দোটানায় পড়ে আসল মানুষটা অন্তরে অন্তরে যেন ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে—

অবশেষে যখন সত্যিই চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসে তখন আর স্থির থাকতে পারে না। প্রথমজন হার মানে—দ্বিতীয়ারই হয় জয়। সে প্রথমজনকে বোঝায়, 'আর কেন, তোমার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে—এবার আমার কথা শোন, লোকটাকে বাঁচাও। ও নিতান্তই হতভাগা, তোমার এতখানি রোষের যোগ্য নয়।'

দ্বিতীয়াই যেন ঠেলে তাকে রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা বেশে পাঠায় দায়ুদকে ত্রাণ করতে। যেতে যেতেই নিজের আচরণে বিস্ময়ের সীমা থাকে না তার। এ কী করছে সে, যার সর্বনাশের জন্য এত আয়োজন, তাকেই বাঁচাতে চলেছে!

তবু তো সেই দ্বিতীয়ারই জয় হল শেষ পর্যন্ত।

তারই আনুকূল্যে, তারই দয়ায়, শক্তিরূপিণী তার আবির্ভাবেই দায়ুদ কররাণী নিরাপদে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হল।

এবং সেই অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনার পর যে নফিসাকে আর-কেউ দেখতে পায় নি—তার কারণ সে এক রকম পালিয়েই গিয়েছিল; প্রথম বিস্ময়-বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল রণক্ষেত্র থেকে বহুদূরে—ঘন শাল-অরণ্যের মধ্যে।

আসলে সে তখন নিজেকে সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে পারলে যেন বাঁচে। এমন কি নিজের কাছ থেকেও।

কাজটা করে ফেলেই দ্বিতীয়া অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। লজ্জায় প্রথমার কাছে মুখ তুলতে পারছিল না সে।

মনে হচ্ছিল আজ সে-ই মিয়া লুদীর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাঁকে নূতন করে হত্যা করল।...

'ছি ছি! এ কী করলি হতভাগিনী, এ কী করলি! এতবড় বেইমানী করে বসে রইলি! পারলি এত বড় বেইমানী করতে!'

লোকচক্ষুর অন্তরালে নিবিড় অরণ্যের ছায়াঘন অন্ধকার এক কোণে বসে এই প্রশ্নই সে বার বার করেছে নিজেকে। ধিক্কারে ধিক্কারে নিজেকে জর্জরিত করে তুলেছে। উপবাসে, অশ্রুতে, আত্মধিক্কারে এবং উপাসনায় প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করেছে। বার বার খোদার কাছে মিনতি জানিয়েছে এই বলে যে—জঙ্গলে নরখাদক পশুর তো অভাব নেই, বাঘ বা ভালুক—যে-কোন একটা জানোয়ার পাঠিয়ে দাও—শেষ হয়ে যাক সব। নিজের দায়িত্ব বহন করার দায় থেকে অব্যাহতি দাও।

সে যে আর পারছে না।

অয়্ খোদা, এ কী করছ তুমি তাকে নিয়ে—এ কী করছ!

॥ ২৭ ॥

দায়ুদ খাঁ কররাণী তুকারায়ের প্রান্তর ত্যাগ করে সোজা চলে এসেছিলেন কটকের বরবাটী তুর্গে। কোথাও এক বেলার বেশী বিশ্রাম করেন নি। ভেবেছিলেন এত দ্রুত মুঘলবাহিনীর আসা সম্ভব হবে না—তিনি তুটো দিন নিশ্বাস নেবার, ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী স্থির করবার অবসর পাবেন।

কিন্তু তা হয় নি। টোডরমল সে-সময় তাঁকে দেন নি। প্রায় সমান দ্রুত পিছনে পিছনে এগিয়ে এসেছিলেন তিনিও। ফলে দায়ুদ কটক তুর্গে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘিরে ধরেছিলেন দায়ুদকে—নিরন্ধ্র অবরোধ গড়ে তুলেছিলেন তুর্গের চার পাশে।

বরং যদি গোড়াতেই দায়ুদ তাঁর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের জড়ো করবার চেষ্টা করতেন, সর্দারদের একত্র করার চেষ্টা করতেন, আবার পথেই মুঘলবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন—তাহলে হয়ত ইতিহাস দাঁড়াত অন্যরূপ। তা তিনি করেন নি। স্ত্রীপুত্র ছিল কটকে—পাছে পথে ইতস্তত করলে মুঘলবাহিনী অন্য কোন পথে আগেই কটকে পৌছয়—হয়ত এই ছিল তাঁর তুশ্চিন্তা।

তা ছাড়াও হয়ত আর-কিছু ছিল।

আসলে বিস্মিত হয়েছিলেন দায়ুদ, বড় বেশী বিস্মিত হয়েছিলেন। অভিভূত

বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন সে বিস্ময়ের আঘাতে। ভাল করে কিছু ভাববার বা ভেবে সেইমত কাজ করবার কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর। বিহ্বল অবস্থায় অপরের নির্দিষ্ট পথে চলাই যায় শুধু—তাই চলেছিলেন। অনুচররাই একরকম তাঁকে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তিনি পুতুলের মত ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। পথের দিকেও তাকান নি।

অভিভূত হবার কারণও ছিল বইকি।

কত কীই না ঘটে গেল তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে—এই গত কয়েক মাসে। কত অবিশ্বাস্য আপাত-অর্থহীন ঘটনা।

ঐ নারী তাঁর সর্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ। মৃত্যুরও অধিক লজ্জা এবং অপমানের মূল। বার বার আঘাতই পেয়েছেন তার কাছ থেকে। পেয়েছেন চরম সর্বনাশ।

তবে তার কারণ আছে, তার অর্থ বোঝেন।

কিন্তু সেদিন পাকুড়ের জঙ্গলে সে যা করল—যা করল আজ তুকারয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তা দুর্জ্ঞেয়ই রয়ে গেল তাঁর কাছে, রইল চির রহস্যে ঢাকা। যা করেছে তা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। তার মধ্যে কোন দ্বিধা কি সংশয়ের অবকাশ নেই। সে তাঁকে বাঁচিয়েছে আজ—নিজের জীবন তুচ্ছ করে বাঁচিয়েছে। অসংখ্য শত্রুর উদ্যত মারণাস্ত্রের সামনে বুক পেতে দিয়েছে সে—তাঁকে আচ্ছাদিত করতে।

না, নিজের জীবনের কথা ভাবে নি সে, হয়ত আশাও রাখে নি। নিজে মরেই তাঁকে বাঁচাতে গিয়েছিল।

কিন্তু কেন, কেন এ কাজ করতে গেল সে? কেন, কেন?

এই প্রশ্নই তো অহরহ নিজেকে করে যাচ্ছেন দায়ুদ কররাণী।

নিশ্চল নিরুত্তরতার প্রাচীরে ব্যর্থ মাথা খুঁড়ে ফিরে আসছে সে প্রশ্ন। আর সেই ব্যর্থতায় অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। কোন একটা স্বার্থ, কোন একটা উদ্দেশ্য আছে জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হতেন। অথবা—

তার ঘৃণা, তার বিদ্বেষ তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু তার এই মমতা, তার এই জীবন-তুচ্ছ-করা দুঃসাহস—এর যে কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না।

আরও বিস্মিত হয়েছিল দায়ুদ তাঁর নিজের মনের দিকে তাকিয়ে।

এই নারীর হাত থেকে বহু লাঞ্ছনা লাভ করেছেন তিনি—এমন কি পরিচয় হবার পর এই গত কালও। কিন্তু তাতেও ওর সম্বন্ধে যথেষ্ট জালা

বোধ করেন নি। তবে তার একটা কৈফিয়ত ছিল। নিজের অনুশোচনা বা আত্মগ্লানিই এই মনোভাবের কারণ বলে বুঝিয়েছিলেন নিজেকে।

কিন্তু আজকের এই আচরণে শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, শুধু কৌতূহল নয়—যে নিরতিশয় পুলক অনুভব করছেন তাতেই যেন ওঁর বিস্ময়ের সীমা নেই। এই পরাজয়ের মধ্যে যত গ্লানি, যত লজ্জা, যত আত্মধিক্কার, বিগত ও বর্তমান অসংখ্য বিপদের আশঙ্কা, সব ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে একটা আনন্দের বন্যা, একটা অপরিসীম নাম-না-জানা খুশির জোয়ার। এত গেছে তা যাক, যা পেয়েছেন তা যেন তাঁর সর্বস্ব যাওয়ারও ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে আজ।

এই পরম পাওয়ার অপরূপতাতেই আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে আছেন তিনি।

তবে কি—?

গোপন প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে বার বার—সেটা মনের কাছেও প্রকাশ করতে শঙ্কিত হচ্ছেন, যদি যুক্তি এসে আবেগকে ধিক্কৃত করে, প্রত্যক্ষ কঠোর সত্যের সামনে কল্পনাকে অপমানিত হতে হয়—এই আশঙ্কায়।...

অন্তরের এই আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থার জন্যই—যাকে নিতান্ত পরাজয় এবং শত্রুর অনুকম্পায় আত্মরক্ষার লজ্জা বলে ভুল করল অনুচররা—কিছু করতে পারেন নি দায়ুদ কররাণী। কোন মতে, অন্ধ যেমন ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে অপরের কাছে আত্মসমর্পণ করে পথ চলে, তেমনিভাবেই সঙ্গীদের উপর নির্ভর করে বরবাটীতে চলে এসেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, কর্তব্য স্থির করা এবং কাজে নামবার আগে রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করে নেবেন—কয়েকটা দিন চুপ করে বসে থেকে বিক্ষিপ্ত মনটাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু সে অবসর পেলেন না। বস্তুত নিশ্বাস ফেলবার আগেই যেন মুঘলরা ঘিরে ধরল তাকে।

এখন এই অবরোধের মধ্যেও মানুষের যা সাধ্য তা সবটাই করলেন দায়ুদ করবাণী। যে-কটা দিন প্রতিরোধ করা সম্ভব—সে কদিনই করলেন। তার-পর অবস্থা যখন মানব-সহনশীলতার সীমা লঙ্ঘন করল—আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় রইল না, তখন সেই প্রস্তাবই করে পাঠালেন।

একটি মাত্র শর্তসাপেক্ষে তিনি মুঘল সেনাপতির পায়ের কাছে নিজের অস্ত্র এবং সম্মান সমর্পণ করতে রাজী আছেন। সে-শর্ত আর-কিছু নয়—তাঁর স্ত্রী-পুত্রকন্যার নিরাপত্তা। আর কোন প্রার্থনা নেই তাঁর, অন্য কোন অনুগ্রহই চাইবেন না তিনি—শুধু ওদের দূরে কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে দেওয়া হোক।

মুঘল সেনাপতির পক্ষে টোডরমল তৎক্ষণাৎ সে আশ্বাস দিলেন তাঁকে। দূতকে বললেন, 'অবশ্যই তা দেওয়া হবে। দায়ুদ খাঁ যেন সে-জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করেন। তাঁর অন্তঃপুরিকারা কেউ দিল্লীশ্বরের দুশমন নয়, তারা কোন অপরাধ করে নি তাঁর কাছে। তারা নিজেদের মালপত্র নিয়েই চলে যেতে পারবে—যেখানে খুশি।'

অতঃপর মুঘল শিবিরে বিজয়োল্লাসের সাড়া পড়ে গেল।

তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয়ে গেল উৎসব।

মোল্লা মৌলবীদের অকাতরে অর্থ বিতরণ করলেন মুনিম খাঁ। স্থানীয় দরগায় সিন্নি পাঠালেন। প্রত্যেক সৈন্য-শিবিরে মিষ্টান্ন, মদ ও মোহর বিলোবার হুকুম দিলেন।

শুধু সতর্ক করে দিলেন সবাইকে এই বলে যে, 'এখনও শত্রু ধরা দেয় নি, এখনও বেইমানী করার ঢের সুযোগ আছে। বেসামাল হয়ো না কেউ—হুঁশিয়ার!'

॥ ২৮ ॥

পরের দিন প্রভাতে দুর্গদ্বার খোলা হতে প্রথমেই সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এলেন দায়ুদ কররাণী। দেহ সোজা, মাথা উঁচু, দৃষ্টি তাঁর সামনের দিকে শূন্যে নিবদ্ধ, ললাটে সামান্য একটু ভ্রূকুটি।

তিনি বেরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন—মুঘলসৈন্যরা দূর থেকে ঘিরে রইল তাঁকে।

দায়ুদ তখনই যেতে রাজী নন, তিনি চান তাঁর সামনেই শর্ত পালিত হোক, মুঘলরাও চায় তিনি না কোন কৌশলে সেই সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারেন কেউই কাউকে বিশ্বাস করে না।

দায়ুদ সরে দাঁড়াতেই পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল ভেলভেটের ঘেরাটোপ

কেওয়া অসংখ্য শিবিকা। তার পিছনে ঘোড়া, খচ্চর এবং বলদের পিঠে পুরনারীদের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র।

শেষ শিবিকা ও শেষ বলদ বেরিয়ে যাবার পর দায়ুদ ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন—মুঘল-শিবিরের দিকে। দশজন মাত্র দেহরক্ষী তাঁর সঙ্গে, তাও নিরস্ত্র। শুদ্ধমাত্র দায়ুদের কোমরবন্ধেই একটি তরবারি আছে—খাপে ঢাকা।

তাঁর ললাটের সেই সামান্য ভ্রূকুটিটাও মিলিয়ে গেছে—প্রশস্ত ও প্রশান্ত ললাটে নেমেছে একটা নির্বিকার নির্লিপ্ততা। কিছুতেই যেন কোন ঔৎসুক্য নেই তাঁর—পৃথিবীর কোন কিছুতেই যেন আর তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না—পারবে না কেউ কোন আঘাত হানতে। আসলে জীবন সম্বন্ধেই যেন কোন ঔৎসুক্য বা আসক্তি নেই।

মহামান্য খান-ই-খানান সেদিন দিল্লীশ্বর আকবর শা'র প্রতিনিধিরূপে দরবার দিয়েছেন। বিরাট তাঁবুতে বসেছে সেই দরবার। সেইখানেই গিয়ে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে দায়ুদকে। তাঁবুর বাইরে ঘোড়া থেকে নেমে নতমস্তকে অভিবাদন করতে করতে এগিয়ে এলেন দায়ুদ কররাণী, তারপর খাপসুদ্ধ তলোয়ারটি খুলে মুনিম খাঁর পায়ের কাছে সিংহাসনের সামনে রেখে দিলেন।

উৎসবের সুর সকলেরই প্রাণে লেগেছে কাল থেকে—মায় মুনিম খাঁরও। এতক্ষণে তিনি বেশ প্রফুল্লই ছিলেন—কিন্তু কে জানে কেন এখন দায়ুদ খাঁকে দেখার পরই তাঁর মুখ মেঘের মত অন্ধকার হয়ে উঠল, দৃষ্টি হল ভ্রূকুটিবদ্ধ।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দায়ুদের দিকে তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মুনিম খাঁ—'যে রমণীর আঁচলের তলায় ওড়নার আড়ালে সেদিন আত্মরক্ষা করেছিলে মহাবীর দায়ুদ খাঁ কররাণী—তাকে কোথায় রেখে এলে? তোমার ভূতপূর্ব উজীরের সেই বাঁদীকে?'

চমকে উঠলেন দায়ুদ খাঁ। আর যাই হোক, সকল রকম শিষ্টাচার-বিরোধী এই শ্রেণীর সম্ভাষণ বা প্রশ্নের জন্য তিনি ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না।

উপস্থিত সভাসদ্‌রাও সকলে বিস্মিত হলেন। এ ধরনের প্রশ্ন কেউই আশা করেন নি। টোডরমল তাঁর আসন থেকে সামান্য উঠে আবার কতকটা হতাশ ভাবেই বসে পড়লেন। তাঁর চঞ্চলতা তাঁর অস্থির ভাব চাপা রইল না। কিন্তু বলতে পারলেন না কিছুই। মুনিম খাঁ তাঁর উপরওয়ালা। কথা বলবার মালিক তিনিই।

দায়ুদ খাঁ চমকে একবার মাত্র মাথা তুলেই আবার মাথা হেঁট করেছিলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

মুনিম খাঁ উত্তরের জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যেন রোষে ফেটে পড়লেন।

'কী, প্রশ্ন শুনতে পাও নি আমার? এ কী বেয়াদবি! জবাব দাও।'

'আমি জানি না জনাব।'

'মিথ্যা কথা।' গর্জন করে উঠলেন মুনিম খাঁ—খান-ই-খানান।

মুহূর্তে দায়ুদ খাঁ কররাণীর দুই চোখ জ্বলে উঠল। আরক্ত হয়ে উঠল চোখ মুখ। অভ্যস্ত হাত—বোধ করি বা তরবারির খোঁজেই—কোমরবন্ধের দিকেও গেল একবার। তারপরই আবার—বর্তমান অবস্থায় ক্রোধ ক্ষোভ অভিমান কোনটারই কোন মূল্য নেই বুঝে—অসহায় ভাবে একবার উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন। শুধু দুর্বার ক্রোধে দুই রগের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, দপদপ করতে লাগল মাথার মাঝখানটা—অসহ একটা আক্রোশ ও জিঘাংসা মাথা কুটতে লাগল বুকের মধ্যে। কিন্তু আজ তিনি পরাজিত, শত্রুকরতলগত, অপরের দয়ার ভিখারী। আজ বুঝি প্রতিবাদ করারও এতটুকু ক্ষমতা নেই তাঁর, এ বেয়াদবির যোগ্য প্রত্যুত্তর তো দূরের কথা।

আজ তাঁর মত হতভাগ্য বুঝি আর-কেউ নেই।

তবু তিনি উত্তর দিলেন শেষ পর্যন্ত।

অবশ্য তার আগে অনেকক্ষণ সময় লাগল তাঁর এ অপমান সামলে উঠতে।

তারপর দৃপ্ত দুই চোখ মুনিম খাঁর চোখের ওপর রেখে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস তো এখনও পর্যন্ত করি নি জনাব, তবে আপনার কাছে তালিম পেলে হয়ত চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

অস্ফুট, অতি মৃদু হলেও স্পষ্ট একটা বাহবার তরঙ্গ বয়ে গেল উপস্থিত মুঘল সভাসদদের ওপর দিয়ে।

বাহবা বা! এই তো সুলেমান কররাণীর ছেলের যোগ্য উত্তর।

কিন্তু মুনিম খাঁর দুই চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করল, দুই হাত হয়ে উঠল মুষ্টিবদ্ধ। এমনই বজ্রমুষ্টি যে নিজের নখ নিজের করতলে চেপে বসে রক্তপাতের কারণ ঘটাল।

তিনি আবারও গর্জন করে উঠলেন, 'এত বড় গুস্তাকি তোমার!...কোথায় কার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা জান না!'

তখন দায়ুদ কররাণীও মরীয়া।

তিনি মাথা তুলেই জবাব দিলেন, 'জানি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জালালুদ্দীন আকবর শার এক ভৃত্যের সামনে।'

মাথাটা যে আর কোনমতেই বাঁচানো সম্ভব নয়—তা সবাই বুঝল।

মুনিম খাঁ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন রাগে। সে উষ্মা দমন করে কণ্ঠস্বরকে সক্রিয় করে তুলতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তাঁর।

একটু সামলে নিয়েই তিনি ডাকলেন, 'দিলাওয়ার খাঁ!'

'জী জনাব!' দিলাওয়ার খাঁ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এই বেত্‌তমিজকে এখনই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। এর প্রাণদণ্ড দিলাম আমি।'

আবারও একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠল উপস্থিত সভাসদ্দের মধ্যে।

নিঃশব্দ সে চাঞ্চল্য, তবু তার সে স্ফীতি টের পেলেন মুনিম খাঁও। তাঁর ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি আরও কঠিন হয়ে উঠল। স্পষ্ট বিরোধিতা ও ঔদ্ধত্য সে দৃষ্টিতে।

টোডরমল এবার উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু জনাব—'

'বলুন রাজা সাহেব।' শান্ত শীতল—ইস্পাতের ফলার মতই শানিত কণ্ঠ মুনিম খাঁর।

'এত তাড়াতাড়ি এ কাজটা করা কি উচিত হবে—বিশেষ যখন দায়ুদ কররাণী আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন?'

'আমার উচিত অনুচিত আমাকেই বুঝতে দিন রাজা সাহেব।…শাহেন-শাহ্‌কে কৈফিয়ত দিতে হয় আমিই দেব। দায়ুদ কররাণী আত্মসমর্পণ করলে আমরা তার প্রাণ ভিক্ষা দেব—যতদূর মনে পড়ে—এমন কোন শর্ত আমরা করি নি। যাদের মুক্তি দেবার শর্ত করেছিলাম—তাদের মুক্তি দিয়েছি।'

টোডরমল মাথা হেঁট করে বসে পড়লেন আবার। অপমানে তাঁরও মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় কী? এ অপমান তিনি প্রায় ইচ্ছা করেই, মাথা বাড়িয়েই নিতে গিয়েছিলেন।

দায়ুদ একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আবার মাথা হেঁট করলেন —কিন্তু এবার আর তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই—আছে চরম তাচ্ছিল্য ও অবহেলা। শুধু যেন অনভিপ্রেত লোকের মুখ দেখতে হবে বলেই মাথা ও দৃষ্টি হেঁট করেছেন—দয়া কি করুণাপ্রার্থী হিসেবে নয়।

'দিলওয়ার খাঁ, আমার আদেশ শুনতে পাও নি? অপেক্ষা করছ কিসের জন্য?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন মুনিম খাঁ।

'জী জনাব।'

দিলওয়ার খাঁ এগিয়ে আসেন দায়ুদ কররাণীর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই—অকস্মাৎ দরবারের প্রবেশ-পথে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। উপস্থিত সভাসদ ও সেনানীরা যেন সসম্ভ্রমে দু ভাগ হয়ে গিয়ে কাকে পথ দিচ্ছেন।

মুনিম খাঁ বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেন। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন।

'বেটী!'

টোডরমল তাকিয়ে দেখলেন—সেই দেবী।

মুঘল সেনানীরাও চিনল, পুর্বের দেখা সেই দিওয়ানা সন্ন্যাসিনীকে, তুকারয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা দায়ুদের ত্রাণকর্ত্রীকে।

বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল সভাকক্ষে। তারই মধ্য দিয়ে নফিসা সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল মুনিম খাঁকে।

'জনাব, আমার একটা আর্জি আছে। ততক্ষণ দিলওয়ার খাঁকে একটু অপেক্ষা করার আদেশ দেবেন?'

স্পষ্ট বাচনভঙ্গী। কণ্ঠস্বরেও কোন জড়তা নেই। আর্জি বলল বটে কিন্তু বলার ভঙ্গীতে প্রার্থীর দীনতা ফুটল না।

তার দিকে তাকিয়ে ইতিমধ্যেই কোমল হয়ে এসেছে মুনিম খাঁর দৃষ্টি, মুখ হয়ে উঠেছে হর্ষোৎফুল্ল, উজ্জ্বল।

'বল বেটী, বল কী চাও। দিলাওয়ার খাঁ, একটু দাঁড়াও।'

এই বালিকাটি সম্বন্ধে খান-ই-খানানের অত্যধিক উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিয়ে যারা বিদ্রূপ করত, তারা সবাই বিস্মিত হল 'বেটী' সম্বোধনে। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না—শুধু নীরব কৌতূহলে ঘাড় তুলে তাকিয়ে রইল সবাই।

'জনাব, আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘলদের অভিযানে মুঘলপক্ষকে সামান্য কিছু সহায়তা করার সৌভাগ্য এই ভিখারিণীর হয়েছিল—আশা করি তা ভুলে যান নি!'

'না, ভুলি নি নফিসা। তুমিই শাহেনশাহ্‌কে পরামর্শ দিয়ে হাজীপুর কিলায়

আগুন ধরিয়েছিলে, যার ফলে বিনাযুদ্ধে আমরা পাটনা দখল করতে পেরেছি। পাঠানদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তুমিই তিনপাহাড়ের গিরিবর্ত্মে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে পাঠানবাহিনীর পিছনে, তার ফলে সেবারেও বিনাযুদ্ধে আমরা জিতেছি। আবার মেদিনীপুরের জঙ্গলেও তুমিই আমাদের পথ দেখিয়েছ, তুকারয়ের যুদ্ধেও প্রচুর সহায়তা করেছ আমাদের, শুনেছি গুজর খাঁও তোমারই শরে নিহত হয়েছেন। তোমার কাছে আমাদের মুঘলবাহিনীর অনেক ঋণ, তা আমি জানি। অবসর পেলেই একথা দিল্লীশ্বরকেও জানানো হবে—বেটী, আমাদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ত্রুটি হবে না। তবে পুরস্কৃত করার মালিক শাহেনশাহ্ আকবর বাদশা।'

'দিল্লী হানৌজ দূরস্ত্, জনাব। দিল্লীশ্বর বহুদূরে, আপনি সামনে। আপনিই আমাদের কাছে তাঁর প্রতিনিধি। আমি আপনার কাছেই সামান্য একটি পুরস্কার চাইছি। আজ অবধি চাই নি—কথা দিচ্ছি, আর কখনও চাইব না।'

'বল কী চাও ?'

'এই দায়ুদ কররাণীর মুক্তি। ওকে নিরাপদে চলে যেতে দিন জনাব—এবারের মত। যদি আবার কখনও আপনাদের বিরোধিতা করে—যা খুশি তাই করবেন। আমি কিছু বলব না।'

অকস্মাৎ মুনিম খাঁর সামনে যেন বজ্রপাত হল।

যখন দিলাওয়ার খাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিল নফিসা, তখনও এটা আশঙ্কা করেন নি তিনি। বরং উল্টো বুঝেছিলেন। ভেবেছিলেন নিজে হাতে ওর প্রাণবধ করতে চায় বলেই সাধারণ ঘাতকের হাতে ছেড়ে দিতে ওর আপত্তি।

এ কী বলছে নফিসা, ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল !

তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না না নফিসা, এ কী বলছ ! তা হয় না।'

'আপনি আমাকে পুরস্কার দিতে বাক্যবদ্ধ হয়েছেন জনাব।'

নফিসার কণ্ঠস্বর অকম্পিত ঠিক না হলেও অনেকটা শান্ত।

'কিন্তু—কিন্তু বেটী—এই পিশাচটা মিয়া লুদীর হত্যাকারী। তাঁকে অন্যায় করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে বধ করেছিল।' ছেলেমানুষের মতই বলে ওঠেন খান-ই-খানান।

'জানি জনাব। তবে এ-ও জানি তিনি জীবিত থাকলে তাঁর প্রভুপুত্রকে তিনি ক্ষমাই করতেন।'

মুনিম খাঁ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। সভাসদরাও সকলে হতচকিত, বিস্ময়চঞ্চল।

কেবল টোডরমল উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু নফিসা বেগমের কোন পুরস্কার পাওনা আছে কিনা জনাব ভেবে দেখা দরকার সেটা। মুঘলবাহিনীকে সে কয়েকবার সাহায্য করেছে তা আপনার মুখে শুনলাম বটে, কিন্তু তুকারয়ের যুদ্ধে আমাদের শত্রুপক্ষকে রক্ষা করেছে সেটাও আমরা চোখে দেখেছি।'

নফিসা তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। স্থির-নেত্রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'সেটা বেইমানীর পর্যায়ে পড়ে কি রাজা সাহেব! আমি মুঘলদের বেতন-ভুক নই। যখন ভাল মনে করেছি সম্মুখযুদ্ধে প্রতিপক্ষের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, প্রকাশ্যভাবে। তাতে মুঘলদের যে উপকারগুলো আগে করেছি তার মূল্য শোধ যায় না।'

মুনিম খাঁ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নফিসার মুখের দিকে চাইলেন।

বললেন, 'বেশ তো—এখন না হয় আমরা ওকে বন্দী করেই রাখছি—প্রাণদণ্ড না হয় না-ই দিলাম।'

'না জনাব। ওঁর মুক্তিই আমি চেয়েছি। এ-ই আমার পুরস্কার—আমার কাজের মজুরি। তার কম নিতে আমি রাজী নই।'

আবারও অসহায় ব্যাকুলভাবে সভাসদ্‌দের দিকে চান মুনিম খাঁ।

'আপনারা কী বলেন? রাজা টোডরমল, আপনার কী পরামর্শ?'

মুনিম খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝি করুণাই হয় রাজা সাহেবের। তিনি বলেন, 'আপনার কর্তব্য আপনিই বুঝবেন। শাহেনশার কাছে কৈফিয়ত দেবার জিম্মাদারও আপনি। তবে—ন্যায়ত এ মেয়েটি যা চাইছে তা চাইতে পারে বইকি জনাব।'

'বেশ, তাই হোক।' একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন মুনিম খাঁ, 'তোমার ঋণ তোমার মূল্যেই আমরা শোধ করলাম বেটী।...দায়ুদ খাঁ কররাণী, আপাতত তুমি মুক্ত। তুমি এখনই এ দরবার ত্যাগ করতে পার। যত শীঘ্র সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে তুমি এবং আর কখনও দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করবে না—তোমার কল্যাণের জন্যই এই আশা আমরা পোষণ করব।...দিলাওয়ার খাঁ, ওঁদের পথ দেখিয়ে শিবিরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দাও। প্রহরীদের বলে দাও কেউ যেন না ওঁদের কোন রকম বাধা দেয়। শুধু আমাদের না লোকসান করতে পারে—এইটুকু নজর রাখবে।'

দায়ুদ খাঁ ও তাঁর দশজন দেহরক্ষী অনুচর দরবার তথা মুনিম খাঁকে নীরবে অভিবাদন জানিয়ে কুর্নিশ করে পিছু হঠতে হঠতে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে, নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে।

যাবার আগে দায়ুদ খাঁ একবার ফিরে চেয়েছিলেন নফিসার দিকে, কিন্তু নফিসা তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে—চোখে চোখ মিলল না।

যতক্ষণ না ওঁরা দরবারের বাইরে চলে গেলেন—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নফিসা। তারপর সেও একটা অভিবাদন করে সভা ত্যাগ করতে উদ্যত হল।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মুনিম খাঁ। স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে সিংহাসন থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন।—'ও কী, তুমি কোথায় যাচ্ছ বেটী? না না, তুমি যেও না। তোমাকে যে আমার বড় দরকার!'

'মাফ করবেন জনাব।' কেমন এক রকম করুণভাবে স্খলিত ভগ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয় নফিসা, 'আমার কিছুদিনের জন্য লোকালয়ের বাইরে, মানুষের সমাজের বাইরে যাওয়া বড় দরকার। বিস্তর অপরাধ জমে উঠেছে খোদার কাছে—কিছুদিন অন্তত নির্জনে বসে তার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করা দরকার।'

'কিন্তু বেটী, তোমার কাছেও যে আমার বহু অপরাধ জমে আছে! আমিই—আজ এই প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করছি—আমিই তোমার পিতা। এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কাছে দুটো দিন থেকে আমার স্তূপীকৃত অন্যায়ের একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে দেবে না?...দুটো দিনের জন্যও তোমার সেবা ভোগ করতে দেবে না আমাকে?'

যেন চমকে উঠল নফিসা। যেন একবার ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে দেখল মুনিম খাঁর মুখের দিকে, ক্ষণিকের জন্য বুঝি একটা লোভের আলোও খেলে গেল মুখে চোখে—কিন্তু তারপরই, হয়ত বা নিজের অন্তরের প্রশ্ন ও অনুনয়ের উত্তরেই—সবেগে ঘাড় নেড়ে বলল, 'কন্যার কাছে পিতার কোন অন্যায় কোনদিন হতে পারে না বাপজান।...আর তাছাড়া আমি আপনার সেবার যোগ্যও নই,—তাই অভাগিনী কন্যার অক্ষমতা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন। আদাব বাপজান, বন্দেগী রাজাসাহেব!'

স্তম্ভিত বিমূঢ় মুনিম খাঁ আর কোন কথা কইবার কি বাধা দেবার আগেই নফিসা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ২৯ ॥

এতদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও সহজাত বুদ্ধি বার বার বলতে লাগল—'পালাও, পালাও। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়—শত্রুর সংস্পর্শ থেকে যত দূরে যেতে পার ততই মঙ্গল। অসহায় নিঃসম্বল অবস্থা তোমার—আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই—সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব এই প্রবল শত্রু আর তোমার মধ্যে সুদূর ব্যবধান রচনা কর। আজকের সূর্য অস্ত যাবার আগে অন্তত শত যোজন দূরত্বে পৌঁছনোই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের মন না মতি, বিশেষত শত্রুর মতি পরিবর্তিত হতে কতক্ষণ!'

অনুচর সঙ্গীরাও তাই বোঝাতে লাগল।

অনুনয়—মিনতি করতে লাগল বার বার।

বহুদিনের বিশ্বস্ত সেবক তারা—তারা তাঁর কল্যাণই কামনা করে। বহুদিনের অভিজ্ঞও বটে; তাদের কথা শোনা শ্রেয় শুধু নয়—উচিতও।

তবু তখনই কটক ছেড়ে বহুদূরে যেতে পারলেন না দায়ুদ কররাণী।

কেন পারলেন না—সে কারণটা বোধ করি তাঁর কাছেও স্পষ্ট নয়। সকল অভিজ্ঞতা, সকল যুক্তিতর্ক, সকল বুদ্ধি-বিচারের অতীত যে একটা বস্তু প্রত্যেক মানুষের বুকে গোপনে বাস করে—যাকে হৃদয়াবেগ বলে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছেন কবি ও কোবিদরা—তারই অমোঘ আর অলঙ্ঘ্য আকর্ষণ তাকে দুর্নিবার বলে ধরে রাখল কটকের অনতিদুশ্চর সীমারেখায়—কিছুতে কোন-মতে তার সে অদৃশ্য শক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না—হৃত-সিংহাসন, হৃত-সর্বস্ব সুলতান দায়ুদ খাঁ।

তাই দিনের আলোকে শহরের সীমানা ত্যাগ করলেও অপরাহ্ণের আবছায়া ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন।

ওঁর দেহরক্ষীরা সকলে চলে যায় নি—উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুঘল শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রভুর ভাগ্য-পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিল। দায়ুদ মুঘল শিবির থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র ঘিরে দাঁড়াল তারা। কিন্তু না সেই মৃত্যু-পথযাত্রার বান্ধব আর না এই দেহরক্ষীর দল—কাউকেই সে পুনর্গমনের পথে সঙ্গে নিলেন না তিনি। সকলের সম্মিলিত উপরোধ অনুরোধ সতর্কবাণী উপেক্ষা করে—নদীতীরের নিবিড় জঙ্গলে তাদের অপেক্ষা করতে বলে—একাই ফিরে এসে ঢুকলেন শহরে।

রাজপথ ধরে নয় অবশ্য—কাঠজুড়ির সুপ্রাচীন জনবিরল বাঁধের ওপর দিয়েই শহরের সীমানায় প্রবেশ করলেন তিনি। কেমন যেন তাঁর মনের মধ্যে কে বলতে লাগল যে সেও শহর ছেড়ে চলে যায় নি এখনও—যাকে তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ—সমস্ত সত্তা খুঁজছে। এই নির্জন নদীতীরেই কোথাও হয়ত শ্রান্তদেহে অবসন্ন-মনে বসে আছে।

হয়ত—

না, আর যে 'হয়ত'টা অনুমান করতে মন চাইছে—হয়ত তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে সে—এতটা অনুমানের সাহস তাঁর নেই।

চৈত্রের শেষে কাঠজুড়ির বিস্তৃত চড়া ধু-ধু করছে—নির্জন, নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে এক-একবার দমকা দক্ষিণা বাতাসে ছোটখাট বালির ঝড় উঠছে বটে কিন্তু তার শব্দ নেই, অন্তত এতদূর আসে না সে শব্দ। শুধু একটা অসহ্য তাপ ভেসে আসছে সেই আতপ্ত হাওয়ায়—সারাদিনের নির্মেঘ আকাশের বহ্নি-ইতিহাস বহন করে।

তারই মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন দায়ুদ—ক্লান্ত, মন্থর, আপাত-উদ্দেশ্যহীন গতিতে। তখনও পর্যন্ত অস্নাত, অভুক্ত—সকাল থেকে মুখে এক বিন্দু জলও দেবার অবসর মেলে নি। ঘোড়ার পিঠে চামড়ার সুরাপাত্র সর্বদা ভর্তি থাকে—কিন্তু একেবারে খালিপেটে সুরাপান করতে রুচি হয় নি। ফলে দেহ এমনিতেই ভেঙে পড়বার কথা—তার ওপর সারাদিন ধরে তাঁর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে পা দুটোর যে এখনও পর্যন্ত এতটুকু বহন-ক্ষমতা আছে—সেইটাই বিস্ময়ের কথা!

সুদূর নদীপারের গহন অরণ্যে সূর্য নেমে পড়েছেন বহুক্ষণ। ঠিক অস্ত না গেলেও বেলা আর নেই। ফলে ওপার এপারের সুবিস্তীর্ণ চড়ায় এবং বাঁধে একটি সুস্নিগ্ধ ছায়া নেমে এসেছে কিন্তু একেবারে অন্ধকার হতে এখনও কিছু দেরি। সেই ম্লান আলোতে ক্লিষ্ট চোখ দুটি প্রাণপণে মেলে বাঁধ এবং বাঁধের পাশের ঝাউ ও শালবন দেখতে দেখতে চললেন দায়ুদ। যাকে খুঁজছেন তার মুখের পুর্ণ বর্ণনা আজও দিতে পারবেন না তিনি, এখনও ভাল করে তাকে দেখাই হয় নি। কিন্তু তবু তার উপস্থিতি তিনি সহস্র লোকের ভীড়েও টের পাবেন—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

যদি শেষ পর্যন্ত দেখা না পান?

তাহলে কী করবেন তা এখনও জানেন না। ঠিক ভাবতেও পারছেন না, অথবা মন চাইছে না ভাবতে ; সে সম্ভাবনাটা মনের কোণে আড়ালে উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন দু হাতে। দেখা যে তাঁকে পেতেই হবে। নইলে—

নইলে হয়ত শেষ পর্যন্ত ফিরে যাবেন—আর ফিরতেই তো হবে—কিন্তু, না না, দেখা তিনি পাবেনই।

ক্লান্ত পা দুটোকে যেন চাবুক মেরে সক্রিয় করে তোলেন দায়ুদ, অর্ধমুদিত চোখ দুটো বিস্ফারিত করেন জোর করে—

ধু-ধু রুক্ষ বালির চড়ায় একটা কুকুর হেঁট হয়ে কী খুঁজছে, হয়ত শুকনো শুঁটকী মাছ অথবা আর কোন খাদ্য। এ ছাড়া ওদিকে জনপ্রাণী নেই। এদিকেও দীর্ঘ বাঁধের যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়—দু-একটা ছাগল কি গোরু এবং গাছের ডালে দু-একটা বানর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তাই সাবধানে বাঁধের ধারে ছায়ান্ধকার গাছতলাগুলোই দেখতে দেখতে চললেন দায়ুদ খাঁ।

অবশেষে এক সময় তাঁর এই সাধনা পুরস্কৃত হল। একটা বড় কাঁঠাল-গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কে যেন বসে আছে! দূরে—অনেক দূরে, ভাল করে দেখা গেল না মানুষটাকে, এমন কি অন্য লোকের ক্ষেত্রে হয়ত পুরুষ না স্ত্রী তা-ই সন্দেহ উপস্থিত হত—কিন্তু দায়ুদের আর কোন সংশয় রইল না।

যা দেখার তিনি দেখে নিয়েছেন।

তাঁর আশা বা অনুমান কোনটাই বিফল হয় নি।

দরবারী তাঁবুর বাইরে নক্সিা বেগমেরও ঘোড়া প্রস্তুত ছিল, সুদক্ষ শিক্ষিত ঘোড়া—তাই সভাস্থ সকলের বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা বা বিহ্বলতার সামান্য সুযোগেই সে নিরাপদে ও প্রায়-সবার-অলক্ষ্যে মুঘল অধিকারের বাইরে চলে যেতে পেরেছিল। তার পক্ষে এই বাকী দুই প্রহর সময়ে আরও বহুদূর চলে যাবার কথা।

কিন্তু সেও তা পারে নি।

আর কেন পারে নি—তা সেও জানে না।

কিসের জন্য অপেক্ষা করছে সে, কার জন্যে?

এ প্রশ্ন যেন নিজেকে করবার সাহস নেই তার।

তার জীবনের ব্রত সফল না হলেও সমাপ্ত।

আর এখানে বা যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানির মধ্যে তার থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই তার লোকালয়ে। কোথাও কোন নির্জন অরণ্যে, মানুষের দৃষ্টির বাইরে বসে অনুতাপের অশ্রুজলে এই পাপ, এই কালিমা ধুয়ে না ফেলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তার—শান্তি নেই। তাছাড়া—একবার খোদার সঙ্গেও মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে। তার জীবন নিয়ে, তাকে নিয়ে এই ছেলেখেলা করার একটা কৈফিয়ত চায়। কেন, কেন এমন করবেন তিনি—কোন্ অধিকারে! তার জন্ম থেকেই শুধু তার অদৃষ্টে বিড়ম্বনা লিখে রেখেছেন তিনি কেন?

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হলেও—সবাইকে ছেড়ে, সব ছেড়ে নির্জনে যাওয়া দরকার।

অথচ—অবাধ্য পা দুটো কিছুতেই যেন যেতে চাইছে না। অথবা মনের তাগিদ নেই বলেই পা দুটোর এত সাহস।

কী আছে এখানে? আরও কিসের প্রত্যাশা তার?

এ প্রশ্নের জবাব পায় নি সে সারাদিনেও—অথচ এখান ছেড়ে যেতেও পারে নি।

সবার অলক্ষ্যে চলে এসেছে শুধু এই জনবিরল নদীতীরে। আর কিছু না হোক—নিজেকে নিয়ে থাকতে পারবে সে এখানে। এধারে মানুষের যাতায়াত কম, যদিই বা কেউ এসে পড়ে—তাকে চিনবে না, বিব্রতও হতে হবে না পরিচিত দৃষ্টির সামনে পড়ে—

বেলা দ্বিতীয় প্রহর পার হবার আগেই এখানে পৌঁছেছে সে—তারপর থেকে ঠিক একভাবে—এই একই গাছতলায় বসে আছে। কোথাও নড়ে নি। ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে বাঁধে ওঠবার আগেই, লোকালয়ের ধারে। যাক যেখানে খুশি; যার খুশি ধরে নিক। আর ওতে দরকার নেই তার। যেখানে হোক এই পা দুটোই টেনে নিয়ে যেতে পারবে—এখন আর কোন তাড়া তো নেই।

শেষ-চৈত্রের সূর্য তার চারপাশে অগ্নিবৃষ্টি করেছে সারাদিন ধরে—তৃতীয় প্রহর পার হবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ছায়া সরে গেছে মাথায় ওপর থেকে—রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে, মুখে, মাথায়। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে নি সে, হয়ত বুঝতেও পারে নি। যেমন একদৃষ্টে কাঠজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুময় চড়ার মধ্যেকার ক্ষীণ স্রোত-রেখাটির দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল—তেমনিই রইল।

কেন সে ক্ষমা করল—না, ক্ষমা সে এখনও করে নি—রক্ষা করল তার মালিকের হত্যাকারীকে—এই প্রশ্নটাই বার বার করতে চাইছে সে।

সে কি শুধু দয়া? শুধু অনুকম্পা?

না কি কৃতজ্ঞতা?

সেদিন বীরভূমির সেই নিবিড় অরণ্যে সর্বনাশিনী শত্রুনারীকে হাতের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল দায়ুদ খাঁ—সেই কৃতজ্ঞতা?

অথবা অনুকম্পা-কৃতজ্ঞতার বাইরেও একটা কিছু আছে—যেটার কথা সেদিন থেকে কিছুতেই প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনতে সাহস করছে না নফিসা।

পশ্চিমাকাশের রক্তচ্ছটা-প্রতিফলিত কাঠজুড়ির গলিত স্বর্ণস্রোতের দিকে চেয়ে চেয়ে এই প্রশ্নই বার বার করতে থাকে নিজেকে।

দায়ুদ খাঁ কররাণী একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আস্তে ডাকলেন, 'নফিসা!'

গলাটা আশ্চর্য রকম শুকিয়ে গেছে তাঁর। শব্দগুলো স্পষ্ট উচ্চারিত হচ্ছে না—বিকৃত শোনাচ্ছে নিজের কানেই।

চমকে উঠল নফিসা। চমকে কেঁপে উঠল।

কেঁপে উঠল আবেগে নয়—ভয়ে।

সে ভয় ওর নিজেকেই।

ওর মনে হল—সামনে যে এসে দাঁড়িয়েছে সে বাস্তব কেউ নয়। এ ডাকও কল্পনা। একাগ্র একমনে যার কথা সে ভাবছিল, যার ছবি সে এতক্ষণ স্পষ্ট দেখছিল ঐ নদীজলের স্বর্ণপটে—তাকে তার ক্লান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কল্পনাই করছে চোখের সামনে।

তাই সে উত্তরও দিল না—দাঁড়ালও না। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

হয়ত তার মনের ভাব বুঝলেন দায়ুদ, হয়ত বুঝলেন না।

তিনি ওর পাশেই বসে পড়লেন—কাঁঠালগাছটার দুটো উঁচু-হয়ে-থাকা শেকড়ের মাঝখানে, কাঁকুরে কঠিন জমির ওপর। তারপর ধীরে ধীরে, যেন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে, ওর স্খলিত শিথিল ডান হাতখানা নিজের দুই হাতে তুলে নিয়ে আবারও তেমনি কম্পিত, বিকৃত কণ্ঠে আস্তে ডাকলেন, 'নফিসা!'

ওঁর ঐ দীন কুণ্ঠিত ভঙ্গী, এই সসঙ্কোচ আহ্বান—সর্বোপরি জন্মাবধি রাজসুখে অভ্যস্ত রাজ্যেশ্বরের এই কঠিন কঙ্করময় আসন গ্রহণ—সব জড়িয়ে অকস্মাৎ

নফিসার চোখে জল এসে গেল ; অবাধ্য ঠোঁট দুটো নিরুদ্ধ কান্নায় কাঁপতে লাগল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও উত্তর দিতে না পেরে মুখটা ফিরিয়ে নিল সে।

'নফিসা!' আবারও ডাকলেন দায়ুদ।

না, ভুল নয়। কল্পনা নয়। মনের একাগ্রচিন্তার ফলে বাইরের দৃষ্টি-বিভ্রান্তিও নয়।

যে অঘটন দৈবাৎ ঘটে মানুষের জীবনে এও তাই।

সত্যি সত্যিই দায়ুদ খাঁ কররাণী তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন পাশে বসেছেন। তিনিই ডাকছেন ওর নাম ধরে।

কিন্তু তাতে ও এমন শিউরে উঠল কেন?

কেন হাত দুটো এমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে?

না, অস্বীকার সে করবে না। করতে চায় না—মনের সঙ্গে লুকোচুরি করার প্রয়োজন নেই তার—এতক্ষণ ধরে সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত আত্মজিজ্ঞাসার ফাঁকে ফাঁকে অথবা সেইগুলো উপলক্ষ করেই—সে একমনে এই দায়ুদ খাঁর কথাই ভাবছিল, বিশ্বাসঘাতক বান্ধব-হত্যাকারী এই পাপিষ্ঠটার কথা।

ভাবছিল ঠিকই।

কিন্তু তবু এ আবেগ, এ মমতা তো থাকবার কথা নয়। এমন ভেঙে পড়বে কেন সে? তাকে যে কঠিন হতে হবে।

তার মালিক। তার স্নেহময় মহান্ উদার মালিক।

লুদী মিয়াকে প্রাণপণে মনে আনবার চেষ্টা করে সে।

অস্পষ্ট, ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া তাঁর চেহারাটাকে মনের পটে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

'নফিসা!' চতুর্থবার ডাকেন দায়ুদ খাঁ।

'বলুন।'

এবার উত্তর দেয় নফিসা। মুখও ফেরায় কিন্তু ওঁর দিকে নয়—সোজা নদীটার দিকেই।

আর একটু ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ওপারের শ্যামল বনরেখায়। সূর্য আর একটু নেমেছেন পশ্চিম দিগন্তে। নদীর জলে আকাশের ছায়া ম্লান হয়ে এসেছে অনেকটা। সে সোনালী ঔজ্জ্বল্য যেন আর নেই।

খুব দ্রুত, জোর করে করে—মনকে চাবুক মেরে, যেন এইগুলো লক্ষ্য করে নফিসা।

'তোমাকে নিতে এসেছি নফিসা।'

'আমাকে—নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'তা জানি না। শুধু তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাই। দিবারাত্রির সঙ্গী করে। পতনে উত্থানে দুঃখে সুখে জীবনে মৃত্যুতে—শুধু তোমার সঙ্গেই কাটাতে চাই—পরমায়ুর বাকী কটা দিন, তার প্রতিটি মুহূর্ত।'

এই যে লোকটা এমন মিষ্টি করে করে কথা বলছে, এমন অসহায়ভাবে ভিক্ষা চাইছে তার সঙ্গ, তার সাহচর্য—সে-ই মিয়া লুদী খাঁর হত্যাকারী। শঠ, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। শুধু তাই নয়—অকর্মণ্য অপদার্থ অসচ্চরিত্র।

ওর পক্ষে এ প্রস্তাব অসহনীয় ধৃষ্টতা। স্পর্ধা।

নফিসার বিরক্ত হয়ে ওঠাই উচিত এ প্রস্তাবে।

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আপনি চান! ওঃ।...কিন্তু আমিও যে তাই চাই—এমনটা ভাবলেন কী করে জাহাপনা?'

দায়ুদের বুকে অনেকখানি আবেগ আর উচ্ছ্বাস—এই নির্জন সাহচর্যে, এই হাতের স্পর্শে,—এবং নিজের কণ্ঠস্বরেও—ফেনিয়ে উঠেছিল আকণ্ঠ। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে যেন সেটা স্তিমিত হয়ে এল।

সে মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে আরও দীন আরও কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'আমি এটা ভিক্ষাই চাইছি নফিসা। প্রার্থীর তো দাতার মনোভাব জেনে ভিক্ষা চাওয়ার কথা নয়!'

'কিন্তু সময়ে সময়ে ভিক্ষা চাওয়াও ধৃষ্টতা হয়ে পড়ে জনাব। প্রার্থীরও অধিকার-বিচার আছে। আপনার আর আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান—লুদী মিয়ার রক্তের নদী বইছে এ দু পারের মাঝে। আপনার সাধ্য নেই সে উত্তপ্ত নদী পার হয়ে আমার কাছে পৌছান।'

'সে অপরাধ তুমি আজও ক্ষমা করতে পার নি নফিসা?'

স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন দায়ুদ খাঁ কররাণী।

'কোনদিনই পারব না জনাব। এ দেহ থাকতে নয়।'

'তবে—' ছেলেমানুষের মত ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন দায়ুদ, 'তবে কেন তুমি আমাকে বাঁচালে? কেন আমাকে রক্ষা করবার জন্য এত কাণ্ড করলে? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হয়েই যাচ্ছিল, তাতে বাধা দিলে কেন?'

একটু অভিমানও প্রকাশ পায় যেন তাঁর কণ্ঠে—যে অভিমানের কোন দাবীই নেই তাঁর নফিসার ওপর। কোনকালে ছিলও না।

একঝাঁক কী নিশাচর পাখী ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে—নিঃশব্দগতির একটা তরঙ্গ তুলে।

সেদিকে চেয়ে নফিসা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর সেও ছেলেমানুষের মতই কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, 'আপনি একদিন আমাকে জীবনদান করেছিলেন—শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ঋণই শোধ করেছি মাত্র। শত্রুর অনুগ্রহের ঋণ রাখতে চাই না বলেই। তার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করার কোন কারণ নেই।'

'কিন্তু সে তো—ঐ একদিন—যুদ্ধক্ষেত্রেই যথেষ্ট শোধ হয়ে গিয়েছিল নফিসা। বহুগুণ সুদসুদ্ধই শোধ হয়েছিল। একদিনের বদলে একদিন। আজ অবধি জের টানবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না।'

তাই তো!···কোনই কি প্রয়োজন ছিল না?

প্রাণপণে জবাবটা খুঁজে বেড়ায় নফিসা মনের মধ্যে। বিস্মৃতির আঁধারে হাতড়াতে থাকে পাগলের মত—একবিন্দু আলো, একটুখানি কৈফিয়তের জন্য।

কোন কারণই কি ছিল না—দায়ুদকে আবার আজও এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার?

নফিসার ললাটে ঘাম দেখা দেয়। দায়ুদের হাতের মধ্যে যে হাতখানা এতক্ষণ ধরাই ছিল—সেটা বড় বেশী কাঁপছে দেখে ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি টেনে নেয়।

কারণ একটা চাই। কৈফিয়ত এখনই দিতে হবে।···

সন্ধ্যা এখনও নামে নি, এখনও যথেষ্ট আলো আছে। তবু এখনই ওপারে শিবারব শোনা যাচ্ছে। কাঠজুড়ির বিস্তীর্ণ চড়া পেরিয়েও এপারে স্পষ্ট এসে পৌঁছুচ্ছে সে রব। সেই দিকে কান পেতে বসে থাকে নফিসা আর স্মৃতির দুয়ারে মাথা কোটে।

'নফিসা! কই, উত্তর দিলে না?'

অত্যন্ত কোমল শোনায় দায়ুদের কণ্ঠস্বর।

বোধ হয় একটু ক্ষীণ হাসির রেখাও ফুটে ওঠে তাঁর ক্লান্ত চোখ দুটিতে।

মনে পড়েছে। মনে পড়েছে।

মনে মনেই লাফিয়ে ওঠে নফিসা।

মনে পড়েছে সে কথাটা।

মুখটা ফিরিয়ে একান্ত চেষ্টায় কণ্ঠস্বরটা সহজ করবার চেষ্টা করে নফিসা বলে—গলাটা অকারণেই একটু কেশে সাফ করে নিয়ে,—'সে কারণও একটু ছিল বইকি জনাব। প্রাণের বদলেই প্রাণ দিয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি যে মুঘল বালকটির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন—সে কথাটা আমি ভুলি নি। তারই কিঞ্চিৎ শোধ দিয়েছি মাত্র। আপনাকে—আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এ জগতে সৎকর্মের পুরস্কারও পাপের শাস্তির অনুপাতে কম নয়। একগুণ দিলে চারগুণ পাওয়া যায়।'

শেষের দিকে—কথাগুলো বলতে বলতে নিজের কাছেই খণ্ডসত্যটা পূর্ণ-সত্য হয়ে ওঠে, কণ্ঠে বিজয়গর্ব ফুটে ওঠে খানিকটা, খানিকটা আত্মপ্রসাদও।…

'প্রাণের বদলে প্রাণ!…প্রাণ দিয়েছি! আমি?…সে কী? কার প্রাণ দিলাম? কী বলছ নফিসা?'

'মনে করে দেখুন। ঠিকই বলেছি।'

তবুও বিহ্বলভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন দায়ুদ।—স্মৃতির ওপরের কালো পর্দাটা সরাবার চেষ্টা করেন মনে মনে।

পশ্চিম দিগন্তের সে অপরূপ রক্ত-ঔজ্জ্বল্য আর নেই। অনেকক্ষণ আঁধারের কালি মিশেছে তাতে। তার প্রতিফলিত আলোও হয়ে এসেছে ম্লান। তবু তারই ক্ষীণ আভাতে চোখের সামনেকার এই শুষ্ক, ক্লান্ত মুখখানাকে অপরূপ দেখাতে থাকে। সেদিকে চেয়ে বুঝি আরও গোলমাল হয়ে যায় সব—চিন্তার খেই যায় হারিয়ে।

কিন্তু নফিসাকে দেখে ওর কথা মনে পড়ে বলেই বুঝি শেষ পর্যন্ত সে কথাটাও মনে পড়ে যায়। সেদিনকার যুদ্ধক্ষেত্রের পৃষ্ঠপটে নফিসার সঙ্গে যতবার যেভাবে দেখা হয়েছে—সবগুলো মনে করতে করতে একসময় এ ঘটনাটাও মনে পড়ে।

নিতান্তই তুচ্ছ—মনে পড়বার কথা নয়, পড়তও না। শুধু নফিসা তার সঙ্গে জড়িত ছিল বলেই—

সেই প্রথম ওঁদের দেখা হয়েছিল সেদিন।

ঘটনাটা এখন বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যখন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে—সেই সময়কার কথা। পাঠানরা ওদের পিছু পিছু ছুটেছে কালান্তক যমের মত। তারই মধ্যে একটি তরুণ মুঘল বালকও

কী করে এসে গিয়েছিল! নিতান্তই বালক—ষোল বছরের বেশী বয়স হবে না। প্রাণভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটতে ছুটতেই বোধ হয় কখন হাত আল্‌গা হয়ে রাশটা ছুটে গিয়েছিল—ঘোড়া সে সুযোগের অপব্যয় করে নি। সেও তার আগে বেদম ভয় পেয়েছে ঐ রাক্ষুসে হাতীগুলোকে দেখে—এই অবসরে সামনের দু পা তুলে সওয়ারীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল সে।

আঘাত পেয়েছিল খুবই। সেই জন্যই উঠতে একটু দেরি হয়েছিল ছেলেটির, সামান্য দেরি। কিন্তু তার মধ্যেই চার-পাঁচজন আফগান সওয়ার এসে পড়েছিল। কণ্ঠে তাদের সোল্লাস বীভৎস চিৎকার, চোখে উন্মত্ত জিঘাংসা।

ছেলেটার বাঁচবার কথা নয়।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দায়ুদ খাঁও এসে পড়েছিলেন সেখানে। তবে ছেলেটার দিকে তাঁর চোখ পড়ে নি আগে। চোখ পড়েছিল দূরের আর-এক অশ্বারূঢ় মূর্তির দিকে, প্রথম প্রহরের উজ্জ্বল দিবালোকে চোখে চোখ মিলেছিল। চিনতেও যেমন ভুল হয় নি বিন্দুমাত্র, তেমনি সে চোখের আকুলতা বা করুণ মিনতি বুঝতেও এতটুকু বিলম্ব হয় নি।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ করেই চেয়ে দেখেছিলেন ছেলেটির দিকে। একটু কৌতুকও বুঝি অনুভব করেছিলেন সেই অত্যল্পকালের মধ্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে রণবেশে অশ্বারোহিণী নারী—মৃত্যুর সাগরে সাঁতার দিচ্ছে বলতে গেলে —তবু এই একটি বালকের ওপর তার কী মায়া, ওর প্রাণের সম্বন্ধে কী উদ্বেগ, কী মিনতি চোখে!

তারই মধ্যে মনকে বুঝিয়েছিলেন—এমন হয়। এই-ই মানুষের নিয়ম। অসংখ্য নরহত্যাকারী দস্যুকেও ছাগশিশুর অপমৃত্যুতে চোখের জল ফেলতে দেখা যায় এ পৃথিবীতে।

কিন্তু এসব চিন্তা এক লহমার বেশি তাঁর মন অধিকার করে থাকতে পারে নি, সে অবসর ছিল না। বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তখন একজন আফগান সওয়ার বালকের বুক লক্ষ্য করে বর্শা তুলেছে—আর এক মুহূর্তের মধ্যেই বিঁধবে ওর বুক—তিনি চকিতে নিজের তরবারির উলটো দিক দিয়ে আঘাত করলেন আফগানের মুঠির কাছাকাছি, বর্শার ওপর—বলিষ্ঠ হাতের সবল আঘাতে বর্শা ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে।

'হুঁশিয়ার জওয়ান! খবরদার! একটা নিরস্ত্র বালককে মারবার জন্যে এত

আয়োজন, এত উল্লাস! লজ্জা নেই তোমাদের! তোমরা না বীর, তোমরা না যোদ্ধা!…ছি!'

তারপর কঠোর দৃষ্টিতে একবার সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবারও বলেছিলেন, 'ওকে একটা ঘোড়া ধরিয়ে দাও—একশ গজ যেতে দাও ওকে—তারপর পার তো ছুটে গিয়ে ওকে হত্যা কর। কিছু বলব না। সে হল যুদ্ধ, যুদ্ধের আইনে তাতে দোষ হয় না। কিন্তু এ যে খুন। এতগুলো ষণ্ডা মানুষ মিলে একটা বালককে খুন! ধিক তোমাদের!'

অধোবদন সওয়াররা অবশ্য আর তাও করে নি। রুষ্ট সুলতানকে প্রসন্ন করতে একজন নিজের ঘোড়ার ওপরই বালককে চাপিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ওর পিছু নিবার আর চেষ্টামাত্র করে নি।

ছেলেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আর একবার দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন দায়ুদ খাঁ কররাণী। কিন্তু অশ্বারোহিণীকে আর দেখতে পান নি। জনারণ্যে কোথায় মিশে গেছে সে ততক্ষণে।

হয়ত সে তাঁকে ভুল বুঝেই গেল, হয়ত তাঁকেও সে ঘাতকই মনে করলে—একটা বালককে হত্যা করার আনন্দেই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, এই ভেবেই অধিকতর ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল হয়ত—আর তার চেয়ে ভাল ধারণা হবার কোন কারণও তো তিনি থাকতে দেন নি নিজের কলুষিত জীবনে—এই মনে করে তখন একটু অস্বস্তিই বোধ করেছিলেন দায়ুদ।

কিন্তু আজ বুঝছেন—সেই সামান্য সৎকাজটিও ব্যর্থ হয় নি। যার প্রীতির জন্য তিনি করেছিলেন—হয়ত প্রীতির জন্য করছেন সেটা না বুঝেই করেছিলেন—তবু তো তার নজর এড়ায় নি!

ছায়াছবির মত ঘটনাটা মনের পর্দায় দ্রুত সরে সরে গেল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দায়ুদ। হয়ত একটা তৃপ্তির নিশ্বাসও। তারপর আবারও নফিসার আর্দ্র শিথিল হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার অপরাধের শেষ নেই নফিসা, পাপের সীমা নেই—তবু তুমি আমাকে ক্ষমাই করেছ।…ভাল করে মনের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখ।'

শিউরে কেঁপে উঠল নফিসা।

অপরাধী ধরা পড়লে যেমন কেঁপে ওঠে তেমনই। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়াল সে।

'কে বললে আপনাকে জাহাঁপনা যে আমি ক্ষমা করেছি—কে বললে আপনাকে? আপনি আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন।'

দায়ুদও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে দু হাতে ওর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে তুলে ধরলেন। তারপর ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তুমিই আত্মপ্রবঞ্চনা করছ নফিসা। তুমি আমার চোখের দিকে চেয়ে বল দেখি আমাকে ক্ষমা করেছ কি না—! আমি জানি, মিছে কথা বলতে পার না। বলবে না।'

নফিসা প্রাণপণ চেষ্টা করল দায়ুদের দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি স্থির রাখতে—কিন্তু পারল না। দেখতে দেখতে ওর দুই চোখ ছাপিয়ে যেন অশ্রুর বন্যা নামল। ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি; ওর লজ্জা ঢাকতেই যেন খোদা ঝাপসা করে দিলেন।

সে আকুল হয়ে, বার-দুই যেন জোর করে, মাথা নেড়ে বললে, 'না না জনাব। ক্ষমা করি নি আপনাকে। অস্বীকার করব না—ভালবেসেছি, কিন্তু ক্ষমা করি নি। লুদী মিয়ার হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারব না কখনও।'

দায়ুদও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'ভালবেসেছ নফিসা! ভালবেসেছ! এর চেয়ে সৌভাগ্য যে আমি ভাবতেও পারি না আজ।...কিন্তু ভালবাসার কাছে কোন অপরাধই তো ক্ষমার অযোগ্য নয়।...তুমি আজ দরবারে বলে এলে—তুমি নির্জনে বসে তোমার অপরাধের প্রায়াশ্চিত্ত করবে; বেশ তো, তাই চল না নফিসা, আমরা দুজনেই যাই। রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়—এসব বিবাদ-বিসম্বাদ, স্ত্রী-পুত্র—আজ আর আমার কাউকেই প্রয়োজন নেই। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই—যেখানে নিয়ে যাবে আমাকে, পাহাড়ে, পর্বতে গহন অরণ্যে—তোমার সঙ্গে বসেই বাকী জীবন খোদাকে ডাকব আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। শুধু তুমি কাছে থাক আমার। তুমি পাশে থাকলে যেখানে থাকব সে-ই হবে আমার বেহেস্ত, পথের পাথরই হবে তখ্‌ৎ।'

উত্তর দিতে গিয়ে বহুক্ষণ নফিসার ঠোঁটই কাঁপল শুধু। কিন্তু কথা যখন কইল তখন কণ্ঠ অশ্রুবিকৃত হলেও বক্তব্যে কোন জড়তা নেই তার। বলল, 'জাহাঁপনা, মন আমার স্বাধীন, তাই তা আপনাকে দিয়েছি, দিতে পেরেছি। তার জন্য বিবেকের কাছে কোন জবাবদিহি নেই।... কিন্তু এ দেহটা মিয়া লুদী খাঁর, তিনি এর মালিক—এ দেহ তাঁর হত্যাকারীকে কোনদিন দিতে

পারব না। তার সংস্পর্শে, তার কাছেও রাখতে পারব না। সেটা বেইমানী হবে। খোদা সে বেইমানী সহ্য করবেন না।···আমরা পাহাড়ী মেয়ে জনাব—আমাদের ইমানের জ্ঞান ধারণা হয়ত আপনাদের সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস আমার কাছে বড়। আদাব।···আর কোনদিন না আপনার সঙ্গে দেখা হয়—এই চেষ্টাই করব প্রাণপণে।···আপনি আপনার কর্তব্যে ফিরে যান, ফিরে যান নিজের বীরধর্মে—সামান্য একটা বাঁদীর চিন্তায় নিজের জীবন, নিজের জিন্দিগী আর বিড়ম্বিত করবেন না।'

সে সামান্য একটু অভিবাদনের ভঙ্গী করে চলে গেল। দেখতে দেখতে পাশের সেই গাছপালার ছায়ায় কোথায় মিলিয়ে গেল আর তার চিহ্নমাত্র রইল না চোখের সামনে। তার অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে, তার বক্তব্যে, তার এখন এই চলে যাবার ভঙ্গীতে এমনই একটা অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল যে তাকে কোন রকম বাধা দিতে সাহসে কুলোল না দায়ুদ খাঁর। তিনি মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেই ভাবেই। তারপর কোনমতে আবার অর্ধ-অবশ পা দুটোকে টেনে নিয়ে ফিরে চললেন তিনি—শহরের বাইরে, যেখানে অরণ্যের আবছায়ায় তাঁর সাথী ও দেহরক্ষীরা অপেক্ষা করছে, সেইখানে—আশাহীন, আনন্দহীন, ভবিষ্যৎহীন জীবনের দিকে, শুধু জিন্দিগীর বাকী কটা দিন কোন মতে কাটিয়ে দেবার সাধনায়।

দূরে শহরে আলোকসজ্জা হয়েছে, বড়বাটি দুর্গের থামে থামে গুম্বজে গুম্বজে জ্বলেছে আলো। সে আলো এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুঘলদের আনন্দ-উৎসবের কোলাহল ভেসে আসছে এখানেও; বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে মদ্যপানের ফলে কোলাহল বেড়েছে বলেই। ওপারে শিবাদল এখনও চিৎকার করে চলেছে।

কাঠজুড়ির বুকে নেমে এসেছে সন্ধ্যা। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ওপারের বনরেখায়। সূর্য একেবারেই ডুবে গেছে। তবু কী একটা বিচিত্র কারণে এখনও ওপরের একটা সাদা মেঘে তার একটুখানি রক্তাবর্ণাভা লেগে রয়েছে —তারই সামান্য আলোতে বাঁধের সরু পথটা দেখে দেখে চললেন দায়ুদ।

নফিসা তাঁকে ক্ষমা করে নি কিন্তু ভালবেসেছে।

লেখক-পরিচিতি

পশ্চাতের মিলিয়ে যাওয়া অতীতের দিকে ফিরে তাকাই।…আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। ১২০৯ সন, কার্তিক মাসের একটি দিন। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হল, বাড়ির লোকেরা জানলেন না,—বাংলা সাহিত্যের কথাশিল্পীদের নামের তালিকায় আর-একটি নাম যুক্ত হল। অভিভাবকেরা এই শিশুটির নামকরণ করেছিলেন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

আবার অতীতের দিকে ফিরে চাই।…"বাবার কথা ঠিক মনে পড়ে না। তিন বছর যখন বয়স তখন বাবা মারা গেলেন। মা ও তিন ভাই—চলে যেতে হল কাশীতে। কাশীতেই প্রথম পাঠজীবন শুরু হল।"

ইংরেজিতে প্রবাদ আছে—'মর্নিং শোজ্ দি ডে'। সকাল দেখেই বোঝা যায়, সারা দিনটা কেমন যাবে। একথা বোধ করি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সত্য—সাহিত্যিক শিল্পী সকলের ক্ষেত্রেই। গজেন্দ্রকুমারের বেলাতেও একথা খাটে। কাশীর ছাত্রজীবনের কথা—তাঁর বয়সী সব ছেলেরা স্কুলের ছুটির পর যখন খেলাধুলো করে বেড়াত, তিনি তখন স্কুল-ফেরত বাড়ি গিয়েই প্রায়ান্ধকার ঘরের কোণে বইয়ের ওপরই আবার উপুড় হয়ে পড়তেন। অবশ্যই সে বই স্কুলের পাঠ্য বই নয়—অ-পাঠ্য বই, সে বই সাধারণত হত গল্প-উপন্যাস, পুরাণ-উপকথা বা দেশ-দেশান্তরের অলীক কাহিনীর সংকলন,—যে বইয়ে আছে—সংকীর্ণ বাস্তব পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে, বালক-মনে অধিষ্ঠিত এক বিরাট কল্প-রাজ্যের আভাস। পাঠ্য বইয়ের চাইতে, এমন কি কিশোর বয়সের অতিপ্রিয় ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু ঘোরানো, গুলি খেলা—এ সকলের চাইতে অনেক অনেক বেশী আকর্ষণ ছিল গজেন্দ্রকুমারের এই পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কাহিনীপাঠে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি—তখন তাঁর বয়স সাত-আট বছর। একটি কথা আগে বলা হয় নি গজেন্দ্রকুমার ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই হাতের কাছে মহাভারত এসে পড়ল। গজেন্দ্রকুমার মহাভারত পড়তে শুরু করলেন। দ্বিতীয় ভাগ পাঠ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতও। কিন্তু মহাভারতের বিরাট কাহিনীর ছাপ বালক-মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসল। তার পর যখনই হাতের কাছে আবারও মহাভারতখানি পেয়েছেন, টেনে নিয়েছেন, আবার পড়েছেন আদ্যোপান্ত। আজ তাঁর পরিণত মনের ওপর, এখনও পর্যন্ত মহাভারতের প্রভাব অসীম।

মহাভারত-পাঠের পর বালক গজেন্দ্রকুমার আর-একটি দুঃসাহসিক কাজ করলেন। দ্বিতীয় ভাগ তখন সবে শেষ হয়েছে। বাড়িতে 'ভারতবর্ষ' আসে। 'ভারতবর্ষে' তখন ৺অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। 'মহানিশা'র পাতাগুলিতে ছবি থাকত। সম্ভবত সেই ছবিগুলিতেই প্রথম আকৃষ্ট হয় বালক-মন। ছবি দেখার পর বালক গজেন্দ্রকুমার বানান করে

করে উপন্যাসখানিও পড়তে শুরু করলেন—সেই সংখ্যা, তারও পরের সংখ্যা—গজেন্দ্রকুমার সাহিত্যের রসে তন্ময় হয়ে গেলেন। তার পরই সন্ধান শুরু হয়ে গেল সাহিত্যের ভাণ্ডারে। বাড়িতে বইয়ের অভাব ছিল না। মা ও দাদারা সবাই ছিলেন সাহিত্যরসিক। যেখানে যে বইয়ে যতটুকু কাহিনীর রস আছে, গজেন্দ্রকুমার সাগ্রহে পড়তে শুরু করেন। সেই রসনিষেকে, হয়তো গজেন্দ্রকুমার নিজেও জানতে পারলেন না, ভবিষ্যৎ কথাশিল্পীর বনেদ আরও শক্ত, আরও মজবুত হতে থাকল।

ছেলেবেলায় এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে (এখানেই গজেন্দ্রকুমার পড়তেন) তখন ক্লাস-টীচারই মাইনে নিতেন—মাইনে নেওয়ার সময়ে ভারি গোলমাল হত। সেই গোলমাল থামাতে একদিন মাষ্টার মশাই আহ্বান করেন, 'কে গল্প বলতে পারে!' সে ডাকে গজেন্দ্রকুমারই সর্বাগ্রে সাড়া দেন এবং সত্যি সত্যিই গল্প বলে এক ক্লাস ছেলের কোলাহল থামিয়ে দিতে সক্ষম হন। তার পর থেকে এই দিনটি এলেই তাঁর ডাক পড়ত এবং তিনিও সানন্দে এই কাজে এগিয়ে যেতেন। লক্ষণীয় এই যে—যদিও পড়া বইয়ের গল্পই বলতেন, কিন্তু কখনও নির্ভেজাল বলতেন না—তার সঙ্গে নিজের কল্পনাও কিছু যোগ করে দিতেন।

তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, তখনই হাতে-লেখা কাগজ বার করেন নিজের ক্লাস থেকে। তাঁর সঙ্গে সহযোগী সম্পাদক ছিলেন বর্তমান ভারতের ডিরেক্টার-জেনারেল অফ আর্কিওলজি—শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ। কাশীর কিশোর বন্ধুদের মধ্যে আজও অনেকের সঙ্গেই তাঁর সংযোগ আছে। শৈশবের কাশী, কৈশোরের কাশীর সঙ্গে গজেন্দ্রকুমারের বন্ধন অচ্ছেদ্য। সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি কাশীতে গিয়ে কিছু দিন কাটিয়ে আসেন। কাশীর গঙ্গার ঘাট, কাশীর বাঙ্গালীটোলার গলি হয়তো ক্ষণকালের জন্য তাঁকে শৈশবের স্বপ্নজাল-বোনা অতীতের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাশীর আর এক ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুর নাম উল্লেখ করা উচিত—তিনি শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময়ে তাঁর মা'র শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গজেন্দ্রকুমারের পড়াশুনোয় সাময়িক ছেদ পড়ে। অবশেষে কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসার পর আবার পড়াশুনো শুরু হয়। বালিগঞ্জে জগবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশনে তিনি ভর্তি হন। এখানে যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়েই তাঁদের ভিতরে বন্ধুত্বের ভিত্তিপত্তন এবং সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সুমথবাবু ও তিনি—দু জনে মিলেই তাঁদের প্রকাশন ব্যবসা গড়ে তুলেছেন।...জগবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেজদা ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের বিষয় তাঁর কাছে বড় প্রিয়। অতএব তিনি ছোট ভাইকেও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু সাহিত্যরস-উৎসের সন্ধান একেবার যার হয়েছে, বিজ্ঞানে তার মন বসবে কেন! বিজ্ঞানের ক্লাসে লুকিয়ে সাহিত্য ও ইতিহাস-পাঠ চলতে লাগল। ফলও ফলল। পড়াশুনোয় ছেদ পড়ল অকালে। স্কুল ও কলেজের পড়াশুনার মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চা চলছিল। এখন থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু হল পুরোদমে।

অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকের জীবনে দেখা যায়, তাঁরা প্রথম কবিতা লিখেছেন, তার পর গল্পরচনায় নেমেছেন। গজেন্দ্রকুমার এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। তাঁর প্রথম রচনাই গল্পরচনা। পরবর্তী কালে অবশ্য কিছু কবিতা লিখেছেন—তবে তা নিতান্তই নগণ্য।

প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'ঋত্বিক' কাগজে—সম্পাদক স্বর্গত কেশব সেন হাতে-লেখা কাগজে লেখা পড়ে খোঁজ করে চেয়ে নিয়ে এই লেখাটি ছাপান। এই লেখা ছাপা হয় ১৯২৮ সনে। প্রথম বেনামীতে ফরমায়েসী বই লিখে কিছু টাকা পান—সেও ঐ বছরে। অবশ্য প্রতিশ্রুত টাকার সবটা পান নি। সে যুগে সব লেখককেই এই কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছে।

স্বনামে লেখার জন্য প্রথম টাকা পান কয়েকটি ছেলেদের নাটক লিখে। এর পর থেকেই পত্র-পত্রিকায় অজস্র গল্প বেরোতে থাকে। এই সময়ে যাঁরা তাঁকে আনুকুল্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধুনালুপ্ত 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতিমান সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় অন্যতম।

সময় যায়। তরুণ কথাশিল্পীর খ্যাতি প্রসার লাভ করতে থাকে। আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা চেয়ে পাঠান। আনন্দ-বাজার থেকে লেখার জন্যে সাতটি টাকা মিলল। সাহিত্যিকদের সে দুরবস্থার দিনে পত্র-পত্রিকায় লিখে টাকা পাওয়া এক মহা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

এর মধ্যে সংসারের চাপও এসে পড়ে গজেন্দ্রকুমারের ওপর,—সরকারী সওদাগরী আফিসের চাকরিতে লাগিয়ে দেবার চেষ্টাও অভিভাবকদের তরফ থেকে করা হয়। সে চাকরি নিলে যে তাঁর সাহিত্যজীবনের গতি বন্ধ না হোক, অন্তত শ্লথ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। সে চাকরি এড়াতে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। সংসারের ভার লাঘবের জন্যে অবশেষে তিনি বাংলা বই নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বাংলার জেলায় জেলায়, এবং বাংলার বাইরেও—কমিশন লাভে বই বিক্রি করতে। এবিষয়ে প্রথম হাতেখড়ি হয় অবশ্য 'বুক কোম্পানি'তে সাময়িক চাকরি করে। এ চাকরি ছিল স্কুলের বই নিয়ে বাইরে বাইরে ঘোরায় —এবং এর স্থায়িত্ব হল বছরে তিন সপ্তাহ থেকে এক মাস সময়।

এই ভাবে বই ফিরি করতে করতেই নিজস্ব প্রকাশনার ইচ্ছে হয়—এবং ১৯৩৪ সনে প্রথম বই প্রকাশ করেন। একটি পয়সা মূলধন কেউ দেয় নি—তাঁকে বা তাঁর অংশীদার বন্ধু সুমথবাবুকে। পরপর ৫।৬ খানি বই প্রকাশ করার পর ১৯৩৬ সনে 'মিত্র ও ঘোষ' নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠান করেন।

১৯৩৪ সন থেকে নিজেরা প্রকাশনার ব্যবসায় শুরু করলেও—এবং ইতিমধ্যে অন্তত দু শ গল্প ও আরও দু শ বিভিন্ন রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও—প্রথম ছোটগল্পের বই 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' প্রকাশ করেন ১৯৩৯ সনে। হয়তো সেই জন্যই, অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনা থেকে বেছে নেওয়াতেই, এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বজ্জন সমাজ থেকে অভূতপূর্ব অভিনন্দন লাভ করে। এঁর প্রথম দুটি উপন্যাস 'মনে ছিল আশা' ও 'পুরুষ ও রমণী' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সনেই এঁর 'রজনীগন্ধা' নামে গল্পটি 'কঙ্গণ' নামে বিখ্যাত হিন্দী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। স্কুল সম্বন্ধে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা

থেকে এঁর সার্থক উপন্যাস 'রাত্রির তপস্যা'র সৃষ্টি। এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক বসুমতীতে; 'রাত্রির তপস্যা'ও পরে চিত্রায়িত হয় এবং এর চিত্ররূপও প্রচুর খ্যাতি লাভ করে।

গজেন্দ্রকুমার স্বনামে ও বেনামে বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। এঁর স্বনামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটেরও উপর। ইতিহাসে এঁর অসাধারণ অনুরাগ এবং তার ফলেই কয়েকটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কালে বিগত শতকের পটভূমিকায় রচিত 'কলকাতার কাছেই' ও সিপাহী-বিদ্রোহের পৃষ্ঠপটে লিখিত 'বহ্নিবন্যা' নামে দুটি উপন্যাস বহুল পরিমাণে প্রসিদ্ধি ও গুণীজনের প্রশংসা লাভ করেছে।